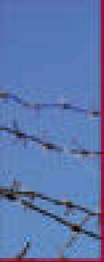

CHRI 2009

আমাদের তথ্য আমাদের অধিকার

অধিকার আদায়ে জনগণের জ্ঞানভিত্তিক ক্ষমতায়ন

কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে মানবাধিকারের কার্যকর বাস্তবায়নে কর্মরত

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই) হলো একটি স্বাধীন, দল নিরপেক্ষ, আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে মানবাধিকার বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন। কমনওয়েলথভুক্ত কয়েকটি পেশাজীবী সংস্থার* যৌথ উদ্যোগে ১৯৮৭ সালে সিএইচআরআই-এর প্রতিষ্ঠা। উল্লেখিত সংস্থাগুলো এই উপলব্ধিতে এসেছিল যে, কমনওয়েলথ যখন তার সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে মানবাধিকার উন্নয়নে কাজের জন্য কিছু একক মূল্যবোধ ও আইনগত নীতিমালা বেঁধে দেয় এবং তার আলোকে যখন ভিন্ন ভিন্ন ফোরাম কাজ করে তখন সামগ্রিক অগ্রগতি ঘটে ক্ষীণ। সেই অবস্থার উত্তরণে সিএইচআরআই-এর যাত্রা।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা সনদ সম্পর্কে সচেতনতা ও এর প্রতি আর্থসামাজিক নিষ্ঠতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা ছাড়াও 'হারারে নীতিমালা'সহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অন্যান্য মানবাধিকার নীতি-ঘোষণা-কাঠামোর বাস্তবায়ন ও অনুসরণে উদ্যোগ শক্তিশালী করতে সিএইচআরআই তার কাজের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছিল।

এসব লক্ষ্য অর্জনে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোতে অগ্রগতি ও সমস্যা সম্পর্কে সিএইচআরআই নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন রিপোর্ট ও 'পেরিওডিক রিভিউ' প্রকাশ করছে। মানবাধিকারের বিপন্নতা থেকে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সমাজ জীবনকে রক্ষা করতে উদ্যোগ গ্রহণ ও পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সিএইচআরআই কমনওয়েলথ সচিবালয়, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সরকার ও নাগরিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে কাজ করে। সিএইচআরআই-এর কর্মসূচিগুলোর মাঝে রয়েছে মানবাধিকার বিষয়ক জনশিক্ষা কার্যক্রম, বিভিন্ন নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রে সংলাপের আয়োজন, তুলনামূলক গবেষণা, প্রচারণা ও পারস্পরিক যোগাযোগ গড়ে তোলা। লক্ষ্য অর্জনে সিএইচআরআই বিভিন্ন সরকার ও সংস্থার মাঝে মূলত অনুঘটকের ভূমিকা নিয়ে থাকে।

সিএইচআরআই-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্থাগুলো জাতীয় পর্যায়ে কাজের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কেরও সদস্য হতে পারে। পেশাজীবীদের এসব সংস্থা তাদের কাজে মানবাধিকারের মানদণ্ড অনুসরণের মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে অনুরূপ মানদণ্ড অনুসরণের তাগিদ তৈরি করে থাকে। মানবাধিকার বিষয়ক তথ্যাদি, অনুসরণীয় মানদণ্ড প্রচারের ক্ষেত্রেও তারাই প্রধান মাধ্যম। এসব গ্রুপ মানবাধিকার ইস্যুগুলোকে প্রচারণায় নিয়ে আসা ও লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় জ্ঞানকে কাজে লাগায় এবং নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে লবি করে থাকে। মানবাধিকারের বিকাশে জনমতের একটি ঐকতান সৃষ্টি করে চলেছে তারা।

সিএইচআরআই-এর প্রধান দপ্তর ভারতের দিল্লিতে। একই সঙ্গে লন্ডন ও ঘানার আক্রাতেও এর কার্যালয় রয়েছে। এর একটি আন্তর্জাতিক উপদেষ্টামণ্ডলী রয়েছে। এছাড়া দিল্লি, লন্ডন ও ঘানাভিত্তিক তিনটি কার্যকরী কমিটি রয়েছে।

নির্বাহী পরিষদ (ভারত): বি. জি. ভার্গিস, চেয়ারপার্সন; সদস্যমণ্ডলী: আনু আগা, বি. কে. চন্দ্রশেখর, ভগবান দাস, নিতিন দেশাই, কে. এস. ধীলন, হরিবংশ, সঞ্জয় হাজারিকা, পুনম মুত্রেজা, রুমা পাল, আর. ভি. পিল্লাই, কমল কুমার এবং মাজা দারুওয়ালা (পরিচালক)।

নির্বাহী পরিষদ (ঘানা): স্যাম ওকুদজেটো, চেয়ারম্যান; সদস্যমণ্ডলী: আকনা বোসম্যান, নেভিল লিন্টন, এমিলি শর্ট, বি. জি. ভার্গিস এবং মাজা দারুওয়ালা (পরিচালক)।

নির্বাহী পরিষদ (ব্রিটেন): নেভিল লিন্টন, চেয়ারম্যান; লিন্ডসে রস, ডেপুটি চেয়ারপার্সন; সদস্যমণ্ডলী: অস্টিন ডেভিস, মীনাক্ষী ধর, ডেরেক ইংগ্রাম, ক্লেয়ার মার্টিন, সৈয়দ শরফুদ্দিন এবং এলিজাবেথ স্মিথ।

[*এসব পেশাজীবী সংগঠনের মধ্যে রয়েছে কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, কমনওয়েলথ লিগ্যাল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন, কমনওয়েলথ ল'ইয়ার অ্যাসোসিয়েশন, কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন ও কমনওয়েলথ ব্রডকাস্টিং অ্যাসোসিয়েশন।]

ISBN: 81-88205-72-9

© কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ ও নাগরিক উদ্যোগ, ২০০৯

সূত্র উল্লেখপূর্বক এই গ্রন্থের অংশবিশেষ ও তথ্যাদি ব্যবহার করা যাবে।

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ

সিএইচআরআই প্রধান কার্যালয়, নয়াদিল্লি
B-117, Second Floor, Sarvodaya Enclave
New Delhi - 110017, INDIA
Tel: +91-11-2685-0523, 2686-4678
Fax: +91-11-2686-4688
E-mail: info@humanrightsinitiative.org

সিএইচআরআই ইংল্যান্ড, লন্ডন কার্যালয়
Institute of Commonwealth Studies
28, Russell Square, London WC1B 5DS, UK
Tel: +44-020-7-862-8857,
Fax: +44-020-7-862-8820
E-mail: chri@sas.ac.uk

সিএইচআরআই আফ্রিকা, আক্রা কার্যালয়
House No.9, Samora,
Machel Street Asylum Down, opposite Beverly Hills Hotel Near Trust Towers, Accra, Ghana
Tel/Fax: +00233-21-271170
E-mail: chriafrica@africaonline.com.gh

www.humanrightsinitiative.org

আমাদের তথ্য
আমাদের অধিকার

অধিকার আদায়ে
জনগণের জ্ঞানভিত্তিক ক্ষমতায়ন

গবেষণা ও গ্রন্থনা
সিসিলিয়া বার্গম্যান, ক্যারি গেইজ, ক্লেয়ার ক্রোনিন এবং রেশমী মিত্র

সম্পাদনা
মাজা দারুওয়ালা এবং ভেঙ্কটেস নায়েক

অনুবাদ
আলতাফ পারভেজ এবং মিজান আলী

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ
নাগরিক উদ্যোগ

প্রাককথন

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ২০০৯ এর ফেব্রুয়ারিতে তথ্য অধিকার বিষয়ক আইন অনুমোদিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে এরূপ আইন হয়েছে। বাংলাদেশেও এই আইনের মাধ্যমে এখন জানার অধিকারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেল জনগণ। এটা নিঃসন্দেহে এক ধাপ অগ্রগতি। এই আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে জনগণ সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, কর্মসূচি এবং তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে নজরদারি ও তদারকি করতে সমর্থ হবে। যদিও এই আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, অনেক সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে তথ্য উন্মুক্তকরণ থেকে অব্যহতি বা রেহাই দেয়া হয়েছে– তারপরও এই আইন এবং তার আলোকে তিন সদস্য বিশিষ্ট তথ্য অধিকার বিষয়ক কমিশন গঠিত হওয়া একটা বড় পদক্ষেপ। এখন সচেতন নাগরিক সমাজের দায়িত্ব হলো, এই কমিশন যাতে জনগণের জানার অধিকারের বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে তার জন্য সচেষ্ট থাকা।

গোপনীয়তার সংস্কৃতিকে ভাঙ্গা মোটেই সহজ কোন কাজ নয়। জানার অধিকারের কার্যকর প্রয়োগ যে বিশাল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে সে সম্পর্কে আমরা অজ্ঞতার মাঝেই ছিলাম বলা যায়। প্রশাসনকে প্রশ্ন করা, তার কাছে কিছু জানতে চাওয়াকে আমরা মনে করেছি ভয়ের ব্যাপার। এরকম অধিকারের চর্চা করতে গেলে ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করা হবে সেটাই আমরা ধরে নিয়েছি। প্রশাসনও নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করেছে।

বর্তমান প্রকাশনা 'আমাদের তথ্য আমাদের অধিকার'– যা মূলত কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিসিয়েটিভ-এর গ্রন্থ Our Rights Our Information এর অনুবাদ– আমাদের দেখাচ্ছে, কীভাবে জানার অধিকারের ব্যাপকতর চর্চা সম্ভব এবং এরূপ চর্চার মাধ্যমে যে জ্ঞানগত ভিত্তি তৈরি হয় তা কীভাবে নাগরিকদের নিজস্ব অধিকার ভোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। পাশাপাশি বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থটি আমাদের সামনে এই সত্যও উন্মোচন করে যে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা ও মানবাধিকারের বাস্তবায়নের জন্য জানার অধিকার মৌলিক ও জরুরি বিষয়। সুপরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ সকল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল ও কাঠামোতে জানার অধিকার বর্তমানে মর্যাদার সঙ্গে স্বীকৃত। আঞ্চলিক পর্যায়েও মানবাধিকারের যেসব মানদ ও নিশ্চয়তামূলক ঘোষণা বিভিন্ন দেশের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত সেখানেও জানার অধিকার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। তারপরও এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন তৈরি এবং জাতীয় আইনসভায় তার অনুমোদন এই অধিকার বাস্তবায়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই গ্রন্থ তথ্য স্বাধীনতা বিষয়ক অন্যান্য দেশের আইনগুলো থেকে জানার অধিকারের বিভিন্ন দরকারি উপাদান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবে আমাদের।

এখন প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশে এই আইনকে কীভাবে কার্যকর করা যায়? সেক্ষেত্রে এ বইটি ব্যবহারিকভাবে অত্যন্ত মূল্যবান দিকনির্দেশনা হিসেবে ভূমিকা রাখবে। নাগরিকদের তরফ থেকে সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচিতে আরো অধিক হারে অংশগ্রহণ এবং অধিকার আদায়ের পথে করণীয় সম্পর্কে বহু নজির ভিত্তিক আলোচনা রয়েছে গ্রন্থে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের অনেক কেসস্টাডি তুলে ধরে এখানে দেখানো হয়েছে, কীভাবে অন্যান্য সমাজে জানার অধিকারের চর্চা হচ্ছে।

নাগরিক অধিকার অর্জনের পথে তথ্য স্বাধীনতার কৌশলগত ভূমিকা হিসেবে কেসস্টাডিগুলো দেখিয়েছে কীভাবে জানার অধিকার জ্যামাইকায় শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করেছে, কীভাবে প্রার্থীর তরফ থেকে ভোটারদের তথ্য জানানোর বাধ্যবাধকতা ভারতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচনকে আরো অর্থবহ করে তুলেছে, ইত্যাদি।

বাংলাদেশে যদিও সম্প্রতি পাস হওয়া আইনটি প্রত্যাশা মতো সর্বোচ্চ মাত্রায় তথ্য প্রকাশকে অনুমোদন দেয়নি– তারপরও এই আইন আমাদের জন্য একটা সম্ভাবনা তৈরি করেছে অবশ্যই। এই আইনকে ব্যবহার করে জানার অধিকারের চর্চার মাধ্যমে আমরা অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার কায়েম করার চেষ্টা চালাতে পারবো। যেমন, নারী এই আইন ব্যবহার করে কোন বৈষম্যমূলক নীতির চর্চা হচ্ছে কি না সেটা অনুসন্ধান করতে পারবে এবং বলাবাহুল্য, তা পাল্টাতেও সচেষ্ট হবে। অনেক গ্রামেই এই আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য জনগণকে জানতে সাহায্য করবে তাদের এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তামূলক সরকারী কর্মসূচিতে প্রতিশ্রুতি মতো পণ্য সমগ্রী বিতরণ হচ্ছে কি না। পাঠক এরকম বহু দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে পাবেন– যা থেকে স্পষ্টতা তৈরি হবে যে, কোন্ ধরনের তথ্য কী প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান চালাতে হবে এবং প্রাপ্ত তথ্যের জ্ঞানগত ব্যবহার করে কীভাবে অধিকার লঙ্ঘনের সংশোধন ঘটানো যায়।

এখন জানা জরুরি যে, তথ্য স্বাধীনতার চর্চা নাগরিকদের সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, আর এটা হলো গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের একেবারে প্রাথমিক পদক্ষেপ। প্রয়োজনীয় সকল তথ্য না থাকলে একটা বিষয়ে নাগরিকরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এইরূপ সচেতন সিদ্ধান্ত নেয়ার মধ্যদিয়েই কেবল নাগরিক সমাজ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের শাসন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে পারেন। পাশাপাশি শাসন প্রক্রিয়ায় সংশি-ষ্ট থাকার মধ্যদিয়েই কেবল নাগরিক সমাজ তার অধিকার সুরক্ষায় দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে। আমাদের দেশে নাগরিক অধিকার রক্ষায় জনগণের মাঝে উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারে এই গ্রন্থের বহু দৃষ্টান্ত– যার মাধ্যমে এখানে আরো খোলামেলা একটি সামাজিক পরিবেশ যেমন তৈরি হবে, তেমনি সৃষ্টি হবে দায়িত্বশীল সামাজিক আবহ।

হামিদা হোসেন
ভাইস চেয়ারপারসন
নাগরিক উদ্যোগ

মুখবন্ধ

দীর্ঘদিন ধরেই জানার অধিকারকে একজন স্বাধীন নাগরিকের ‘মৌলিক অধিকার’ হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্য অনেক অধিকারের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে এই অধিকার। কোনো সমাজ যদি তার নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার বা তথ্যে অভিগম্যতার অধিকারের জন্য যথেষ্ট আইনগত কাঠামো তৈরি করে না দেয় এবং সেই আইনগত অধিকারের চর্চার সুযোগ না থাকে, তবে তাকে কোনো অর্থেই মুক্ত সমাজ বলা যায় না। একইভাবে কোন সরকার, যে নিজেকে গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে, তার পক্ষে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের সামর্থ্য ও অধিকারকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়; অর্থাৎ কোন সরকার কখনো স্বচ্ছতার দাবি অগ্রাহ্য করতে পারে না। অনেক দেশে বিষয়টি ‘তথ্যের স্বাধীনতা’ হিসেবে, আবার কোথাও কোথাও সম্প্রতি ‘তথ্যের অধিকার’ হিসেবে উলে-খিত হলেও মূল বিষয় হলো, তথ্য বিষয়ক আইন করে তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার জনগণের জানার অধিকারের নিশ্চয়তা দেবে।

তথ্যের স্বাধীনতার অনুশীলন অনেক দেশেই এখন পরিণত রূপ পেয়েছে। তবে বহু দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই অধিকার তুলনামূলকভাবে অবিকশিত। শেষোক্ত তালিকায় রয়েছে ঔপনিবেশিক অবস্থা থেকে সদ্য মুক্ত দেশগুলো, যেখানে পদমর্যাদা আর ক্ষমতার স্তরভিত্তিক রক্ষণশীল কাঠামো এখনো প্রেতাত্মার মতো টিকে আছে। যেখানে জনগণের দক্ষতা প্রতিনিয়ত অতি অল্প মূল্যে লুণ্ঠিত হয় এবং এরূপ ঔপনিবেশিক শাসক-মননের চূড়ান্ত ফল হিসেবে অর্থনীতিতে ঘটছে নিরন্তর বিনাশ। এ রকম ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার কোন স্থান নেই। জবাবদিহিতা মানে সেখানে প্রতিনিয়ত ঔপনিবেশিক ‘শাসন কাঠামো’কে শক্তিশালী করা, জনগণের অংশগ্রহণকে নয়। দুর্ভাগ্যজনক যে, অনেক দেশ, বহু বছর আগে স্বাধীন হয়েছে– কিন্তু জনগণের কাছে তথ্যকে আড়াল করার সংস্কৃতি শাসকরা ধরে রেখেছে যত্ন করে। ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট-এর মতো কুটিল আইনগুলো তারা ফৌজদারি দণ্ডবিধি থেকে এখনো অপসারণ করেনি– যা তাদের স্বাধীনতার অঙ্গীকারের অনেকখানি বরখেলাপ। অথচ এসব আইন বিদেশি শাসকদের সময়ে এই ধারণা থেকেই তৈরি যে, জনগণ হলো প্রতিপক্ষ– যাদের রাষ্ট্রীয় তথ্য জানার অধিকার নেই। তাদের কাছে প্রভুরূপী সরকারের কোনো কিছু ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। বর্তমানের গণতান্ত্রিক সমতাভিত্তিক বিশ্বসমাজে এ ধরনের চিন্তাধারার কোনো ঠাঁই নেই। নেই বৈধতা। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করেই দেশে দেশে গোপনীয়তার বদলে স্বচ্ছতা ও উন্মুক্তকরণের দিকে ঝোঁক তৈরি হয়েছে। গত শতাব্দীর শেষ দশকে অন্তত ৪০টি দেশে শাসন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জনগণের জানার অধিকারকে একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই)-এর এই প্রকাশনা ‘আমাদের তথ্য– আমাদের অধিকার : অধিকার আদায়ে জনগণের জ্ঞানভিত্তিক ক্ষমতায়ন’ দেখাবে যে, পুরানো ব্যবস্থা বদলাতে এবং প্রতিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কীভাবে তাদের তথ্য অধিকারকে কাজে লাগিয়েছে এবং অন্য ধরনের অধিকারগুলো কায়েম করেছে। এই প্রকাশনার অভিজ্ঞতাগুলো এমন এক ঐতিহাসিক সময়ে উপস্থাপিত হচ্ছে, যখন অধিকারের ধারণায়ও বহু বিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। অতীতে অধিকারের বহু ধারণা দুর্বোধ্য কথার কথা হিসেবে কেবল সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু জাতিসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদের মাধ্যমে এখন তার অনেক কিছু সর্বসাধারণের মৌলিক অধিকার

হিসেবে স্বীকৃত। এই প্রকাশনায় বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে এটা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, জানার অধিকার জেন্ডার সমতাসহ সামাজিক উন্নয়নের বহু ক্ষেত্রে যেমন জরুরি, তেমনি খাদ্য ও পানির মতো মানব সমাজের অপরিহার্য চাহিদাগুলোর রক্ষাকবচ হিসেবে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নও নিশ্চিত করে তা।

যারাই নিজ নিজ সমাজে উলে-খিত অধিকারগুলোর বাস্তবায়নে কাজ করছেন তাদের জন্য এই প্রকাশনা অতি প্রয়োজনীয় সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ভূমিকা রাখবে। অনেক দেশে তথ্য অধিকার বিষয়ে এখনো কোন আইন তৈরি হয়নি। অনেক স্থানে আবার এ রকম আইনের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত হয়ে মানুষ তার অধিকার আদায়ে কাজ করতে শুরু করেছে। এরূপ উভয় ক্ষেত্রেই মানবাধিকার কর্মীদের জন্য এই গ্রন্থ প্রাসঙ্গিক হবে বলেই বিবেচনা করি। সিএইচআরআই-এর সদর দপ্তর যেখানে, সেই ভারতে ২০০৫ সালে তথ্য অধিকার বিষয়ে একটি আইন হয়েছে। অনেকেই বলছেন, ভারতীয় সংবিধান তৈরির পর এই আইনটি হলো ওই দেশের সবচেয়ে প্রগতিশীল বিধান। জনমানসে এই আইনের প্রভাব পড়েছে বিদ্যুৎ গতিতে। ইতিমধ্যে মাত্র কয়েক বছরে এই আইন বিশেষ দৃঢ়তা ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। যে কারণে কায়েমি শক্তি সেখানে এই আইন স্থগিত, সংশোধন ও জটিল করার যেসব চেষ্টা নিয়েছিল, জনগণের শক্তিশালী প্রতিরোধে তা ব্যর্থ হয়েছে। এই আইন রক্ষায় জনগণ সেখানে তীব্র সচেতনতা দেখিয়েছে। সিএইচআরআই-ও এই আইনের রক্ষা ও ব্যবহারে সর্বত্র সামনের সারিতে থেকে কাজ করেছে। পাশাপাশি তথ্য ও জানার অধিকার বিষয়ে সিএইচআরআই-এর প্রচারণা দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছে। সুশাসন নিশ্চিত করা, উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বেগবান করা এবং দরিদ্র অবস্থার উন্নয়নে আর কোন আইন এককভাবে এতটা ব্যাপকভিত্তিক ভূমিকা রাখতে পারে না, যা পারে তথ্য অধিকার আইন। সিএইচআরআই-এর সকল প্রচেষ্টা এই বিশ্বাসকেই উর্ধ্বে তুলে ধরছে। 'আমাদের তথ্য–আমাদের অধিকার : অধিকার আদায়ে জনগণের জ্ঞানভিত্তিক ক্ষমতায়ন' সেই মূল্যবোধেরই সাক্ষী, যা সিএইচআরআই সকল জাতি ও জনসমাজে ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী। সকলে যাতে তথ্য অধিকার চর্চা করতে পারেন তার মৌলিক ভিত্তি শক্তিশালী করতে রোডম্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ নিশ্চিতভাবেই সহায়ক হবে।

ওয়াজাহাত হাবিবুল-াহ
চিফ ইনফরমেশন কমিশনার
সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন
ভারত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সিএইচআরআই যাদের কাছে ঋণ স্বীকার করছে–

অদিতি দত্ত, গুদরুন দিউই, সোফি আর্নশ, ক্যারোলিন গোমেজ, এলিসন রায়ান, এলিজাবেথ উয়েভার, কল্পনা যাদব, সাথী কাপুর, পেটা ফিৎজিব্বন, জেনিফার রীচি এবং কেনেলি টার্ভাইল।

নিম্নোক্ত বেসরকারি সংগঠনগুলোর সহকর্মী বন্ধুরাও এই গ্রন্থ তৈরির প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেছেন। তাদেরও ধন্যবাদ–

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল
আর্টিক্যাল ১৯
অ্যাসোসিয়েশন ফর ডিমোক্রেটিক রিফর্ম
সেন্টার ফর পিস এবং ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
ইউরোপিয়ান রোমা রাইটস সেন্টার
জ্যামাইকান ফর জাস্টিস
মেক্সিকান ইনস্টিটিউট অব এনভায়রনমেন্টাল রাইটস্
ওপেন জাস্টিস ইনিশিয়েটিভ
পরিবর্তন
রুরাল ডেভেলপমেন্ট ভলেন্টিয়ার অ্যাসোসিয়েশন
টেররাম
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল
ভিআইকে (উলফ্) ফরেস্ট প্রটেকশন মুভমেন্ট
উইমেন অব উগান্ডা নেটওয়ার্ক

প্রচ্ছদ
চেনথিলকুমার পরামাশিবম

বিন্যাস
মিঠু আহমেদ

মুদ্রণ
চৌধুরী প্রিন্টার্স অ্যান্ড সাপ-াই
৪৮/এ/১, বাড্ডানগর লেন, পিলখানা, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সূচিপত্র

ভূমিকা ১২

তথ্য : যে অধিকার অন্য অধিকারগুলো আদায়ের হাতিয়ার

অধ্যায় এক ১৫

তথ্য অধিকারের সুফল

মানবাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হতে মানুষকে শক্তি জোগানো

মানবাধিকারের সৌধ গড়ে ওঠে গণতন্ত্রের মাধ্যমে

গণতন্ত্রের সৌধ গড়ে ওঠে অবাধ তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তথ্য

দারিদ্র্য বিমোচন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো

সংলাপ, আলোচনা ও অংশীদারিত্ব

সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যমের সহায়তায় তথ্য অধিকার

সংঘাত প্রতিরোধ এবং সংঘাত পরবর্তী সমঝোতায় তথ্য যেভাবে ভূমিকা রাখে

অধ্যায় দুই ৩৫

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামোতে তথ্য অধিকারের গুরুত্ব

তথ্য অধিকারের সুরক্ষা

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

জাতিসঙ্ঘ

আফ্রিকান ইউনিয়ন

অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেইটস্

কাউন্সিল অব ইউরোপ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

আরহাস (Aarhus) সনদ

এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল

কমনওয়েলথ

তথ্য অধিকার 'অন্য সকল অধিকারের কষ্টিপাথর' তুল্য

অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার

অধিকার আন্দোলনের 'তৃতীয় প্রজন্ম' তথা গ্রুপভিত্তিক অধিকার

অধ্যায় তিন ৫১

জাতীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার

তথ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে সরকারগুলো যা করছে

স্বউদ্যোগে সরকারি তরফ থেকে জনগণকে তথ্য জানানো

কিছু বিশেষ ধরনের তথ্য পেতে আইন
তথ্য অধিকারের সাংবিধানিক সুরক্ষা
তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনগুলো
তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করতে আইন তৈরিই হলো সর্বোত্তম পন্থা
তথ্য অধিকারের সুরক্ষায় তৈরি আইনে যা থাকা উচিত
সর্বোচ্চ মাত্রায় তথ্য উন্মুক্তকরণ
তথ্য অব্যাহতি ন্যূনতম মাত্রায় সীমিত রাখা
সহজে তথ্য পাওয়ার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি
তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে স্বাধীন আপিল কাঠামো
প্রশিক্ষণ ও জনশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শাসন প্রক্রিয়ায় খোলামেলা বৈশিষ্ট্য উৎসাহিতকরণ
তদারকির বাস্তবায়ন
তদারকি বাস্তবায়নের গুরুত্ব
তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা রক্ষায় নজরদারি ব্যবস্থা

অধ্যায় চার ৬৪
আমাদের তথ্য আমাদের অধিকার : নানান দেশের নানান অঞ্চলের অভিজ্ঞতা
শিশু অধিকার
উন্মুক্ত তথ্যের চাপে শিশু সেবার মানোন্নয়নে বাধ্য হলো জ্যামাইকা সরকার
ক্রেতা ও ভোক্তা অধিকার
কর্নগেট কেলেঙ্কারি
শিক্ষার অধিকার
স্কুলের ভর্তি কেলেঙ্কারি যেভাবে থাই শিশুদের বিচার প্রার্থনার পথ উন্মুক্ত করলো
স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের অধিকার
তথ্য অধিকার আইন স্লোভাক জনগণকে বন রক্ষায় সাহায্য করেছে
খাদ্য অধিকার
ভারতে তথ্য অধিকার আইনে গরিবের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো যেভাবে
নারী-পুরুষের সমান অধিকার
সমকাজে সমমজুরির নীতি ও তথ্য অধিকার আইন: বিবিসিতে যেভাবে জেন্ডার বৈষম্যের তথ্য ফাঁস হলো
স্বাস্থ্যের অধিকার
রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রবীণনিবাসের বেহাল দশা ফাঁস এবং প্রবীণদের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে আইরিশ সরকারের উদ্যোগ
ড্রাগ সংক্রান্ত তথ্যের অপর্যাপ্ততায় অস্ট্রেলিয়ার নারীদের স্বাস্থ্য অধিকার ক্ষুণ্ন
জীবনের অধিকার
ইরানে সমকামীদের গণমৃত্যুদণ্ডের খবর ফাঁস হলো তথ্য অধিকারের প্রয়োগে
জীবন ও মৃত্যুতেও তথ্য অধিকার যখন ভূমিকা রাখে
সুনামি আক্রান্তদের বাধ্যতামূলক নাম ঘোষণায় আতঙ্কিত সুইডিশদের স্বস্তি
সমতার অধিকার, জাতিগত বৈষম্য ও তথ্য অধিকার
পুলিশের বর্ণবাদী বৈষম্যের রেকর্ডকৃত কথোপকথন প্রকাশ হয়ে পড়ায় অসাম্য নিরসনে
কানাডা সরকারের উদ্যোগ

ধর্মচর্চার অধিকার

গ্রিসের ন্যায়পালের প্রতিবেদন : তথ্যের অপ্রাপ্তি সংখ্যালঘু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিপীড়ন তীব্র করে

নির্যাতন থেকে মুক্তির অধিকার

নীরবতাও অনেক সময় নির্যাতন উসকে দিতে পারে: আর্ন্তজাতিক চাপের মুখে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ডিটেনশন ক্যাম্প সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ

পানির অধিকার

দিলি-র পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিশ্বব্যাংকের হস্তক্ষেপে জরুরি সংস্কার ব্যাহত হলো যেভাবে

সংযুক্তি-১ .... ১১৯

টীকা ও তথ্যসূত্র ১২৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ১৫৪

যেসব দেশ থেকে কেসস্টাডি নেয়া হয়েছে

সৌজন্যে: University of Texas Libraries, The University of Texas at Austin

ভূমিকা

তথ্য : যে অধিকার অন্য অধিকারগুলো আদায়ের হাতিয়ার

তথ্য অধিকার মানবাধিকার হিসেবে বিশেষভাবে অনন্য। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার আইনে তথ্য-অধিকারের স্বীকৃতি পুরোপুরি মৌলিক অধিকার হিসেবে। সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ ও আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদের কথা এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়।[১] তবে শুধু আন্তর্জাতিক আইনগত স্বীকৃতি ও বৈধতার কারণেই নয়, বিশ্বজুড়ে অগণিত উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, যেখানে জনগণ তথ্যকে এক শক্তিশালী অধিকার-হাতিয়ার হিসেবে প্রত্যহ ব্যবহার করছে। তথ্যই শক্তি। তথ্যই জনগণের মাঝে সেই জ্ঞানের উন্মোচন ঘটায় যার মাধ্যমে তারা সরকারের কাছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের দাবি তুলতে পারেন। খাদ্যের অধিকার থেকে নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকার অধিকার পর্যন্ত প্রায় সকল অধিকার এর আওতায় পড়ছে।

আমরা এমন এক তথ্য যুগে বাস করছি যখন কম্পিউটার বা ফোনের একটি বাটনে চাপ দেয়া মাত্র জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ ও তাতে অংশীদার হওয়া সম্ভব এবং বিশ্বকে সত্যি এখন তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় হাতের মুঠোয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একই সময়ে দেখা যায়, বহু মানুষ তথ্যের অভাবে হতাশাগ্রস্ত, তারা শাসন প্রক্রিয়ায় সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, ব্যর্থ হচ্ছে তাদের পছন্দের অধিকার চর্চা করতে। ফলে সরকারকে তাদের কাজের প্রতি দায়বদ্ধও করতে পারছে না। এটা এক দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা। এটা বিশেষভাবে সত্য হয়ে উঠেছে, তথ্য অধিকার যাদের জীবনে অতি জরুরি, সেই গরিব ও প্রান্তিক মানুষের জীবনে। আর সুনির্দিষ্টভাবে বললে, প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণ সহজে না পাওয়ায় এবং অনেক সময় একেবারেই না পাওয়ার ফলে একদিকে তার অধিকার সম্পর্কে জানতে পারছে না, অন্যদিকে সেই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাতেও ব্যর্থ হচ্ছে।

বলাবাহুল্য যে, কোনো একটি সরকারের প্রশাসনিক কাজের জন্যও তথ্যের প্রয়োজন। স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, কোনো বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য কী ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা দরকার, অপরাধ দমন, দরপত্র আহ্বান, প্রকল্প তৈরি, উৎপাদন, ভোগ, অর্থনীতিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রবাহে নজর রাখা, দ্রব্যমূল্যের ওঠা-নামা ইত্যাদি বহু বিচিত্র প্রসঙ্গে সরকারের তথ্য দরকার হয় প্রতি মুহূর্তে। এরূপ তথ্য মাত্রই জনগণের সম্পত্তি। সম্মিলিতভাবে জনগণই এসব তথ্যের মালিক। সরকারের জিম্মায় থাকে অনেক তথ্য; কিন্তু তাতে অধিকার সবার। জনগণের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা এবং তাদের জন্য কাজ করার লক্ষ্যেই গণতন্ত্রে সরকার গঠিত হয়। ফলে তার কাজের জন্য সরকার যে তথ্য সংগ্রহ ও মজুদ করে সেটাও জনস্বার্থেই এবং জনগণের অর্থেই করে– জনগণের প্রয়োজনে কাজে লাগাবে বলে।

তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার, মজুদ এবং পুনঃপুন নবায়ন, সব কার্যক্রমই মুখ্যত এবং একমাত্র বৃহত্তর জনস্বার্থে। সুতরাং এই তথ্য ভাণ্ডারে প্রবেশ এবং তার ব্যবহারে জনগণের স্পষ্ট অধিকার রয়ে গেছে। জনগণ যে কোনো সরকারি তথ্য চাইতে পারে এবং পাওয়ার অধিকারী।

এই অধিকারের কথা বিশ্বজুড়ে বহুভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। কোথাও বলা হচ্ছে 'তথ্য স্বাধীনতা'র কথা। বিভিন্ন

স্থানে অনেকে বলছেন, 'তথ্যে অভিগম্যতা'র কথা বা 'জানার অধিকার'-এর কথা। উপরোক্ত সব শিরোনামের একটিই অর্থ, সরকারের জিম্মায় থাকা তথ্য জনগণের চাওয়া এবং পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এটা মানবাধিকার। এই অধিকার সরকারের জন্য এই বাধ্যবাধকতা তৈরি করে, তথ্য সংগ্রহ ও মজুদের কাঠামোগত রূপটি যেন এমন হয় যে, জনগণ সহজে তথ্য পেতে পারে, জানতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে। জনগণকে সক্রিয়তার সঙ্গে চাহিদামাফিক তথ্য জানানো, তাদের তথ্যের প্রয়োজনীয়তায় ইতিবাচকভাবে সাড়া দেয়া ইত্যাদিও সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এমনকি সরকার যদি কোন তথ্য আড়াল করতে চায় বা প্রকাশ না করার কৌশল নেয়, সেও করতে হবে সর্বোচ্চ জনস্বার্থে এবং জনগণকে জানিয়ে।[২]

তথ্য অধিকারের যথাযথ চর্চার জন্য একটি দেশের অভ্যন্তরীণ জাতীয় আইনে বিষয়টি সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুইডেন হলো এক্ষেত্রে প্রথম দেশ, যে তার জনগণকে আইনগতভাবে তথ্যে অভিগম্যতা এবং তথ্য অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। শুরুতে ১৭৬৬ সালে তারা এমন আইন করে যে, গণমাধ্যম সরকারি তথ্য চাওয়া, পাওয়া ও প্রকাশ করতে পারবে। এই আইন জনগণের জানার সুযোগ উন্মোচন করে দেয় সেখানে।[৩] সেই থেকে এ বিষয়ে বহু আইন হয়েছে। বিশ্বজুড়ে অন্তত ৮০টি দেশে ইতিমধ্যে তথ্য অধিকার বিষয়ক আইন হয়েছে বা এমন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, যাতে জনগণ চাওয়া মাত্রই সরকারের কাছে থাকা তথ্য ব্যবহার করতে পারে।

চাওয়া মাত্র সরকারের কাছে থাকা তথ্য ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া যেকোনো সরকারের দিক থেকে অতি ইতিবাচক একটি পদক্ষেপ। এ ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং দুর্নীতি কমানোর লক্ষ্য অর্জনে সরকার অগ্রগতি সাধন করতে পারে।

অনেক সময় এরূপ সাফল্য অত্যাশ্চর্যই মনে হয় যে, একটি বিশেষ কাঠামো সমাজে এত বহুমুখী ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি সাফল্য বয়ে আনতে পারে কীভাবে। তবে তথ্য অধিকারের এই বহুমাত্রিক লাভালাভ অর্জন সম্ভব জানার অধিকারের আইনগত নিশ্চয়তাভিত্তিক কাঠামো থাকলে এবং যে কোনো গণতান্ত্রিক সংস্কারের একেবারে কেন্দ্রে তাকে স্থাপন করলে। হয়তো সামান্য কিছু বিশেষ ধরনের তথ্য কখনো কখনো সরকার সর্বোচ্চ জনস্বার্থে আড়াল করে বা করতে পারে। ওই ক্ষুদ্র ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সরকারকে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে তথ্যভিত্তিক জ্ঞান ও শক্তিতে জনঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে, নিয়মিত তা জনগণকে সরবরাহ করতে হবে। ফলে পুরানো প্রথা ভেঙে নজিরবিহীন পথে মানুষ তাদেরই শাসন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে সমর্থ হয়। কার্যকর তথ্য অধিকার ব্যবস্থা সরকার ও নাগরিকদের মাঝে সক্রিয় শাসন প্রক্রিয়ায় মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে।

যে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ বা ঘোষণাগুলো অনুমোদন, অনুসমর্থন এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ তৈরি সহজ। এর মাধ্যমে ওই রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার এবং প্রতিকারের রাস্তা তৈরি হয়। কিন্তু এরূপ মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন কার্যকর নীতি ও আইন এবং তার এমন ব্যবহারিক কাঠামো যা নাগরিকদের জানার অধিকার নিশ্চিত করে। একটি দেশের নাগরিকরা তখনি নিজেদের ক্ষমতায়িত ভাবতে পারে যখন তারা সময়মতো সঠিক তথ্য পেতে পারে, জানতে পারে, ব্যবহার করতে পারে এবং সেই তথ্যের আলোকে তার অধিকার সংক্রান্ত বিবিধ রাষ্ট্রীয় নীতিমালাকে বিশে-ষণ করতে সমর্থ হয়। এরূপ তথ্যভিত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমেই কেবল নাগরিক সমাজ পুরানো ধাঁচের ঔপনিবেশিক আদলের কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। তথ্য অধিকার সেই নাগরিক সমাজের জন্যও

সহায়ক, যারা বিদ্যমান আইনগত জনঅধিকারগুলো বাস্তবায়নের জন্য দাবি তুলছেন, লড়াই করছেন।

সেই ১৫৯৭ সালে ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন, 'জ্ঞানই শক্তি'।[৪] এই গ্রন্থে কিছু কেস স্টাডি তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে পাঠক দেখতে পাবেন, তথ্য অধিকার কীভাবে সমাজে নাগরিকদের রাষ্ট্রের কাছে তাদের অধিকারের কথা বলতে, দাবি আদায়ে ক্ষমতা যুগিয়েছে। প্রায় দেশেই নাগরিকদের অধিকার প্রদানে রাষ্ট্র অঙ্গীকারে আবদ্ধ এবং প্রতিশ্রুত। কিন্তু জনগণ উচ্চকিত না হলে সেই অধিকার ও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ঘটে কম ক্ষেত্রেই। তথ্য অধিকার নাগরিকদের এরকম ক্ষেত্রে সোচ্চার হতে সাহস জোগায়। তাকে ক্ষমতায়িত করে তার অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবি তুলতে। উপস্থাপিত কেস স্টাডিগুলো বিভিন্ন পরিমণ্ডল থেকে বাছাই করা হয়েছে। তথ্য অধিকারের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং বহুমাত্রিকতা পাঠক উপলব্ধি করবেন এসব অভিজ্ঞতা থেকে।

প্রথম অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে তথ্য অধিকারের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিবাচক ফল সম্পর্কে। নাগরিকদের অধিকার ও তার প্রয়োজনীয়তা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারকে প্রতিনিয়ত তার অগ্রাধিকার পুনর্বিন্যাস করতে হয়। রাষ্ট্র ও জনগণ উভয়কে এক্ষেত্রে মতামত গঠন করতে হয়। এ জন্য তথ্যের ভূমিকা অপরিহার্য। সংশি-ষ্ট তথ্য না জানলে জনগণ কখনো তার জীবনকে প্রভাবিত করে এমন কোনো নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কে মতামত প্রদান করতে পারবে না। সরকারও সঠিক কর্মকৌশল গ্রহণে ব্যর্থ হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে তথ্য অধিকার সংশি-ষ্ট আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার দলিলগুলো সম্পর্কে। এই হাতিয়ারগুলো 'জানার অধিকার'-এর সুরক্ষায় আইনগত কাঠামো গড়ে তুলতে ধারণা যোগায়। তথ্য অধিকারের ধারণা এখন আর কোন সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই। আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদের (আর্টিক্যাল ১৯) মতো মানবাধিকার বিষয়ক অতীত দলিলগুলোর পাশাপাশি তথ্য অধিকারের গুরুত্ব বাড়ছে মানবাধিকার সংক্রান্ত সাম্প্রতিক চুক্তিগুলোতেও, যেমন শিশু অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদেও এটা বিশেষ মনোযোগ পেয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে পরীক্ষা করা হয়েছে জাতীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকারের বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে। জনগণের জানার অধিকার রক্ষায় দায়বদ্ধ রাষ্ট্র তথ্য অধিকারের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থেকে শুরু করে তথ্য অধিকারের জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি পর্যন্ত কীভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, সেই নিরীক্ষা করা হয়েছে এ পর্যায়ে।

এই গ্রন্থের কেন্দ্রীয় অংশ বস্তুত চতুর্থ অধ্যায়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চয়ন করা কেস স্টাডিগুলো তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, ধর্ম পালনসহ বহু বিষয়ে মানুষের অধিকার, বহু ক্ষেত্রে নাগরিকের স্বার্থ জড়িত। তথ্য এবং জানার অধিকারকে ব্যবহার করে নাগরিকরা কীভাবে দেশে দেশে তার অন্যসব অধিকারের কথা বলছে, দাবি তুলছে, দাবি আদায় করছে– সে সব অভিজ্ঞতাই তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল ধরনের অভিজ্ঞতাই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনেক স্থানে তথ্য অধিকারের অনুপস্থিতি অন্য অনেক মানবাধিকারের লঙ্ঘনকে উৎসাহিত করছে– সেই কেস স্টাডিও রয়েছে এখানে।

তবে কেবল তথ্য অধিকার বিষয়ে নয়– মানবাধিকার, ন্যায়বিচার ও সমাজের গণতন্ত্রায়নের নানা বিষয়ে প্রচার আন্দোলনের কৌশলকে সমৃদ্ধ করতেও এই প্রকাশনা সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

অধ্যায় এক:

তথ্য অধিকারের সুফল

মানবাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হতে মানুষকে শক্তি জোগানো

রাষ্ট্রীয় আক্রমণ বা নিপীড়ন থেকে প্রত্যেক নাগরিকের স্বার্থ এবং মৌলিক প্রয়োজনকে সুরক্ষা দিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনগুলোর বিকাশ সাধন ঘটছে। আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ (ICCPR[১]) এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ (ICESCR[২])-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান জানাতে সম্মত হয়েছে, বিশেষ করে যেসব অধিকার প্রোথিত রয়েছে মানবিক মর্যাদা ও সমতা সম্পর্কিত সর্বজনীন বিশ্ব নীতিমালায়। উপরোক্ত সনদগুলোতে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রপক্ষগুলো মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো লঙ্ঘন থেকে রক্ষা এবং নিজ নিজ ভূখণ্ডের আইন, নীতি ও কর্মসূচিতে সেসব অধিকারের বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ, সেসব অধিকারের বিকাশ সাধন এবং মানুষ যাতে সেই সব অধিকার উপভোগ করতে পারে, সেই লক্ষ্যে ভূমিকা রাখারও অঙ্গীকার করেছে। অনেক চুক্তিতেই সংশি-ষ্টপক্ষের তরফ থেকে নিরপেক্ষ তদারকি সংস্থার কাছে নিয়মিত ব্যবধানে রিপোর্ট প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আইসিসিপিআর (ICCPR)-এর ক্ষেত্রে এই রিপোর্ট প্রদান করতে হয় 'হিউম্যান রাইটস্ কমিটি'র কাছে এবং আইসিইএসসিআর (ICESCR)-এর ক্ষেত্রে 'কমিটি অন ইকোনোমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রাইটস্'-এর কাছে। রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এসব প্রতিবেদন গ্রহণ, তার মাধ্যমে সংশি-ষ্ট মানবাধিকারের অগ্রগতি যাচাই এবং ক্ষেত্র বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোন অভিযোগ পেলে পদ্ধতিগতভাবে তা অনুসন্ধানের জন্যও দায়িত্বশীল হলো উপরোক্ত কাঠামোগুলো।

> তথ্য একটা শক্তি। এর গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমে যে মহাশক্তির জন্ম হচ্ছে, তা যে কী পরিমাণে পরিবর্তনকে প্রভাবিত করা এবং দারিদ্র্য নির্মূলের সুযোগ করে দিচ্ছে আমাদের–তা আমরা আজ কল্পনাও করতে পারবো না। আমাদের কাজ হলো, সকলের কাজ হলো...,এই সুযোগকে সেই সব মানুষের জন্য কাজে লাগানো, যাদের সত্যি পরিবর্তন প্রয়োজন, যেখানেই তারা থাকুন না কেন। সবার কাছে তথ্য থাকা মানেই হলো–সকলের জন্য জ্ঞানের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি হওয়া। এ পথেই দারিদ্র্যের চিহ্নরেখা বিলীন করে দিতে হবে।
>
> *–কফি আনান, জাতিসঙ্ঘের সাবেক মহাসচিব*[৩]

এরূপ বাহ্যিক তদারকির ব্যবস্থা এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মাধ্যমে এটা প্রতিষ্ঠিত হবে, রাষ্ট্রপক্ষগুলো তাদের অঙ্গীকারের ব্যাপারে আন্তরিক এবং নাগরিকদের মানবাধিকারের বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি কেবল কথার কথা নয়। তবে আন্তর্জাতিক তদারকি যতই কার্যকর হোক না কেন, যাদের অধিকার রক্ষার জন্য এত কাঠামোগত প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের, সেই জনগণকেও তাদের অধিকার বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকায় থাকার মতো ক্ষমতায়িত হতে হবে। আন্তর্জাতিক পরিসরে একটি রাষ্ট্র তার নাগরিকদের অধিকার বিষয়ে যেসব অঙ্গীকার করছে, তার যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না সে বিষয়ে নাগরিকদের তরফ থেকেও পুঙ্খানুপুঙ্খ সচেতনতা জরুরি।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডগুলো বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো, অনেক রাষ্ট্র তার জনগণকে তাদের মৌলিক অধিকার বিষয়ে আগ্রহভরে নিজে থেকে সচেতন করতে পুনঃপুন ব্যর্থ। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তথ্য চাহিদার ক্ষেত্রেও জনগণ প্রায়ই রাষ্ট্রের তরফ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়। নিজে থেকে তথ্য প্রদানে রাষ্ট্রের তরফ থেকে অস্বীকৃতি দেখা যাচ্ছে। গণমাধ্যম বা নাগরিক অধিকার কর্মীদের প্রচারণার মাধ্যমে জনগণ যখন তার অধিকার সম্পর্কে জানে, তখনো নিজের অসহায়ত্ব ঘোচে না তার। কারণ নিজের জীবনে সেই অধিকারের বাস্তবায়নে কিছুই করে উঠতে পারে না সে। এ রকম পরিবেশে তথ্য অধিকার বা তথ্য স্বাধীনতা নিশ্চিত হলে সুবিধা দ্বিবিধ। প্রথমত, এর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন নীতি, সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানার আইনগত অধিকার পায় জনগণ; দ্বিতীয়ত, এই অধিকারের শক্তিতে জনগণ নিজেকে রাজনৈতিক সংলাপের একেবারে কেন্দ্রে স্থাপন করতে পারে। এ কারণে জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে ১৯৪৬ সালে এই স্বীকৃতি এসেছিল, 'তথ্যের স্বাধীনতা একটি মৌলিক মানবাধিকার। অন্য সকল স্বাধীনতা অর্জনেও এটা পরশ পাথরতুল্য, যেসব স্বাধীনতার জন্য জাতিসঙ্ঘ উৎসর্গকৃত।'[৪]

মানবাধিকারের সৌধ গড়ে ওঠে গণতন্ত্রের মাধ্যমে

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের আদর্শিক ভাবনা পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। উভয়ই দাঁড়িয়ে আছে এই মৌলিক বিশ্বাসের ওপর যে, সকল মানুষের সমানাধিকার রয়েছে। এ সাম্য চেতনার আলোকেই সকল মানুষের অধিকার রয়েছে তাদের শাসন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখা এবং আইনের কাছ থেকে সমান সুরক্ষা পাওয়ার। ১৯৯১ সালে গৃহীত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলোর হারারে ঘোষণাতেও[৫] রাষ্ট্রনেতারা একই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি তুলেছিলেন এই বলে, "প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনতার আইনসম্মত স্বীকৃতি থাকতে হবে, লিঙ্গ-বর্ণ-গায়ের রঙ-ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাস নির্বিশেষে প্রত্যেকের সমানাধিকার থাকতে হবে। পাশাপাশি যেসব কার্যক্রমের মাধ্যমে নাগরিকের স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে তাতে এবং মানুষ যেখানে থাকছে, সেই সমাজের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অবিছিন্ন অধিকারও থাকবে সবার।"[৬]

গণতন্ত্রের সৌধ গড়ে ওঠে অবাধ তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে

সরকারি নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়া থেকে জনগণকে দূরে রাখার আইনগত এবং ব্যবস্থাপনাগত একটি প্রবণতা সর্বত্রই কমবেশি আছে। কিন্তু গণতন্ত্রকে সঠিক পথে সক্রিয় রাখতে হলে এই প্রবণতা মোকাবেলার বাস্তব সুরক্ষা থাকতে হবে। এরূপ সুরক্ষা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ অনেক সময় সরকারের নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অন্ধকারের রাখার চেষ্টা করা হয়। জনপ্রতিনিধিত্বশীল শাসনের নীতির ওপর গণতন্ত্র গড়ে ওঠে। সুতরাং অপরিহার্যভাবে রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্তৃপক্ষ খোলমেলা

> সবার মতপ্রকাশের অধিকার থাকবে। এই অধিকারের মধ্যে পড়বে সরকারি কাজের ক্ষেত্র নির্বিশেষে সকল ধরনের তথ্য ও পরিকল্পনা মৌখিক বা লিখিত কিংবা ছাপার অক্ষরে পছন্দমতো মাধ্যমে চাওয়া, পাওয়া এবং বিনিময়ের অধিকার।
>
> *–আর্টিক্যাল ১৯, আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ*[৭]

ভাবে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, কথা বলবে এটাই প্রত্যাশিত। একমাত্র এ পথেই জনস্বার্থ সংশ্লি-ষ্ট ইস্যুগুলোতে জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা স্পষ্ট হয়; যদিও বারবারই দেখা যায়, 'গোপনীয়' তথ্য প্রকাশে সরকার মাত্রই অতিসর্তক এবং তার প্রবণতাই থাকে তথ্যকে আড়াল করার।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, সচরাচর গোপনীয়তার সংস্কৃতি লালনকারী সরকারগুলোই পদ্ধতিগতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে বেশি। এ কারণে তার অধিকার সম্পর্কে, সেই অধিকার রক্ষায় সরকার কী করছে সে সম্পর্কে জানতে সঠিক তথ্যের অবাধ প্রবাহভিত্তিক স্বচ্ছ ও আন্তরিক সংলাপ নাগরিকদের তরফ থেকে খুবই জরুরি। এটা ছাড়া জনগণ বুঝতে পারে না কোথায় তাদের অধিকার খর্ব হচ্ছে এবং সেই লঙ্ঘন সংশোধনে সরকার কী করছে এবং সেই সংশোধন প্রক্রিয়ায় নাগরিকের অংশগ্রহণ কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছে।

এই নীতির এক বড় স্বীকৃতি এসেছিল আইসিসিপিআর (ICCPR)-এর ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের মাধ্যমে। তবে অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলগুলোও একই নীতিকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। নারী অধিকার বিষয়ক সিডও (CEDAW) সনদ[৮] থেকে শুরু করে শিশু অধিকার বিষয়ক (CRC)[৯] সনদ পর্যন্ত সকল অধিকারের জন্য এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন আর পরিবেশগত পরিছন্নতা ও নিরাপত্তা (রিও ঘোষণা)[১০]-র জন্য তথ্য অধিকারকে বিবেচনা করা হয় অতি জরুরি "সহায়ক" অধিকার হিসেবে, যা অন্য সকল অধিকার ভোগকে বাস্তব করে তোলে। অন্যভাবে বললে, মানবাধিকারের প্রয়োজনে তথ্যে অভিগম্যতা এত জরুরি যে, আন্তর্জাতিক আইনে একে বিবেচনা করা হয় অবিভাজ্য এবং আবশ্যক এক শর্ত হিসেবে।

কানাডাঃ তথ্যের সাহায্যে নিজেদের সুরক্ষা করছে জনগণ

কানাডার আদালত এই স্বীকৃতি দিয়েছে যে, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিজেদের সুরক্ষার স্বার্থে প্রয়োজনীয় তথ্যে নাগরিকদের অভিগম্যতা থাকতে হবে। নিজেকে রক্ষায় নাগরিকদের অধিক সক্ষম করে তোলে তথ্য।

১৯৮৬ সালে ওই দেশে একজন নারী যৌন আক্রমণের শিকার হন। তিনি তখন আদালতে এই মর্মে আর্জি জানান যে, স্থানীয় পুলিশের কাছে একজন যৌন অপরাধী সম্পর্কে তথ্য থাকার পরও তারা সবাইকে সেটি জানায়নি বলেই তিনি অপরাধের শিকার হয়েছেন।[১১] পুলিশ ওই অপরাধীর পরিচয় প্রকাশ না করে এ অপেক্ষায় ছিল যে, সে আরেক দফা অপরাধ করার উদ্যোগ নিলেই তাকে ধরতে সুবিধা হবে।

কানাডার ওই আদালত তখন এই মর্মে সিদ্ধান্ত দেয় যে, নিজেদের কাছে থাকা যৌন অপরাধীর তথ্য আড়াল করে রেখে পুলিশ কানাডার 'অধিকার ও স্বাধীনতা সনদ'-এর ৭ (ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিষয়ক) এবং ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদ (আইনের তরফ থেকে সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার) লঙ্ঘন করেছে।[১২] আদালত তখন নির্দেশনা দেয়, পুলিশসহ কানাডার সংশি-ষ্ট দফতরগুলোর দায়িত্ব হলো নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি সম্পর্কে আগে থেকে তাদের অবহিত রাখা।[১৩]

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে

গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে তথ্য অধিকারের বিশেষ গুরুত্ব দৃষ্টিগোচর হয় নির্বাচনকালে। নাগরিকরা জনস্বার্থে প্রার্থীদের অতীত ভূমিকার সকল ধরনের তথ্যে সমৃদ্ধ থাকবেন এবং তার আলোকেই তাদের পছন্দের অধিকারের সত্যিকারের সচেতন ও সুচিন্তিত চর্চা করতে পারবেন, নির্বাচিত করতে পারবেন নিজেদের প্রতিনিধি– এই অঙ্গীকারের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে গণতন্ত্রে নির্বাচনী ঐতিহ্য।

ভারত : নির্বাচনী প্রার্থীদের অতীত সম্পর্কে জানার অধিকারের চর্চা

ভারতে ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৭০ কোটি। নির্বাচন সেখানে সত্যি ব্যয়সাপেক্ষ। যদিও বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের ব্যয়ভারের সীমা বেঁধে দেয়া আছে– তবুও ১৯৯০-পরবর্তী গবেষণায় দেখা গেছে, বড় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেয়া ব্যয়সীমার অন্তত দশগুণ বেশি ব্যয় করেন। অতিরিক্ত এই অর্থ ব্যয় করতে পারেন প্রার্থীরা নির্বাচনী আইনের ত্রুটির সুযোগে। প্রার্থীরা দাবি করে থাকেন, নির্বাচনে অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে তাদের দলীয় ও ব্যক্তিগত সমর্থকদের দ্বারা। প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন বা প্রভাবিত করতে প্রার্থীদের অর্থ ও পেশিশক্তির এই অতিরিক্ত ব্যবহার সম্পর্কে গণমাধ্যমে বিস্তর প্রচার দেখা যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী তালিকায় অপরাধের রেকর্ড রয়েছে এমন ব্যক্তিদের মনোনয়ন ক্রমাগতভাবে বেড়ে যাওয়ায় শেষপর্যন্ত ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন' বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয়।

একই ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডিমোক্রেটিক রিফর্ম (এডিআর)-এর এক জনস্বার্থ মামলায় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে রুল জারি করেন যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের নির্বাচনে যারাই প্রার্থী হবেন, তাদের অতীত সম্পর্কে

বিস্তারিত জানা ভোটারের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। এটা ছাড়া ব্যালট বক্সে সচেতন মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে না। সুপ্রিম কোর্ট এই মতামতের আলোকে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশনা দেয় প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি প্রদান বাধ্যতামূলক করতে। সেই তথ্য জনসম্মুখে উন্মোচনেরও দায়িত্ব বর্তায় কমিশনের ওপর। এই সিদ্ধান্তের আলোকে প্রার্থীদের যেসব তথ্য জানানো এখন বাধ্যতামূলক তা হলো : প্রার্থী, তার স্ত্রী এবং তার উপর নির্ভরশীলদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ; প্রার্থীর বিরুদ্ধে সর্বনিম্ন ছয় মাস থেকে অধিক পুরানো ফৌজদারি মামলার বিবরণ (মীমাংসাধীন বা সর্বশেষ ছয় মাসে মীমাংসা হয়েছে এমন মামলা); শিক্ষাগত যোগ্যতা; সরকারি কোনো সেবার বকেয়া বিল সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি।

কোর্টের এই রায়কে অকার্যকর করে দেয়ার জন্য প্রায় সব রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় দ্রুত এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে তারা বাধ্য করে একে অকার্যকর করে একটি অধ্যাদেশ তৈরি করতে। তবে ২০০৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট ওই অধ্যাদেশকেও 'ভোটারদের তথ্য জানার মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন' বলে অবৈধ আখ্যায়িত করে। এর পর থেকে নির্বাচনী প্রার্থিতার আবেদনের সময় আর্থিক ও ফৌজদারি বিষয়ে অতীত তথ্যাদি দেয়া প্রার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রথায় পরিণত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন পরবর্তীকালে তাদের ওয়েব সাইটে ওই সব তথ্য প্রকাশ করে থাকে।[১৪] বর্তমানে কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটভ (সিএইচআরআই) ও এসোসিয়েশন ফর ডিমোক্রেটিক রিফর্ম (এডিআর) যৌথভাবে 'ইলেকশান ওয়াচ গ্রুপ' গঠন করে প্রার্থীদের দেয়া তথ্যাদি বিশে-ষণ করে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে তা তুলে ধরে।[১৫]

ভারতের নির্বাচনে তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে অর্জিত এই অগ্রগতি বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার আন্দোলনকেও উদ্বুদ্ধ করেছে একই কার্যক্রম গ্রহণে। প্রার্থীদের অতীত তথ্যা পেতে নির্বাচন কমিশনকে দিকনির্দেশনা দিতে সেখানেও উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন মানবাধিকার কর্মীরা, যার পরিণতিতে নবম সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশেও নির্বাচনী প্রার্থীদের আর্থিক ও আইনগত তথ্য সম্পর্কে আগ্রহী ভোটাররা জানতে পেরেছেন। ফলে তারা প্রার্থী বাছাই করতে পেরেছেন অনেক স্বচ্ছন্দে।

প্রার্থিদের নির্বাচনী তথ্যাদি জানা ভোটারদের জন্য অতি জরুরি। প্রার্থীর সঠিক জীবনবৃত্তান্ত, অতীত ভূমিকা যখন জনসম্মুখের আড়ালে থাকে তখন ভোটারদের মাঝে গুজব বা শোনা কথার ভিত্তিতে মতামত প্রদানের প্রবণতা দেখা দেয়। প্রার্থীর শাসন সংক্রান্ত অতীত ভূমিকা বাদ দিয়ে ভোটাররা তখন ধর্ম-বর্ণ-জাতিগত পরিচয়ের গুরুত্বহীন বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে পড়েন, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। দুষ্টচক্রগুলো গণতন্ত্রের এ পরিণতিই চায়।

কেবল নির্বাচনের জন্য নয়, দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার জন্যও নাগরিকদের প্রধান প্রয়োজন পর্যাপ্ত তথ্য। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তথ্যের মাধ্যমেই বহুবিদ জ্ঞানে নিজেদের সমৃদ্ধ করেন নাগরিকরা। রাষ্ট্র কী করছে, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সরকারের কর্মকাণ্ড কী প্রভাব ফেলছে, সেসব ধারণা নাগরিকরা গঠন করতে পারেন তথ্যের পর্যাপ্ত প্রবাহ থাকলে। তথ্য সমৃদ্ধ নাগরিকরা সরকারি কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতে এবং এসব কাজের আরো কার্যকারিতা বাড়াতে বিকল্প সুপারিশ তুলে ধরতে পারেন। এসব বিবেচনায় বলা যায়, আনুষ্ঠানিক ধাঁচের গণতন্ত্রকে জবাবদিহিতা ও সংলাপভিত্তিক গণতন্ত্রে পরিণত করা যায় অবাধ তথ্য প্রবাহের মাধ্যমেই।[১৬]

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তথ্য

যে কোনো দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য দুর্নীতিকে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা বলে বহু দিন ধরে বলছে বিশ্বব্যাংক। এই সংস্থার এও সুপারিশ যে, দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে দারিদ্র্য নির্মূলে সাফল্য আসবে না।[১৭] বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর কেবল ঘুষের মাধ্যমেই খরচ হয় এক ট্রিলিয়ন ডলার। এই হিসাব শুধু বিশ্বজুড়ে সম্প্রসারিত বড় আকারের লেনদেনগুলোর। দেশে দেশে যে ছোট ছোট আত্মসাৎ প্রক্রিয়া সক্রিয় সে হিসাব এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৮] সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি মাত্রই জনগণের অর্থের অপচয়, যা আসলে সমাজের নীচুতলার মানুষদের দিক থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বণ্টন ও ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২০০৩ সালের অক্টোবরে জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ দুর্নীতিবিরোধী সনদটি (ইউএনসিএসি) গ্রহণ করে। এটা একটা পূর্ণাঙ্গ চুক্তিনামা। দুর্নীতি মোকাবেলায় সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রপক্ষগুলোর বহুবিধ করণীয় সম্পর্কে সেখানে আলোকপাত করা হয়েছে। এই সনদ খুব স্পষ্টভাবে এটা উলে-খ করেছে যে, সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় জনগণ কর্তৃক দুর্নীতিবিরোধী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা থাকে স্বচ্ছতা ও তথ্য অধিকারের। এই সনদের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে, "তথ্যে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ রয়েছে"। এই প্রক্রিয়া সফল করতে সরকারের দায়িত্ব হলো, "দুর্নীতিবিরোধী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা এবং জনগণকে এমনভাবে তথ্য সমৃদ্ধ করা যাতে সমাজে দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়।"[১৯]

বহু অভিজ্ঞতায় এই সাক্ষ্য মেলে যে, তথ্য অধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে যেসব দেশে নিশ্চয়তামূলক আইন রয়েছে, সেখানে দুর্নীতি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতাবোধও অনেক পরিণত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ২০০৭ সালের বাৎসরিক 'করাপশন পারসেপসন্স ইনডেক্স'-এ[২০] অন্তত ১০টি দেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে যারা চরম দুর্নীতিগ্রস্ত, দুর্নীতির বিশ্ব তালিকায় সর্বাগ্রে তাদের ঠাঁই হয়েছে এবং একই সঙ্গে সেসব দেশে তথ্যে জনগণের কার্যকর প্রবেশাধিকারের মতো কাঠামো নেই। অন্যদিকে

দুর্নীতি দারিদ্র্যকে আরো শোচনীয় করে তোলে। জরিপে দেখা গেছে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্রদের জীবনে দুর্নীতির গুরুতর প্রভাব পড়েছে এবং অনেক স্থানে দুর্নীতিই তাদের জীবনের করুণ পরিণতির নির্ধারক শক্তি। একটি দরিদ্র পরিবারকে যখন নিয়মিত পুলিশকে চাঁদা দিতে হয়– তখন প্রতিদানে সেই পরিবারের শিশুদের স্কুল যাওয়া বন্ধ থাকে অর্থের অভাবে। অনেক পরিবারই এরূপ দুর্নীতির খরচ জোগান দিতে যেয়ে আর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারে না। অনেককে দেখা গেছে, আয়ের উৎস হিসেবে তার ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগও কমিয়ে দিতে হয়েছে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির চাহিদার জোগান দিতে যেয়ে।

–ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল পলিসি পেপার: দারিদ্র্য, সহায়তা ও দুর্নীতি[২২]

তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত ১০টি দেশের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তার নয়টিতেই তথ্য অধিকার বিষয়ে কার্যকর আইন রয়েছে।[২১]

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন ব্যক্তি যখন রাষ্ট্রীয় গণপূর্ত বিষয়ক কোন হিসাবের তথ্য জানার দাবি তোলেন এবং সেটা যদি গৃহীত হয় তা হলেই কেবল যাচাই বাছাই করে তিনি বুঝতে পারেন সরকার ঐ প্রকল্পে তাঁর দাবি মতো কাজ করেছে কি না এবং সেই কাজের বিপরীতে প্রচারিত অর্থ বাস্তবিকই খরচ হয়েছে কি না।

এরূপ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, হিসাবের গরমিলটুকু আসলে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের পকেটস্থ হয়েছে। ভারতে ২০০৫ সাল[২৩] থেকে জাতীয় তথ্য অধিকার আইন চালু হয়েছে। সেখানে ইতিমধ্যে অসংখ্য উদাহরণ তৈরি হয়েছেন যেসব ক্ষেত্রে জনগণ এই আইনকে ব্যবহার করে সরকারি কাজে দুর্নীতির ঘটনা উদঘাটন করছেন। তথ্য অধিকার প্রয়োগ করে দুর্নীতি বিরোধী এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে সেখানে স্থানীয় জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবার মতো মৌলিক মানবাধিকার বিষয়ক ইস্যুগুলোতে উলে-খযোগ্য মাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।[২৪]

তথ্য অধিকার যখন গরিবের খাদ্যের জোগান দেয়

ভারতে যাদের আয় দৈনিক এক ডলারের নিচে এমন মানুষজন অনেকের জন্য বাজারদরের চেয়ে কম মূল্যে খাদ্যশস্য, চিনি, তেল ও জ্বালানি ক্রয়ের সুযোগ রয়েছে। রেশন কার্ডধারীরা নির্ধারিত দোকান থেকে সরকারি এই ভর্তুকি সুবিধা পেতে পারে। এই কর্মসূচির নাম হলো 'টার্গেটেড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম' বা টিপিডিএস। কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় দেখা যায়, রেশন কার্ড থাকার পরও অনেক দরিদ্র পরিবার নির্ধারিত দ্রব্যাদি পেত না। প্রায়ই নির্ধারিত দোকানগুলো বন্ধ পাওয়া যেত বা ওই দোকান মালিক-কর্মচারিরা মুজদহীনতার কথা শোনাতেন।

এ রকম অবস্থায় ২০০৫ সালে নয়াদিলি-র স্থানীয় এক এনজিও 'পরিবর্তন'-এর সহায়তায় সেখানকার দরিদ্র রেশন কার্ডধারীরা টিপিডিএস কর্মসূচির রেকর্ডপত্র দেখার দাবিতে একত্রিত হন। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ছিল তাদের অন্যতম হাতিয়ার। ইতিমধ্যে সেখানে জাতীয় আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তথ্য অধিকার বিষয়ে দিলি-ভিত্তিক একটি আইনও তৈরি হয়ে গেছে।[২৫]

দাবি অনুযায়ী যখন দরিদ্র দিল্লি-বাসী টিপিডিএস-এর হিসাবপত্তর দেখতে পেলেন তখন উন্মোচিত হলো যে, প্রকৃত হিসাবের সঙ্গে ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলোর প্রকৃত বিতরণে অনেক ফারাক। দেখা গেল যে, টিপিডিএস কর্মসূচির প্রায় ৮০ শতাংশ খাদ্যশস্যই কালোবাজারে চলে যাচ্ছে এবং গুটিকয়েক ব্যক্তি সেই দুর্নীতির মাধ্যমে লাভবান হচ্ছেন। আর রেশন কার্ডধারীরা সাধারণ মুদি দোকান থেকে গোপনে বিক্রীত টিপিডিএস-এর সামগ্রীই উচ্চমূল্যে বাজারদরে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। দিল্লি-র দরিদ্রদের এই আন্দোলনের ফলে রাজ্যসরকার পুরো কর্মসূচিটি আবার নিরীক্ষা করতে শুরু করে এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে কার্ডধারী দরিদ্র পরিবারগুলো আগের চেয়ে অনেক ভালো পরিমাণে ন্যায্যমূল্যের সুযোগ পাচ্ছে এখন।[২৬]

দারিদ্র্য বিমোচন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো

অধ্যাপক অমর্ত্য সেন-এর সেই বিখ্যাত অনুসন্ধানী উপস্থাপনার[২৭] কথা অনেকেরই জানা আছে যে, কোনো গণতান্ত্রিক দেশে, যেখানে গণমাধ্যম স্বাধীন, নিয়মিত নির্বাচন হয় এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র রয়েছে[২৮], সেখানে দুর্ভিক্ষ হয়নি কখনো এবং হওয়া সম্ভবও নয়। অধ্যাপক সেনের এই দাবি সেই যৌক্তিকতাই তুলে ধরে যে, জবাবদিহিতার মাঝে থাকা প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, তথ্যের নিরবিছিন্ন নিশ্চয়তা এবং আর্থসামাজিক জনঅধিকারের প্রাপ্তি একই সূত্রে গাঁথা। প্রয়োজনীয় তথ্যে জনগণের অভিগম্যতার সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে যে কোনো সরকার আসলে তার নাগরিকদের সেই জ্ঞানই সরবরাহ করে, যার দ্বারা তারা সেই সব নীতিগত ও কৌশলগত সিদ্ধান্তে অংশ নিতে পারে, যেগুলো তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। সরকারের দায়িত্ব রয়েছে তার নিঃস্বতর নাগরিকদের খাদ্য, আশ্রয়, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদার যোগান নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কাছে যে সম্পদ রয়েছে, তার সমতাভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করাও সরকারের দায়িত্ব। প্রতিটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সরকারকে এই দায়িত্ব পালনের দাবি তুলতে পারে কেবল ওইসব মাধ্যমের সকল তথ্যে সমৃদ্ধ নাগরিকরা। তথ্যই মানুষকে দাবি তোলার শক্তি জোগায়।

তথ্যের অভাব যেভাবে ইথিওপিয়ার দুর্ভিক্ষ ট্র্যাজেডির জন্ম দিয়েছিল

মাত্র সাত কোটি জনসংখ্যা। তারপরও বিংশ শতাব্দীর[২৯] প্রায় পুরোটা সময় জুড়ে ইথিওপিয়াকে তাড়া করেছে দুর্ভিক্ষ আর গৃহযুদ্ধ। সম্প্রতি এ দেশ বহু বিষয়ে অগ্রগতি সাধন করেছে। স্থিতিশীল সংসদীয় গণতন্ত্র বিকশিত হয়েছে সেখানে। তবে এখনো ইথিওপিয়ায় নাগরিকরা বহু মানবাধিকার বঞ্চনার শিকার, যেসব

অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশটির সংবিধানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অংশ হিসেবে জনগণের তথ্য চাওয়া, পাওয়া ও ব্যবহারের অধিকারের সুরক্ষা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা এক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ; বরং সরকারি কাজে গোপনীয়তার নিরবিচ্ছিন্ন চর্চায় জনগণের বহু অধিকারই অধরা থেকে যাচ্ছে।[৩০]

নোবেল পুরস্কার পাওয়া অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের ভাষায়– প্রকৃত গণতন্ত্র কার্যকর থাকলে একটি দেশে খরা কখনো দুর্ভিক্ষের জন্ম দিতে পারে না। তাঁর আরো দাবি, এরূপ ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে মুক্ত গণমাধ্যম এবং গণতন্ত্রের শক্তিগুলো তথ্যপ্রবাহকে ব্যবহার করে জনগণকে সক্রিয় করে তুলতে পারে। নিশ্চতভাবেই বলা যায়, ইথিওপিয়ায় ভবিষ্যতে গণতন্ত্র, গণমাধ্যম ও তথ্যপ্রবাহের এই সম্মিলনের ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে।[৩১] তবে অতীতে দেশটিতে কেন এত দুর্ভিক্ষ হয়েছে এবং এত দুঃখ-কষ্ট সেখানকার নাগরিকদের কেন সইতে হয়েছে সেটাও বোঝা যাবে উপরোক্ত তিন শর্তের আন্তঃসম্পর্কের মাঝেই। ১৯৮৪-৮৫ সালের দিকে সংঘটিত দুর্ভিক্ষরূপী অবস্থা ছিল ইথিওপিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে বিপর্যস্থ সময়। খাদ্যের অভাবে এবং বিভিন্ন রোগে ভুগে এ সময় প্রায় ১০ লাখ মানুষ মারা যায়।[৩২] এই ট্রাজেডির পেছনে বহু উপাদান ইন্ধন জুগিয়েছে। তার মধ্যে ছিল ভয়াবহ খরা, জঘন্য ধাঁচের গণহানাহানি যাকে আরো তিক্ত করে তুলেছিল এবং সঙ্গে ছিল গেরিলাদের সহিংসতা ও বিলম্বিত আন্তর্জাতিক সাহায্য। এ সময়টায় দেশটিতে তথ্য প্রবাহের দশা ছিল খুবই নাজুক। এ কারণে প্রতিটি সমস্যা গুরুতর বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হয়েছে।[৩৩]

তথ্যের প্রবাহ চালু থাকলে (সচরাচর যা মুক্ত গণমাধ্যমের মাধ্যমেই সম্ভব) জনগণ সরকারের কর্মকাণ্ড[৩৪] সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে পারে। এটাই ছিল অমর্ত্য সেনের মূল বক্তব্য। এই প্রক্রিয়ায় কোনো নীতি-কৌশল সম্পর্কে একমত না হলে জনগণ সরকারের কাছে সে সম্পর্কে মতামত তুলে ধরে, দাবি তুলে বাড়তি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। যেমন, খরার সময় জনগণ সরকারের কাছে জানতে চাইতে পারে সমস্যার মোকাবেলায় কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, কী প্রক্রিয়ায় সেই অর্থ ব্যয় হয়েছে, সামনের দিনগুলোর জন্য কী পরিমাণ খাদ্য মজুদ আছে, কোথায় কীভাবে তা বিতরণ হচ্ছে এবং সমস্যাপীড়িত জনগণ কী পরিমাণে তার অংশীদারিত্ব পাচ্ছে। যদি দেখা যায়, প্রশাসন সমস্যাকবলিত জনপদে ব্যাপকভাবে সমতার ভিত্তিতে খাবার বিতরণ করছে না এবং খাদ্যের মজুদ বিদ্যমান– তখন জনগণ সরকারের বিতরণ নীতির যৌক্তিকতা সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলতে পারে এবং এর আরো জনমুখী সংস্কারের দাবি তুলতে পারে।

তথ্য প্রবাহের যত উন্নয়ন ঘটে, যে কোনো সংকটে আন্তর্জাতিক সাড়াও তত ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক দাতাসংস্থাগুলো জনগণকে সহায়তার জন্য সরকারের মাধ্যমে সম্পদপ্রবাহ সরবরাহ করতে খুব কমই আগ্রহ

দেখায়। কারণ এ সরকারগুলো অনেক স্থানেই গোপনীয়তার পুরানো অভ্যাসকে ধারণ করে রেখেছে তাদের কাজকর্মে। দাতারা এখন দেখতে চায়, তাদের সহায়তা কার কাছে যাচ্ছে, কী পরিমাণে যাচ্ছে এবং কীভাবে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। ৮৫-৮৬ সালে দুর্ভিক্ষকালে ইথিওপিয়ায় দাতারা দ্রুত যথাযথ সাড়া দিতে পারেনি, কারণ সংস্থাগুলোর মাঝে এই ভয় কাজ করেছে, গৃহযুদ্ধে লিপ্ত সেখানকার সরকার তাদের মানবিক সহায়তাকেও ক্ষুধা পীড়িত মানুষকে খাওয়ানোর বদলে অস্ত্র ক্রয়ে ব্যবহার করতে পারে।[৩৫]

ইথিওপিয়া ইতিমধ্যে তার অতীত দুর্যোগ কাটিয়ে উঠেছে। গণতন্ত্রের প্রচলন ছাড়াও সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নও গতি পেয়েছে। তবে সেখানকার সরকার যদি তথ্যপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, তাহলে সেখানে আবারও প্রতিরোধযোগ্য দুর্ভিক্ষাবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

সংলাপ, আলোচনা ও অংশীদারিত্ব

অনেক দেশেই 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র' প্রণয়নের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যেখানে তা জনগণের সঙ্গে যথাযথ আলোচনা, সংলাপ ও অংশগ্রহণ ব্যতীত তৈরি হয়েছে, সেখানেই তার অকার্যকারিতা ও ব্যর্থতার লক্ষণ স্পষ্ট হয়েছে– অথচ ঐ জনগণের লাভালাভের কথা বলেই এ প্রক্রিয়ার শুরু। জনগণের জন্য যেসব উন্নয়ন কর্মসূচি তার ধারণায়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল তৈরি, বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং ধাপে ধাপে এসবের বিকাশ সাধনে জনগণই হবে মুখ্য মতামত প্রদানকারী। নলকূপ বসানো, স্কুল তৈরি, ডাক্তার-নার্স-ওষুধসহ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম ইত্যাদি ধাঁচের কর্মসূচির সুবিধাভোগী যখন তারা, তখন সেই জনগণই ভালো বলতে পারবেন কী ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচি তাদের কমিউনিটিতে সবচেয়ে সহায়ক। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা দেখছি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীগুলো সচরাচর দ্বিবিধ দারিদ্র্যে ক্ষতিগ্রস্ত। একদিকে দারিদ্র্য অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সম্পদ নেই তাদের– আবার দারিদ্র্য বিমোচনে ও সামাজিক কল্যাণে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কেও তাদের কাছে পর্যাপ্ত তথ্য নেই।

তথ্য অধিকার থাকলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীগুলো দারিদ্র্যচক্র থেকে বের হওয়ার নানা উপায় সম্পর্কে তথ্য সহায়তা পেতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলোর কথা বলা যায়। তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা, শিক্ষার স্বল্প হার এবং বিশেষভাবে ভৌগলিক দূরবর্তীতার কারণে তারা সরকারি নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় হয়ে পড়ে চরমভাবে প্রান্তিক। এই প্রান্তিকতা আরো তীব্র রূপ নেয়, যখন এ রকম জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা নিয়ে প্রশাসনিক নীতি-নির্ধারণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা আদৌ সেই মানুষদের সঙ্গে সংশি-ষ্ট উন্নয়ন প্রস্তাবগুলো নিয়ে কোনো ধরনের সংলাপ করেন না এবং এরূপ সংলাপের

কোনো বাধ্যবাধকতাও থাকে না। এ রকম পরিস্থিতিতে যদি আইনগত এমন বাধ্যবাধকতা থাকে যে, সরকারই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এরূপ ক্ষেত্রে জনগণকে তথ্য সহায়তা দেবে, তাহলেই কেবল মানুষ প্রয়োজনীয় জ্ঞানসমৃদ্ধ হতে পারে। যেমন, পর্যাপ্ত কৃষিতথ্য থাকলেই কেবল কৃষক বুঝতে পারতেন বর্তমান বাজারে তার কী ধরনের চাষাবাদে যাওয়া লাভজনক হতে পারে। একমাত্র এ প্রক্রিয়াতেই কেবল প্রান্তিক মানুষ আরো সৃষ্টিশীল উপায়ে এবং প্রতিযোগিতামূলকভাবে আরো শক্ত অবস্থান থেকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে পারে। নিচে ২৬ নম্বর পৃষ্ঠার কেস স্টাডি থেকে পাঠক দেখতে পারবে যে, কীভাবে উগান্ডার গ্রামীণ একটি জনগোষ্ঠী তথ্যে অভিগম্যতার সামর্থ্য ব্যবহার করে নিজেদের সমাজের অর্থনৈতিক ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বাড়তি সুফল নিশ্চিত করেছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জনে তথ্য অধিকারের সহায়ক ভূমিকা

২০০০ সালে জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্ব সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো’ (এমডিজি) নির্ধারণে একমত হয়েছিলেন। দারিদ্র্য নির্মূল, ক্ষুধা, রোগ-বালাই, শিক্ষা, পরিবেশের অবক্ষয় রোধ এবং নারীর প্রতি বৈষম্য কমাতে এমডিজিতে আটটি লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল।[৩৬] প্রতিটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যেরই ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রতিটি লক্ষ্যের সূচনাই যেন প্রথম লক্ষ্যটিতে নিহিত– যেখানে বলা হয়েছিল, এক ডলারের নিচে আয় করে এমন মানুষের সংখ্যা এবং ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা অবশ্যই ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে।

এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে এবং ইতিমধ্যে বিপদজ্জনক রূপ নেয়া ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হলে অবশ্যই নতুনভাবে গৃহীত উন্নয়ন উদ্যোগগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সমাজের নীচুতলার মানুষরা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য তাদের ক্ষমতায়ন দরকার। সরকারগুলো তার নাগরিকদের মাঝে ‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো’ কী কৌশলে বাস্তবায়ন করছে, তা নজরদারি করতে জনগণের প্রয়োজন এ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য এবং এরূপ সচেতন নাগরিকরাই কেবল এমডিজি’র বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে তাড়া করতে পারে।

প্রসূতি স্বাস্থ্য

উদাহরণস্বরূপ আমরা এমডিজি’র পঞ্চম লক্ষ্যটির কথা বিবেচনা করতে পারি। রাষ্ট্রনেতাদের অঙ্গীকার ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে সন্তানপ্রতি প্রসূতি মৃত্যুর বর্তমান

হার ৭৫ শতাংশ কমিয়ে আনা হবে মায়েদের মৃত্যু প্রতিরোধ করে এবং স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের ক্রমবর্ধিত উপস্থিতির মাধ্যমে জন্মকালীন সেবা বাড়িয়ে।[৩৭] যে সমস্ত দেশে তথ্য অধিকার আইন বা অনুরূপ সুবিধা আছে সেখানে এই লক্ষ্য অর্জনে সরকারের পরিকল্পনার একটি নমুনা কোনো নাগরিক চাইলে যোগাড় করতে পারেন। উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে, বিশেষ বিশেষ স্বাস্থ্য সুবিধার উন্নয়নে সরকারের বাজেট বরাদ্দের বিস্তারিত খাতওয়ারি তথ্যও চাইলে পাওয়া যেতে পারে। সেই তথ্যের আলোকে নাগরিকরা প্রতিশ্রুত অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবার মানোন্নয়নের বিষয়ে নজরদারি করতে পারেন। সরকারি অর্থে পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে কীরূপ সেবা ও ওষুধ দেয়া হচ্ছে এবং জনগণের জন্য তা কতটা সহজলভ্য সেটাও সশরীরে যেয়ে তদারকি করা সম্ভব তখন। প্রশাসনের রেকর্ডপত্রের সঙ্গে বাস্তবে প্রাপ্ত সেবার কতটা মিল রয়েছে সেটাও যাচাই করা যায় এরূপ মনিটরিংয়ের মাধ্যমে। যদি তখন অঙ্গীকার ও বাস্তবতার মাঝে কোনো ফারাক দেখা যায় তা হলে জনগণ সম্মিলিত হয়ে তাদের নজরদারির কথা, দাবির কথা তুলে ধরতে পারে। সরকারকে তার প্রতিশ্রুত পরিকল্পনার আরো কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য কেবল এভাবেই সংস্কার ও সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করা যায়।

সমতাভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

একটি দেশের উন্নয়নে তথ্য অধিকারের আইনের বহুবিধ গুরুত্বের কথাই এখানে বলা হচ্ছে। তবে মনে রাখতে হবে যে, একে কোনো বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। সরকারি পরিমণ্ডলে বর্তমানে যেভাবে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়, সেখানে আরো খোলামেলা পরিবেশ, আরো স্বচ্ছতা, আরো জবাবদিহিতা আনার আগ্রহের অংশ হিসেবেই তথ্য অধিকার আইনের গুরুত্ব। কেবল এরকম পরিবেশই একটি দেশকে অভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।

বিনিয়োগকারী মাত্রই অর্থনীতিতে অবদান রাখার লক্ষ্যে তাদের তহবিলের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়। সে জন্য সময়ে সময়ে অনেক তথ্যে তাদের অভিগম্যতা প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে সরকারের শিল্পনীতি, বিনিয়োগ নীতি ইত্যাদির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের রেগুলেটরি ও আর্থিক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমও জানতে চান বিনিয়োগকারী মাত্রই। সরকারের ক্রয় কার্যক্রমে কার্যাদেশ দেয়ার প্রক্রিয়া ও নীতিমালা, লাইসেন্স ও ঋণের বিধি বিধান, বিদেশিদের জন্য নাগরিকত্ব নীতিমালা এবং বিনিয়োগজনিত বিবাদ মীমাংসার কাঠামো সম্পর্কে তথ্য পাওয়াও বিনিয়োগকারীদের জন্য জরুরি। এরূপ ক্ষেত্রে স্বচ্ছ শাসন পদ্ধতির সংস্কৃতি অর্থনীতিতে বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করে। এটা অর্জন সম্ভব হয় নিয়মিত সরকার, জনগণ এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের খোলামেলা সংলাপের মাধ্যমে। আর্থিক পরিমণ্ডলে স্বচ্ছতা ও

জবাবদিহিতা থাকলে প্রবৃদ্ধি টেকসই হয় এবং নাগরিকদের মাঝে অর্থনৈতিক সমতা অর্জনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উগান্ডার কৃষক নারীর অভিজ্ঞতা
তথ্যে অভিগম্যতা কাজের পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক

উগান্ডার উত্তরে অন্তত চারটি প্রদেশে কৃষাণীদের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে তথ্যের সহজ প্রাপ্তি বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।[৩৮] ২০০৩ সালের গবেষণায় দেখা গেছে, উগান্ডার ওই অঞ্চলে মাত্র তিন শতাংশ জনগণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ করে থাকে। ৭৫ শতাংশ মানুষই আবাদ করেন পারিবারিক প্রয়োজনে। তবে এই উভয়ের ক্ষেত্রেই বীজের মানোন্নয়ন, শস্যের বহুমুখীকরণ, বালাই দমন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথ্যের ব্যাপক দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে। যেহেতু কৃষিতে ওই অঞ্চলে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ খুবই নগণ্য, সেজন্য নতুন নতুন কৃষি তথ্যের প্রবাহও সেখানে অনুপস্থিত।[৩৯] ফলে কৃষি সেখানে অনুন্নত, নারীরা কৃষিশ্রমে কম মজুরি পায় এবং সুযোগ-সুবিধার অভাবে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে এ অঞ্চলে নারীরা কৃষিতে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত। ফলে কৃষির রুগ্‌ণ দশার শিকার সেখানে প্রধানত নারীরাই হচ্ছিলেন।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণে এগিয়ে আসে বেসরকারি সংগঠন ‘ওমেন অব উগান্ডা নেটওয়ার্ক’ (WOUGNET)। তারা কৃষিজীবীদের কাজের উন্নত এবং অধিকতর ন্যায্য পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তথ্যের উন্মুক্ত প্রবাহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষিতথ্যে অভিগম্যতা বাড়ানো’ শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নেয়।[৪০] এই কর্মসূচির আওতায় একেবারে গ্রামীণ পর্যায়ে তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা শুরু হয়। স্থানীয় ভাষায় ‘কুভিরি তথ্য কেন্দ্র’ নামে পরিচিত এসব স্থানে কৃষিজীবিদের তথ্য দেয়াই ছিল কাজ। এসব কেন্দ্রে নারীবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার ওপর বিশেষ নজর দেয়া হয়েছিল। কারণ ওই অঞ্চলে কৃষিজীবীকায় নারীর প্রাধান্য সম্পর্কে WOUGNET ছিল ওয়াকিবহাল। কুভিরি কেন্দ্রে লাগসই কৃষিতথ্যের লক্ষ্যে একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী এবং অতি সাম্প্রতিক যোগাযোগ পদ্ধতি বিষয়ে কৃষিজীবীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। তাদের দেখানো হতো কীভাবে রেডিও, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে তথ্যে অংশীদারিত্ব বাড়ানো যায় এবং তথ্যকে ছড়িয়ে দেয়া যায়।

কৃষি বিষয়ে তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে উগান্ডার ওই তথ্যকেন্দ্রগুলো অনেক নতুন উদ্ভাবনী ধারণার উন্মেষ ঘটায়। তারা কৃষি বিষয়ে কমিউনিটি বৈঠক, রেডিও প্রোগ্রাম ইত্যাদির আয়োজন করে। নিয়মিত তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে জনগণের জন্য স্থাপিত নোটিশ বোর্ডগুলোতে তারা নোটিশ লাগায়। বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া তথ্যাদি

স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করেও মানুষকে সরবরাহ করা হয়। উত্তরের আপাক জেলারবাজার সন্নিহিত এমন স্থানে এই কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় যেখানে কৃষি পেশাজীবী জনগণের ব্যাপক সমাগম ঘটে এবং তারা যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য চাহিদার সহজেই উত্তর খুঁজে পায়।[৪১]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক উগান্ডার উপরোক্ত কেন্দ্রগুলোর আরেকটি লক্ষ্য ছিল কৃষি পেশাজীবীদের মাঝে যোগাযোগ বাড়ানো। এই প্রক্রিয়ায় তাদের দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের কার্যকর বিনিময় বাড়ে। বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেয়ার কাজেও এই কেন্দ্র ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষকরা বহু বিষয়ে জানতে আগ্রহী। কেন্দ্রে যখন তার উত্তর থাকে না, তখন কেন্দ্রের তরফ থেকে সরকারি-বেসরকারি তালিকাভুক্ত বিশেষজ্ঞ এবং কৃষি কর্মকর্তা কিংবা কৃষি সংশি-ষ্ট বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সেসব প্রশ্ন নিয়ে যোগাযোগ করা হয়।[৪২] এরূপ যোগাযোগ প্রক্রিয়াতেও কৃষকরা উপক্রিত হচ্ছেন।

তথ্য কীভাবে কৃষককে জ্ঞান ও দক্ষতায় ক্ষমতায়িত করতে পারে, তার এক বড় দৃষ্টান্ত উগান্ডার এই কুভিরি তথ্য কেন্দ্রগুলো। টেকসই চাষাবাদে ঐসব কেন্দ্র কৃষাণীদের অন্যতম প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। এর মাধ্যমে উত্তর উগান্ডার কৃষিসমাজ তাদের কর্মপরিবেশকে যেমন উন্নত করতে পেরেছে, তেমনি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেদের পণ্যের অবস্থানও শক্তিশালী করতে পেরেছে। এরূপ কেন্দ্রগুলো জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্রে যে কেবল কৃষকদের মাঝে যোগাযোগ মাধ্যম হয়ে উঠেছে তা-ই নয়, কমিউনিটির সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি কৃষিবিদদের আন্ত:সম্পর্কও দৃঢ় করেছে তা। বিশেষ করে সরকারি কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা এবং সমমনা কৃষি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কৃষকদের নিয়মিত যোগাযোগের একটি মাধ্যম হয়ে উঠেছে তথ্যকেন্দ্র। এই যোগাযোগের মাধ্যমে শহর থেকে দূরে থাকা কৃষকও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কৃষি জ্ঞানভাণ্ডারের প্রয়োজনীয় সর্বাধুনিক জ্ঞানের নাগাল পেয়ে যাচ্ছেন, যা তাদের প্রাত্যহিক কৃষি কাজের জন্য জরুরি।

রাষ্ট্রীয় পরিসরে তথ্য অধিকারের আইনগত সুবিধা না থাকার পরও বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রবাহের দ্বার উন্মুক্ত করা গেলে– সেই মাধ্যমকে ব্যবহার করে তথ্যের বাস্তব ব্যবহার কী গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বয়ে আনতে পারে, সেটাই প্রমাণ করছে উগান্ডার আপাক জেলার উপরোক্ত কৃষি তথ্যকেন্দ্রগুলো।[৪৩]

মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যমের সহায়তায় তথ্য অধিকার

কার্যকর গণতন্ত্রে সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কার্যক্রম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা এবং তার মাধ্যমে জনস্বার্থ তদারকির প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে থাকে গণমাধ্যম। মিডিয়ায়ই

এক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার স্বরূপ উন্মোচন করে এবং দাবি উত্থাপন করে জবাবাদিহিতার। জনগণের কাছে অনেক স্থানেই সরকারি কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির একমাত্র উৎস হয়ে আছে মিডিয়া। মিডিয়াকে ব্যবহার করে জনগণ যে শুধু তথ্য পায় তাই নয়– সংশিষ্ট বিষয়ে মতবিনিময়, বিতর্ক গড়ে তোলা এবং মতামত গঠনেও মিডিয়ার রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। এটা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। বিভিন্ন সাম্প্রতিক বিষয়ে জনগণের মতামত তুলে ধরে মিডিয়া সরকারকেও নিয়মিত জনমনস্তত্ত্ব বুঝতে সহায়তা করে। যা আবার সরকারের নীতি তৈরি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

দুর্ভাগ্যজনক হলো, অনেক সরকারই আবার গণমাধ্যমের শক্তি ও প্রভাবে বিব্রতবোধ করতে পারে। স্বাধীন গণমাধ্যমের কার্যক্রমে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। এরূপ সরকারগুলো তখন নানাভাবে মিডিয়ার প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ করে। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়। সংবাদ সংগ্রহের কাজে প্রতিবন্ধকতা আরোপের চেষ্টা চলে। অনেক ইস্যু বা ঘটনায় ‘সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে’– এরূপ আশঙ্কা থেকে তথ্য প্রকাশে সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়।

তথ্য সংগ্রহের নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়া যখন বন্ধ করে দেয়া হয় বা তাতে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয় তখন রিপোর্টাররা তথ্য ফাঁসের জন্য পরিকল্পনা আঁটেন বা নির্ভর করেন গুজবে। অনেক সময় এরূপ ক্ষেত্রে প্রমাণযোগ্য নয় বা সারবত্তাহীন তথ্যই ছাপতে হয় তাদের। এমনও দেখা যায়, যার রহস্যময় ভূমিকা নিয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন সঠিক তথ্য আহরণের পথ বন্ধ থাকায় ওই ব্যক্তির বিবৃতিই সংবাদপত্রকে একতরফাভাবে প্রকাশ করতে হচ্ছে। অনেক স্থানেই সাংবাদিকতার নৈতিক নীতিমালায় সত্যবাদিতা, নির্ভুলতা, বস্তুনিষ্ঠতা, পক্ষপাতহীনতা এবং বিশেষভাবে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার[৪৪] উলে-খ থাকে। কিন্তু সেসব স্থানেই যদি তথ্য জানা ও ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী নীতিমালাও বহাল থাকে, তাহলে গণমাধ্যম কর্মীরা তাদের পেশাগত আদর্শ ও কর্তব্য কীভাবে পালন করবেন? বরং সেখানে সত্যিকারভাবে পেশাগত কর্তব্য পালনে তারা ব্যর্থ হন।

এখনো অনেক সরকার বর্তমান যুগের জন্য একেবারেই অনুপযোগী বিভিন্ন আইনে গণমাধ্যমের শ্বাস রোধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের আইন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতা কিংবা ভুল তথ্য দেয়াজনিত অন্যান্য ধরনের মামলা দায়েরের সুযোগ করে দেয়।[৪৫] এ ধরনের ব্যবস্থার কারণে প্রকৃত গণতন্ত্র যে মৌলিক চেতনা ও ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, সেই চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হয়। একটি দেশে তথ্য জানা ও ব্যবহারের যদি আইনগত অধিকার থাকে, তাহলেই কেবল একজন গণমাধ্যম কর্মী সঠিক প্রক্রিয়ায় সরকারি দফতরে নির্ভুল তথ্য খুঁজতে পারেন, চাইতে পারেন এবং পেতে পারেন। এরূপে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে তখন সাংবাদিকরা আরো বাড়তি অনুসন্ধানকে এগিয়ে নিতে সমর্থ হন এবং সর্বসম্মুখে তাদের প্রতিবেদন তুলে ধরতে পারেন।

তথ্য অধিকার রক্ষায় গণমাধ্যমকর্মীদের নিরন্তর লড়াই ব্রিটেনের অভিজ্ঞতা

তথ্য অধিকারের আইনগত নিশ্চয়তা যে গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য কত জরুরি এবং তারা এই অধিকার রক্ষায় যে কত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তার এক বড় নজির সম্প্রতি দেখা গেল ব্রিটেনে। ২০০০ সালে সেখানে তথ্য অধিকার আইন অনুমোদিত হয়।[৪৬] কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রিটেন সরকার এ সংক্রান্ত নতুন আরেকটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করে যেখানে সাংবাদিক ও প্রচার-আন্দোলন কর্মীদের কাছে পরিমাণগত ও গুণগতভাবে তথ্য সরবরাহ সীমিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ১ হাজার ২৫০ জন সাংবাদিক সরকারের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে প্রতিবাদ জানান এবং মূল তথ্য অধিকার আইনে এরূপ সংশোধনী না আনার জন্য দাবি তোলেন। সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে এই স্মারকলিপি হস্তান্তর করে ব্রিটেনের জাতীয় সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সেদিন বলেছিলেন: "আমাদের গণতন্ত্র যেসব প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিনিয়ত অনুসন্ধান ও খবর সংগ্রহের কাজে ২০০০ সালের তথ্য অধিকার আইনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। এই আইনের বদৌলতে সাংবাদিকরা এমন সব তথ্য খুঁজে আনতে পারছেন, যা সরকারের জন্য সুখপ্রদ না হলেও জনগণের তা জানার প্রবল অধিকার রয়ে গেছে। এখন যদি নতুন করে সংশোধনীর মাধ্যমে সাংবাদিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার সীমিত করে ফেলা হয় তাহলে জনগণের জানার অধিকারই পরোক্ষে লঙ্ঘিত হবে। মূল আইন যেসব জায়গায় আলো ফেলতে সাহায্য করছিল, মনে হচ্ছে সরকার তথ্য অধিকার আইনের নয়া সংশোধনীর মাধ্যমে সেখানটি আবার অন্ধকার করে রাখতে চাইছে।"[৪৭]

সাংবাদিক ও নাগরিক অধিকার আন্দোলনের তীব্র আপত্তি ও প্রতিবাদের কারণে ব্রিটেন সরকার শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো আর আইনে পরিণত করেনি।

সংঘাত প্রতিরোধ এবং সংঘাত-পরবর্তী সমঝোতায় তথ্য যেভাবে ভূমিকা রাখে

বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে তথ্যকে ভুলভাবে ব্যবহারে এতদিন যারা সিদ্ধহস্ত ছিল, তথ্যের শক্তিকে স্বীকৃতিদানে তারাও আজ আর ইতস্তত করছে না। অন্যদিকে, যে কোনো নীতিমালা তৈরির প্রক্রিয়ায় সরকারের গোপন করার যে প্রবণতা তা আবার সন্দেহ এবং বঞ্চনার বোধ তৈরি করে জনগণের বিশেষ বিশেষ অংশের মাঝে, বিশেষ করে জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের মাঝে।

যখন কোন কমিউনিটি তাদের স্বার্থ সংশি-ষ্ট প্রকৃত তথ্য জানতে পারে না, তাদের বিশেষ কোনো প্রয়োজনে বা তাদের অবস্থার উন্নয়নে সরকার কী করছে বা কী কী করছে না, সে সম্পর্কে অন্ধকারে থাকে, তখন তাদের মাঝে বৈষম্য চেতনা বৃদ্ধি পায়। সঠিক তথ্য সরবরাহের ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। কিন্তু সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতোই গতানুগতিক কায়দায় তা আটকে রাখে। এর মাধ্যমে নির্ভুল তথ্যের অভাবে বিভিন্ন কমিউনিটির মাঝে অবিশ্বাস তৈরি হয়, এমনকি অবিশ্বাসের এ বোধই বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্নতাবোধের অনুঘটক হয়ে দাঁড়ায়। অনেক অঞ্চলে তথ্যহীনতার বঞ্চনাবোধই নাগরিক পরিমণ্ডলে সংঘাতের উৎস। সঠিক সময়ে জনগণ যদি নির্ভুল তথ্য জানতে পারে, তাহলে গুজবে বা বিভ্রান্তিকর প্রচারণার মাধ্যমে তাদের অসন্তোষ প্রকাশের দিকে ধাবিত করা কঠিন; বরং সঠিক তথ্য বিভিন্ন সংক্ষুব্ধ কমিউনিটির মাঝে গঠনমূলক মতবিনিময়ের পটভূমি তৈরি করে। যা সরাসরি সামাজিক সংহতি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

অনেক সরকারই এখনো বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে তথ্য বিকৃতির ক্ষমতায় আস্থাশীল। জনগণকে কিছু ভুল সংস্কারে আটকে রাখা এবং শোষণমূলক গতানুগতিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো বহাল রাখার ক্ষেত্রে তথ্য বিকৃতির বিশেষ প্রভাব অবশ্যই আছে। অভ্যন্তরীণ সংঘাতকালে কিংবা সংঘাতপূর্ণ অবস্থা গড়ে ওঠার মুহূর্তে রাষ্ট্র এবং প্রতিপক্ষ উভয়ই সময়ে সময়ে প্রকৃত তথ্যকে বিকৃত করে, নিজেদের মতো করে সেসব উপস্থাপন করে। এ ধরনের প্রচেষ্টার লক্ষ্য হলো উভয়পক্ষের মাঝে সৃষ্ট বা উদীয়মান বৈরিতাকে ন্যায্যতা দান এবং একপক্ষের ওপর অপরপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। সংঘাত থেকে যারা লাভবান হতে চায়, তারা বরাবর তথ্যকে এমনভাবে বিকৃত করে, যাতে বৈরিতা মিথে পরিণত হয়।

মিডিয়াকে ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রিত তথ্য প্রচারের মাধ্যমে সংঘাতে সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো বিশেষ জনগোষ্ঠীতে ভুল ধারণাকে সত্যের মোড়কে ছড়িয়ে দেয়। এ ধরনের প্রপাগান্ডা মিথ্যা প্রমাণিত হয় সেরূপ তথ্যও তারা সংগঠিতভাবে সেন্সর করে। এরূপ প্রচারণা যুদ্ধের লক্ষিত জনগোষ্ঠীও তখন ভুল ও নির্ভুলের পার্থক্য করতে ব্যর্থ হয়, কারণ তাদের এমন কোনো বিকল্প উৎস থাকে না, যার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই বা চ্যালেঞ্জ করা যায়।

রুয়ান্ডা: সংঘাতের জ্বালানি হিসেবে বিকৃত তথ্যের ব্যবহার

মিথ্যা তথ্য ভুল হাতে পড়লে যে কেমন বিপজ্জনক রূপ নিতে পারে, তার ভয়াবহ এক নজির রুয়ান্ডার গণহত্যা। ১৯৯৪ সালে গণহত্যাকালে এবং তার আগেও কিছু দুষ্টচক্র তথ্য বিকৃতির মাধ্যমে দেশটির বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মাঝে আন্তঃসাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও অবিশ্বাস বাড়িয়ে দিতে তৎপর হয়। রুয়ান্ডার গণহত্যার বিচারে যে আন্তর্জাতিক ক্রিমিন্যাল ট্রাইব্যুনাল বা অপরাধ আদালত গঠিত হয় সেখানে ২০০৩

সালে ‘রেডিও টেলিলিব্রি মিলি- কলিন্স’ (আরটিসিএম)-এর তিনজন রেডিও নির্বাহীকে এই মর্মে দোষী সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা মিডিয়াকে ব্যবহার করে তুতসি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বর্ণবাদী ঘৃণাকে উৎসাহিত করেছে।[৪৮] কর্নেল থারসিসি রেগ্ঞাও-এর মতো সরকারি কর্মকর্তাদের অনুমোদনেই উপরোক্ত রেডিও স্টেশন তুতসি জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়েছে। এর মাধ্যমে তুতসি নির্মূলে হুতু জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশেষ উদ্দীপনা তৈরি হয়।

গণহত্যা শুরুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে ঐ রেডিও স্টেশন থেকে এই মর্মে প্রচারণা শুরু হয়, “তোমরা আরশোলারা নিশ্চয়ই জানো, তোমরা বেশ মাংসালো, তোমাদের মারতে দেরি করা হবে না। তোমাদের মারা হবে।” এভাবে ওই রেডিও থেকে ক্রমাগত ঘৃণা উদ্রেককারী প্রচার চালানো হতো এবং তা জনসমাজে পারস্পরিক উত্তেজনা বৃদ্ধিতে ইন্ধন জোগাতো। গণহত্যার পুরো সময়ে এরূপ ঘটেছে। এমনকি হত্যা তালিকা করে তুতসিদের নাম ধরে ধরেও প্রচার চালানো হতো। হত্যা করতে যাতে সুবিধা হয় সেজন্য নাম প্রচারিত ব্যক্তিরা কে কোথায় আশ্রয় নিয়ে আছে সেটাও জানিয়ে দেয়া হতো রেডিও থেকে। কর্নেল থারসিসি রেগ্ঞাও হত্যাপিপাসু পুলিশ এবং বেসামরিক ব্যক্তিদের পাশাপাশি তার সৈনিকদের নির্দেশনা দেয়ার কাজেও এই রেডিও স্টেশনকে ব্যবহার করতেন।[৪৯]

রুয়ান্ডায় জাতিসঙ্ঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল রোমিও ডালি-য়ারি দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় তথ্যকে বিকৃত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কি ভয়াবহ ভূমিকাই না পালন করেছে দেশটিতে অতীতে। সেখানকার গণহত্যায় গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, “ওই ধরনের খবরাখবরে জ্যাম সৃষ্টি করে, বাধা দিয়ে শান্তি ও সংহতিতে সহায়তা হয় এমন তথ্য প্রচারের মাধ্যমেই কেবল এক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।”[৫০]

সরকারি নীরবতা সব সময়ই সন্দেহের জন্ম দেয়; বরং জনগণের জানার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সরকারি নীতিমালা তৈরির সময় জনগণের মাঝে আস্থার বোধ সৃষ্টি করতে পারে সরকার নিজেই। এক্ষেত্রে সরকারকে জনগণের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে যে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের প্রতি সরকার সম্মান জানাচ্ছে, তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। যদি এমন ব্যবস্থা থাকে যে, আগ্রহী নাগরিকরা সরকারী নীতিমালা তৈরির প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে কিংবা চাইলে ব্যক্তিগতভাবে তারা সরকারি কোন কার্যক্রম তদারকি ও নিরীক্ষার সুযোগ পাবে- তাহলে মানুষের মন থেকে ক্ষমতাহীনতার বোধ দূরীভূত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সমাজে এক গ্রুপ কর্তৃক অপর গ্রুপের বিরুদ্ধে বঞ্চনার বোধ উসকে দেয়ার মতো প্রচারণাকে জনগণই নিজে থেকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে থাকে।

যেখানে একাধিক নৃগোষ্ঠী বা বর্ণের জনগোষ্ঠী বসবাস করে, সেখানে তাদের স্বার্থ সংশ্লি-ষ্ট তথ্যাদি সরকার যদি নিজে থেকে প্রতিনিয়ত আগেই প্রকাশ করে দেয় তা হলে আন্তঃসাম্প্রদায়িক বৈষম্যের মিথ গড়ে ওঠে না আর। এরূপ মিথই সচরাচর পারস্পরিক ঘৃণাজনিত অপরাধ ও সংঘাতে গতি সঞ্চার করে। আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রতিরোধ করতে কিংবা তা নমনীয় রাখতে আগ্রহী জনগণের জন্য তথ্য অধিকার থাকাটা খুবই সহায়ক। এর অন্যথা হলে দেখা যায় সহিংসতার প্রাদুর্ভাব।

সত্য ঘটনাভিত্তিক তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংঘাত-উত্তর সমাজে পরস্পরের মাঝে বঞ্চনার বোধ দমনেও খুবই কার্যকর এক উপায়। এ ভাবনা থেকেই বিশ্বের অনেক দেশের মতো দক্ষিণ আফ্রিকা[৫১] এবং চিলিতে বর্ণবাদী বৈষম্য ও সামায়িক একনায়কতন্ত্র পরবর্তী সময়ে বহুল আলোচিত 'সত্য অন্বেষণ এবং নিষ্পত্তি কমিশন' (Truth and Reconciliation Commission) করা হয়েছিল। এ ধরনের কমিশন বৈষম্যে ভরা সামরিক একনায়কত্ব পরবর্তী দিনগুলোতে অবিশ্বাস ও অসন্তুষ্টি কমাতে এবং সামাজিক পুনর্বাসনে হাতিয়ারমূলক ভূমিকা রেখেছে। এটা কেবল যে আন্তঃসাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জরুরি তা নয়, নতুন সরকারের সঙ্গে জনগণের একাত্মতার জন্যও আবশ্যক। অনেক সময়ই অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনাবলির তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রকাশে সরকারগুলোর অনাগ্রহ থাকে বা তারা একে আড়াল করতে চায়। সেরূপ ক্ষেত্রে 'সত্য অন্বেষণ এবং নিষ্পত্তি কমিশন' ধাঁচের প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজ নিপীড়নের শিকার মানুষজনের কষ্টের এক ধরনের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। এ ধরনের কমিশনের কাছে নিরাপত্তার সঙ্গে তারা অভিজ্ঞতার কাহিনী তুলে ধরতে পারে এবং তাদের কাছে জরুরি মনে হচ্ছে এমন তাগিদকে নথিবদ্ধ করতে পারে।

অধ্যায় দুই:
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামোতে তথ্য অধিকারের গুরুত্ব

তথ্য অধিকারের সুরক্ষা

তথ্যের স্বাধীনতা এবং সেই তথ্যে অভিগম্যতা একটি মৌলিক মানবাধিকার। জাতিসজ্ঘ যেসব স্বাধীনতার লক্ষ্যে উৎসর্গকৃত তার সব অর্জনের পথে তথ্যের স্বাধীনতাকে পরশপাথরের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

–জাতিসজ্ঘ সাধারণ পরিষদ, ১৯৪৬[১]

যে কারো জীবনে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া বা তথ্যে অভিগম্যতা থাকা এত জরুরি যে, বরাবর একে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। জাতিসজ্ঘ প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বছরের মধ্যে ১৯৪৬ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ এই ঘোষণা দিয়েছিল, মানুষের এই মৌলিক অধিকার থাকতে হবে যে, সরকারিভাবে প্রয়োজনীয় তথ্যে তার অধিকার থাকবে। জাতিসজ্ঘ সেদিন উপলব্ধি করেছিল, এ অধিকারটি সকল ধরনের মানবাধিকারের এক মৌলিক উৎস। কারণ এর মাধ্যমেই একজন নাগরিক সরকারি কার্যক্রমে তার অবস্থানটি জানতে পারে, কোথায় তার অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে, তা জানার মধ্য দিয়েই কেবল সে তার অধিকার রক্ষার দাবিটি সরকারের কাছে উপস্থাপন করতে পারে। তথ্য অধিকারকে ব্যবহার করেই নাগরিকরা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় তাদের অন্যান্য ন্যায্য অধিকার সুরক্ষা ও বাস্তবায়নে সরকারি নিশ্চয়তা চাইতে পারেন।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড

জাতিসজ্ঘ[২]

তথ্যে অধিকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন সংশি-ষ্ট প্রায় সকল কাঠামোতে ইতিমধ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত। জাতিসঙ্ঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা সনদের (ইউডিএইচআর) ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে তথ্য অধিকারকে সযত্নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একইভাবে আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ (ICCPR)-এর ক্ষেত্রেও তথ্য অধিকার বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের জন্য জাতিসজ্ঘ আইনগত বাধ্যবাধকতা রেখেছে। আইসিসিপিআর-এর অনুচ্ছেদ ১৯-এ উলে-খ রয়েছে–

> সকলের নিজস্ব মতামত গঠন ও প্রকাশের অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হবে অপরের হস্তক্ষেপ ছাড়া স্বাধীনভাবে নিজস্ব মতামত লালন ও প্রকাশ এবং তথ্য চাওয়া, পাওয়া ও তার ভিত্তিতে গঠিত মতামত অন্যকে জানানোর অধিকার। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশের মাধ্যম হতে পারে যে কোনো মিডিয়া এবং তার পরিসর হতে পারে অনির্দিষ্ট।[৩]

১৯৯৩ সালে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসজ্ঘ কমিশন মতামত গঠন ও তার স্বাধীনতা বিষয়ে একজন বিশেষ র‌্যাপোটিয়্যর নিয়োগ করে। এই র‌্যাপোটিয়্যর ঘোষণা করেছিলেন, আইসিসিপিআর (ICCPR) - এর আর্টিক্যাল ১৯ অনুযায়ীঃ "তথ্যে

প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রপক্ষগুলোর ইতিবাচক দায়িত্ব। বিশেষ করে সরকারের মজুদ ব্যবস্থা ও তার বিভিন্ন ধরনের ত্রাণ ও মেরামত ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যে জনগণের জানার অধিকার থাকতে হবে।"[৪] ১৯৯৮ সালে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসঙ্ঘ কমিশন এই অভিমতকে স্বাগত জানিয়েছে[৫] এবং ২০০০ সালে বিশেষ র‌্যাপোটিয়র তথ্যের স্বাধীনতা সম্পর্কে[৬] আন্তর্জাতিক কয়েকটি নীতিমালা অনুমোদন করে– যা জাতিসঙ্ঘ কমিশন বিবেচনায় নিয়েছে।[৭]

তথ্যের স্বাধীনতা বিষয়ে জাতিসঙ্ঘ নীতিমালা (২০০০)

- **উন্মোচনের সর্বোচ্চ সুযোগ থাকা :** তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ সংশি-ষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বাধ্যকতা রয়েছে। এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্যের প্রয়োজনে যোগাযোগের অধিকার রয়েছে। 'তথ্য' বলতে বোঝাবে জনস্বার্থ সংশি-ষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে থাকা সকল ধরনের নথি– তার সংরক্ষণ রূপ যাই হোক না কেন।

- **প্রকাশের বাধ্যবাধকতা :** সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ সংশি-ষ্ট তথ্যাদি প্রকাশ করা এবং ব্যাপকভাবে প্রচারে উদ্যোগী হওয়া। বিশেষ করে জনগণের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন নীতি ও সিদ্ধান্তগুলোতে কী রয়েছে এবং কীভাবে সেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে, তা প্রকাশিত থাকা উচিত।

- **সরকারি কাজে উন্মুক্তকরণকে উৎসাহ দেয়া :** জনগণের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা ব্যবস্থায় ধারণা গঠনের জন্য আইনে ন্যূনতম মাত্রায় হলেও বিধান থাকা উচিত। অধিকার সম্পর্কে জনসমাজে প্রচার এবং সরকারের কার্যক্রমে গোপনীয়তার যে সংস্কৃতি, তা মোকাবেলার মতো কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ও এই বিধানে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

- **ব্যতিক্রমের আওতা সীমিত রাখা :** অনেক সময়ই কিছু বিষয়কে তথ্য উন্মুক্তকরণের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। কোনো তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়লে সরকার ব্রিবত হবে বা কোনো অন্যায় কাজকে আড়ালে রাখতেই হবে এমন বিবেচনা থেকে এ ধরনের নীতি অনুসরণ করা উচিত নয়। আইনে অবশ্যই উলে-খ থাকতে হবে, কোন কোন আইনসম্মত বিবেচনায় বিশেষ বিশেষ বিভাগের কার্যক্রমকে তথ্য প্রকাশের আওতাবহির্ভূত করে রাখা হচ্ছে। কারো কার্যক্রম উন্মুক্তকরণের আওতার বাইরে রাখতে হলে আইনগতভাবেই তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে হবে এবং এরূপ ব্যতিক্রমের আওতাও সচেতনভাবে সীমিত রাখতে হবে। রাষ্ট্রের আইনগত স্বার্থহানি না করার পরও কোনো উপাদানকে ব্যতিক্রমের আওতায় রেখে দেয়ার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না।

- **তথ্যে জনগণের অভিগম্যতাকে উৎসাহ জোগানোর ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে :** জনগণ যাতে চাহিদামাফিক তথ্য পায়, সরকারি সকল বিভাগে সেরূপ অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই ব্যবস্থা হতে হবে সহজে প্রবেশযোগ্য। তথ্য পাওয়ার অনুরোধ ফয়সালা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে চাহিদা মত তথ্য প্রদানে যে কোনো অপারগতার যৌক্তিক লিখিত কারণ দেখাতে হবে।

- **খরচ :** তথ্যপ্রাপ্তির খরচ অবশ্যই ব্যয়বহুল হবে না এবং সম্ভাব্য তথ্য ব্যবহারকারীদের নাগালের মধ্যেই খরচের হার নির্ধারিত হওয়া সঙ্গত। যে বিবেচনা ও লক্ষ্য থেকে তথ্য অধিকার আইনের প্রচলন, খরচের হার যেন সেই চেতনার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই নির্ধারিত হয়।

- **বৈঠকের ব্যবস্থাপনা উন্মুক্তকরণ :** তথ্য অধিকার আইন এই প্রথার প্রচলন ঘটাবে যে, সরকারি সকল বৈঠক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে।

- **অন্যান্য আইনেও উন্মুক্তকরণের নজির অনুসরণ করা :** তথ্য অধিকার আইন এমন সামগ্রিকতায় তৈরি হওয়া প্রয়োজন যে, দেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যার সময় যেন যথাসম্ভব এই আইনের নির্দেশনাগুলোর বৈধতা থাকে। অর্থাৎ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় আইনে ভিন্ন কিছু থাকলেও তথ্য অধিকার আইন হওয়ার পর উন্মুক্তকরণের নজির যেন সর্বত্র অনুসৃত হয় এবং অন্যান্য আইন যেন তথ্য প্রকাশের আওতাবহির্ভূতদের তালিকা বাড়িয়ে না ফেলে।

- **তথ্য প্রদানকারীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা :** কোনো অন্যায়ের তথ্য প্রকাশ বা ফাঁসের দায়ে আইনগত, প্রশাসনিক বা পেশাগত স্বার্থহানির হাত থেকে তথ্য উন্মোচনকারী (whistle-blower)-কে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দিতে হবে।[৮]

কথা বলা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক জাতিসঙ্ঘের যে বিশেষ র‍্যাপোটিয়র রয়েছেন তার দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে 'অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেইট' এবং 'অর্গানাইজেশন ফর সিকিউরিটি অ্যান্ড কোঅপারেশন ইন ইউরোপ' ২০০৪ সালে মত প্রকাশের স্বাধীনতার বিকাশে আন্তর্জাতিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রশ্নে এক যৌথ ঘোষণা প্রকাশ করে।[৯] ওই যৌথ ঘোষণায় দৃঢ়তার সঙ্গে এই স্বীকৃতি ছিল যে, সকল নাগরিকের জন্য 'তথ্যে অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার' এবং সরকারগুলোর দায়িত্ব হলো এই অধিকারের প্রতি সম্মান জানানো, এ সম্পর্কিত আইনগত কাঠামো গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে জনগণ সরকারের তরফ থেকে সর্বোচ্চ মাত্রায় তথ্য পেতে পারে। এটাই হলো তথ্য অধিকার সংক্রান্ত জাতিসঙ্ঘের নীতিমালার প্রথম অগ্রাধিকার, যাকে জাতিসঙ্ঘ অভিহিত করেছে "উন্মোচনের সর্বোচ্চ সুযোগ থাকা" হিসেবে।[১০]

উপরোক্ত ত্রিপক্ষীয় ঘোষণায় এটাও উলে-খ করা হয় যে, সরকারি কাজে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়াতে হলে তথ্য অধিকার অতি প্রয়োজনীয়। এই অধিকার সরকারের কাজে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং সরকারের জবাবদিহিতার বিকাশ সাধনে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে বিশেষ সহায়তা করে।[১১]

> মত প্রকাশের স্বাধীনতায় এটাই নিহিত রয়েছে যে, সরকারি তথ্যে প্রবেশাধিকার কায়েম করা এবং সরকার নাগরিকদের জন্য কি করছে তা জানা জনগণের অধিকার এবং এটা ছাড়া সত্য জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সরকারি কাজে জনগণের অংশীদারিত্বও থাকে অসম্পূর্ণ।
>
> *–ড. আবিদ হুসেইন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক জাতিসঙ্ঘের বিশেষ র‍্যাপোটিয়্যর, ১৯৯৯।*[১২]

আফ্রিকান ইউনিয়ন[১৩]

মানবাধিকার বিষয়ক আফ্রিকান (বানজুল) চার্টারও খুবই স্পষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে জনগণের তরফ থেকে তথ্য চাওয়া ও পাওয়ার অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। চার্টারের ৯ (১) নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে।"[১৪] ২০০২ সালে মানব ও জন অধিকার বিষয়ক আফ্রিকান কমিশন এই ঘোষণা দেয় যে, "সরকারের কাছে যে তথ্য থাকে তা কেবল তাদের জন্য নয়, এটা হলো জনসম্পদ এবং সরকারি কর্মকর্তারা হলেন কেবল এর রক্ষক ও অভিভাবক। প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রয়েছে এই তথ্য জানার।"[১৫]

আফ্রিকার জন্য আফ্রিকান ইউনিয়ন 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক নীতিগুলো'-এর যে ঘোষণা দিয়েছে, সেখানেও সরকারি তথ্য (এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের কাছে থাকা তথ্যও) পাওয়া প্রত্যেকের অধিকার হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। যখনি কোন তথ্য কোন মানুষের অধিকার রক্ষা বা অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় মনে হবে, তখনি তা চাওয়া, পাওয়া ও ব্যবহারের সুযোগকে অধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। যদিও তা বাধ্যতামূলক কিছু নয়, তবুও আফ্রিকান ইউনিয়নের এই ঘোষণার প্ররোচনামূলক ব্যাপক মূল্য রয়েছে। যেহেতু এই ইউনিয়ন আফ্রিকার জনগণের বিশাল অংশের প্রতিনিধিত্ব করে সে কারণে তাদের এই ঘোষণার মাধ্যমে তথ্য অধিকারের প্রতি আফ্রিকাবাসীর সম্মিলিত প্রত্যয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আফ্রিকায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক নীতিসমূহের ঘোষণা : চতুর্থ খণ্ড (২০০২)

- সরকারি সংস্থার কাছে থাকা তথ্য সকলের পাওয়ার অধিকার আছে;
- বেসরকারি সংস্থাগুলোর কাছে থাকা তথ্যও প্রত্যেকের পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যদি তা কোনো অধিকার রক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে জরুরি মনে হয়;
- কোনো দপ্তর বা ব্যক্তি তথ্য প্রদানে অস্বীকৃত হলে তার বিরুদ্ধে আপিলের জন্য একটি নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং/অথবা আদালত থাকতে হবে।

- গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ সংশি-ষ্ট তথ্যাদি সরকারি সংস্থাগুলো অবশ্যই প্রকাশ করবে। এমনকি অনুরোধ না থাকলেও বিভিন্ন সংস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটা করবে।
- অন্যায় বা দুর্নীতির তথ্যাদি বা জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কিংবা পরিবেশ হুমকি সংক্রান্ত তথ্যাদি সরল বিশ্বাসে প্রকাশের কারণে কাউকে দোষারোপ, শাস্তি বা বঞ্চনার মাঝে ফেলা যাবে না।
- তথ্যের স্বাধীনতা সংক্রান্ত নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার আইনগুলোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংশোধনী আনতে হবে।[১৬]

আফ্রিকান ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নির্মূল বিষয়ে যে কনভেনশন করেছিল সেখানেও এই স্বীকৃতি ছিল যে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতায় তথ্যে অবাধ অভিগম্যতা সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করে।[১৭] এ কারণে ঐ কনভেনশনের আর্টিক্যাল ৯-এ বলা হয়, "প্রত্যেক রাষ্ট্র দুর্নীতি ও তার সহায়ক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়ক হয় এমন যে কোনো তথ্যে নাগরিকদের প্রবেশাধিকার কার্যকর করতে আইনগত ও সংশি-ষ্ট অন্যান্য পদক্ষেপ নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"[১৮]

অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেইট[১৯]

মানবাধিকার বিষয়ক আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর কনভেনশনে এটা উলে-খ করা হয় যে, "তথ্য ও ভাবনার অনুসন্ধান, তা পাওয়া এবং তার প্রচার ও বিনিময়"কে চিন্তা ও তার প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।[২০]

> যে সমাজ বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক তথ্যাদি পাচ্ছে না সে সমাজ আসলে স্বাধীন কোনো সমাজ নয়।
>
> *–মানবাধিকার বিষয়ক আন্ত:আমেরিকা আদালত ১৯৮৫*[২১]

প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে আন্তঃআমেরিকা রাষ্ট্রগুলোর ঘোষণা গৃহীত হয় ২০০০ সালে। সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকার করা হয় যে, "তথ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকদের অধিকার একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচ্য।[২২] এই অধিকার পুরোপুরি যাতে নাগরিকরা ভোগ করতে পারে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো সেই নিশ্চয়তা দেয়া। এই নীতিমালা গণতান্ত্রিক সমাজে খুবই ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার সীমিত থাকাকে অনুমোদন দেয় এবং সেরূপ ব্যতিক্রমকেও আইন অনুযায়ী পূর্বাহ্নে সুনির্দিষ্ট হতে হবে। পাশাপাশি সেখানে অধিকার সীমিতকরণের সপক্ষে এরূপ যুক্তি থাকতে হবে যে, তথ্য প্রকাশ জাতীয় নিরাপত্তায় বাস্তব ও অনিবার্য হুমকি তৈরি করবে।"[২৩]

তথ্য অধিকার আন্দোলনে ২০০৬ - এর অক্টোবর মাসটি বিশেষ স্মরণীয়। এই দিন

মানবাধিকার বিষয়ক আন্তঃআমেরিকা আদালত জানার অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আন্তর্জাতিক কোনো টাইব্যুনালে এটা হলো তথ্য অধিকারের প্রথম স্বীকৃতি। *Claude Reyes et al. বনাম Chile* শীর্ষক মামলায় আদালত এই মর্মে মত দেন যে, মানবাধিকার সংক্রান্ত আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের ঘোষণার ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদ চিলি লঙ্ঘন করেছে।[২৪] একই সঙ্গে আদালত চিলির প্রতি এই মর্মে নির্দেশও দেয় যে, নাগরিকদের অনুরোধ মতো সরকারি বিভিন্ন সংস্থায় তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে দেশটির দায়িত্ব হলো উপযুক্ত কার্যকর আইনগত কাঠামো গড়ে তোলা।

যেভাবে ইতিহাস তৈরি হলো- অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেইট (ওএএস)-এর যুগান্তকারী রায় : তথ্য অধিকার হলো সকলের মানবাধিকার

Claude Reyes et al. বনাম Chile মামলায় মানবাধিকার বিষয়ক আন্তঃআমেরিকা আদালতের রায়

১৯৯০-এর দশকে 'ট্রিলিয়াম' নামে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় কোম্পানি চিলির রিও কনডোর ভ্যালিতে কাঠ কাটার এক বড় প্রকল্প হাতে নেয়। সেখানে দুই লাখ ৮৫ হাজার হেক্টর দেশজ বন উজাড় করেছিল তারা। 'টেররাম' নামে পরিবেশবাদী একটি বেসরকারি সংগঠন তখন এই মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করে যে, 'ট্রিলিয়াম'-এর বন উজাড় কার্যক্রমের ফলে চিলির নাজুক প্রাকৃতিক ভারসাম্যে যে ক্ষতি হচ্ছে আইন অনুযায়ী তার মোকাবেলায় সরকার সম্ভবত যথেষ্ট সক্রিয় নয়।[২৫] ট্রিলিয়ামকে কাজটি দেয়ার আগে সরকার এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কোনো অনুসন্ধান করেছে কি না, টেররাম সে সম্পর্কে সরকারের সংশি-ষ্ট দপ্তরের প্রতিবেদনের অনুলিপি দাবি করে।

বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইনের কারণে চিলির জন্য এমনিতেই 'ট্রিলিয়াম'-এর কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি নথিবদ্ধ করার দায় ছিল।[২৬] তারপরও টেররামকে এই তথ্যের জন্য আট বছর অপেক্ষা করতে হয়।[২৭] ট্রিলিয়ামকে দেয়া কাজের পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত সরকারি যাচাই প্রতিবেদন বেসরকারি একটি সংস্থাকে দেখাতে সরকার পুনঃপুন অস্বীকার করে। কেবল এই তথ্য জানানো হয় যে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে কত অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে।[২৮]

পরিবেশবাদী সংগঠন 'টেররাম' হতাশ হয়ে এক পর্যায়ে চিলির আদালতের দ্বারস্থ হয়। আবেদনে বলা হয়, সরকারের ভূমিকায় তাদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। আদালতের মাধ্যমে তারা সরকারের কাছে খুবই সাধারণ একটি দাবির উত্তর প্রত্যাশা করে: চিলির ক্ষতিপূরণ অসাধ্য প্রাকৃতিক বন চারিদিক থেকে উজাড় করার অনুমতি দেয়ার আগে– অর্থাৎ কাঠ সংগ্রহে উলি-খিত কোম্পানিকে

বিনিয়োগের সুযোগ দেয়ার আগে সরকার আদৌ কোনো পরিবেশগত অনুসন্ধান চালিয়েছে কি না।[২৯]

সুপ্রিম কোর্টসহ সকল আদালত 'টেররাম'-এর আর্জি প্রত্যাখ্যান করে। সুপ্রিম কোর্ট তখন এই মর্মে মতামত দেয় যে, এই মামলায় তথ্যপ্রাপ্তির যে অনুরোধ তার পেছনে কোন গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থ নেই[৩০] এবং তা 'ভুলভাবে উপস্থাপিত।'

টেররামের কর্মীরা অবশ্য এরূপ রায়ের পরও তাদের অনুসন্ধান ও লড়াই থামায় নি। তারা এরপর মানবাধিকার বিষয়ক আন্তঃআমেরিকা আদালতের দ্বারস্থ হয়। তাদের যুক্তি ছিল আলোচ্য বিষয়ে চিলির সরকার ও আদালত তাদের তথ্য সরবারহ না করে মানবাধিকার বিষয়ক আন্তঃআমেরিকা মানবাধিকার সনদের ১৩ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করছে, যে অনুচ্ছেদে চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকারের কথা উলে-খ রয়েছে। আদালত তখন রায় দেয় যে, চিলি সত্যি সত্যি উপরোক্ত সনদের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছে। এই রায় প্রদান করার মাধ্যমে এই প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক আদালত এই স্বীকৃতিও দিল যে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার অনিবার্যভাবে নাগরিকদের তথ্য চাওয়া, পাওয়া এবং বিনিময়ের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত করে।[৩১] উক্ত আদালত তখন এই মর্মে উপসংহারে উপনীত হয় যে, জনস্বার্থ নিহিত রয়েছে এমন তথ্য সরবরাহ করা সরকারের একটি ইতিবাচক দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা। পরিবেশগত নজরদারি ও তদারকি সংক্রান্ত তথ্য, বিশেষ করে বনাঞ্চল সম্পর্কিত তথ্য অবশ্যই সরাসরি জনস্বার্থ সংশি-ষ্ট। এরূপ তথ্য অবশ্যই জনসমাজে যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি করবে, কারণ আলোচ্য প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া অনুমিত হচ্ছে।[৩২] চিলিতে এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সরকার জনস্বার্থ সংশি-ষ্ট তথ্য সরবরাহের কোনো কার্যকর কাঠামো গড়ে তুলতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তার অর্থ, দেশটিতে জানার অধিকারের রাষ্ট্রীয় কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং চিলিকে জনস্বার্থ সংশি-ষ্ট তথ্য সরবরাহের কার্যকর আইনগত কাঠামো স্থাপন করতে হবে, যে কাঠামো রাষ্ট্রীয় কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে থাকা তথ্য পেতে নাগরিকদের আবেদন মীমাংসা করবে, তাদের তথ্য সরবরাহ করবে।[৩৩]

এই মামলার অগ্রগতি চলা অবস্থাতেই আগ্রহ উদ্দীপক অনেক ঘটনা ঘটতে থাকে। যেমন, ২০০৫ সালের আগস্টে চিলির সংবিধানে এই মর্মে সংশোধনী আনা হয় যে, এখন থেকে রাষ্ট্রীয় কোনো সংস্থার যে কোনো আইন ও সিদ্ধান্ত জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এর ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে : "বিশেষ কোরামের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, বিশেষ কোনো আইন রাষ্ট্র কর্তৃক গোপনীয় হবে।"[৩৪] এক্ষেত্রেও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তঃআমেরিকা আদালত মন্তব্য করে যে, চিলির উপরোক্ত রাষ্ট্রীয় বিধিও জনগণের তথ্য অধিকারকে সীমিত করে। এরূপ সীমিতকরণও আইনগতভাবে সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যা-ই হোক, এ মামলা চলা অবস্থাতেই ট্রিলিয়াম তাদের প্রকল্প প্রত্যাহার করে নেয়।

কাউন্সিল অব ইউরোপ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন[৩৫]

১৯৫০ সালে 'কাউন্সিল অব ইউরোপ' আনুষ্ঠানিকভাবে যত দ্রুত সম্ভব তথ্যে জনগণের অবাধ অধিকার বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছিল। মানবাধিকার সুরক্ষা ও মৌলিক স্বাধীনতা বিষয়ে যে ইউরোপিয়ান কনভেনশন রয়েছে তার ১০ নম্বর আর্টিক্যালে উলে-খ রয়েছে:

> প্রত্যেকের প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, এটা সবার অধিকার। আর এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হবে সরকারী কোন সংস্থার হস্তক্ষেপ ছাড়া যে কোন বিষয়ে এবং যে কোনো পরিসরে মতামত গঠনের অধিকার, তথ্য ও কোন ধারণা পাওয়া এবং বিনিময়ের অধিকার।[৩৬]

ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের এই যে অঙ্গীকার তা সময়ে সময়ে মানবাধিকার বিষয়ক ইউরোপীয় আদালত কর্তৃক আরো বিকশিত হয়েছে এবং নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে মানবাধিকার বিষয়ক যে সনদ রয়েছে তার ১১(১) নম্বর অনুচ্ছেদেও এই অঙ্গীকার ও অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লিসবন চুক্তি[৩৭]-এর পর এই সনদ মেনে চলায় ব্রিটেন ও পোল্যান্ড ব্যাতীত ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

তথ্য অধিকার বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অঙ্গীকার পরবর্তীকালের আরো নানা কার্যক্রমের মাধ্যমেও স্পষ্ট। এই অধিকারকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক বিধান হয়েছে এবং এইসব বিধানের আলোকে দেশে দেশে নানা কাঠামো গড়ে তোলা হয়, যেসবের মাধ্যমে নাগরিকরা ইউনিয়নভুক্ত সংস্থাগুলোর কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য চাইতে পারে।[৩৮]

২০০৮ সালের মার্চে মানবাধিকার বিষয়ক ইউরোপীয় কাউন্সিলের স্টিয়্যারিং কমিটি (সিডিডিএইচ) স্ট্রেসবার্গে দাপ্তরিক নথিতে প্রবেশাধিকার বিষয়ে একটি কনভেনশন গ্রহণ করে। তবে এই সনদের এই মর্মে কিছু সমালোচনা রয়েছে যে, তা ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর এ বিষয়ে প্রচলিত অনেক আইনের চেয়ে তথ্য অধিকারকে সীমিত করেছে। বিশেষ করে মানবাধিকার বিষয়ক আন্ত:আমেরিকা আদালত তথ্য অধিকারের যে মানদন্ড বেঁধে দিয়েছে আলোচ্য সনদ তা থেকে অনেক দুর্বল।[৩৯]

'আরহাস (Aarhus) সনদ'

ডেনমার্কের আরহাস শহরে এই সনদ গৃহীত হয় বলে তার এই নামকরণ। ১৯৯৮ সালের জুনে এই সনদ গ্রহণ করে ইউরোপিয়ান অর্থনৈতিক কমিশন, যার শিরোনাম হচ্ছে: তথ্য অধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশীদারিত্ব এবং পরিবেশগত বিষয়ে ন্যায়বিচার পাওয়া বিষয়ক ইউরোপিয়ান কনভেনশন। এ চুক্তিটি এ কারণে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, এই প্রথম তাতে পরিবেশ, মানবাধিকার এবং তথ্য অধিকার বিষয়ের আন্তঃসম্পর্ক গুরুত্ব পেয়েছে।[৪০] ইউরোপিয়ান দেশগুলোর বাধ্যবাধকতার

বিষয় ছাড়াও এই সনদের আরেকটি গুরুত্বের দিক হলো, এতে রাষ্ট্রপক্ষগুলোকে জনগণের অনুরোধের পাশাপাশি নিজেদের থেকে পরিবেশ বিষয়ক অনেক তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে এও বলা রয়েছে যে, শ্রবণযোগ্য এবং দর্শনযোগ্য মাধ্যমে সংরক্ষিত পরিবেশ বিষয়ক তথ্যাদি এই বিধানের আওতায় পড়বে। ৪০টি ইউরোপিয়ান এবং মধ্যএশীয় দেশ এই কনভেনশন অনুমোদন করেছে এবং সেই আলোকে জনগণকে পরিবেশ বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহের জন্য দেশজ আইনগত ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছে।

এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল[৪১]

এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কোথাও আঞ্চলিকভাবে বিশিষ্ট কোনো মানবাধিকার কাঠামো নেই যেখান থেকে এই অঞ্চলে মানবাধিকার মানদণ্ড তৈরি বা প্রয়োগের তদারকি করা হবে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, এই অঞ্চলের কোনো দেশে তথ্যে জনগণের অধিকারের স্বীকৃতি নেই। মানবাধিকার সম্পৃক্ত চুক্তিগুলোর আলোকে তথ্য অধিকারকে বিবেচনা না করেও এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো সাধারণভাবে অন্যান্য চুক্তির আলোকে ভিন্নভাবে তথ্য অধিকারের ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করছে।

এ অঞ্চলের উলে-খযোগ্য একটি মানবাধিকার সনদে তথ্য অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা হলো 'মানবাধিকার সংক্রান্ত সংশোধিত আরব সনদ'। ২০০৪ সালের মে মাসে আরব লীগের তিউনিশিয়া সম্মেলনে আরব রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতিতে এই সনদ গৃহীত হয়। এই দলিলে সুনির্দিষ্টভাবে আর্টিক্যাল ৩২(১)-এ তথ্য অধিকারের ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেখানে বলা হয়েছে : "বর্তমান সনদ তথ্য অধিকার এবং মতামতের স্বাধীনতা ও তার প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিচ্ছে। নাগরিকরা ভৌগলিক সীমান্ত নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যমে তথ্য ও ভাবের অন্বেষণ, প্রাপ্তি এবং বিনিময়ের অধিকারী।"[৪২] যদিও এ সনদ অনেক দেশই স্বাক্ষর করেছে, তবুও সনদটি কার্যকর হওয়ার জন্য যে সংখ্যক দেশের অনুসমর্থন প্রয়োজন তা এখনো হয়নি।

অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনস্ (আসিয়ান)-এর ১৯৬৭ সালের 'ব্যাংকক ঘোষণা'য় এই সংস্থার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উলে-খ করা হয় তাতে জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সনদগুলোর নীতিমালা অনুসরণের অঙ্গীকার ছিল– যার মধ্যে সর্বজনীন বিশ্ব মানবাধিকার সনদের তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 'আর্টিক্যাল ১৯'-ও পড়ে।[৪৩]

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এডিবি-ওইসিডি)-এর দুর্নীতি বিরোধী উদ্যোগগুলোর কর্মপরিকল্পনায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর তথ্য স্বাধীনতা বিষয়ক অঙ্গীকারের বিশেষ উলে-খ দেখা যায়।

যেখানে এরূপ উলে-খ রয়েছে, "সাধারণ জনগণ এবং মিডিয়ার এই স্বাধীনতার নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা যেন অভ্যন্তরীণ আইন অনুযায়ী জনস্বার্থ সংশি-ষ্ট তথ্যাদি এবং বিশেষভাবে দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্যাদি পেতে পারে এবং বিনিময় করতে পারে। তবে তাতে যেন প্রশাসনের কার্যকারিতার প্রশ্নে কোন আপসমূলক অবস্থা তৈরি না হয়, বা অন্য কোন উপায়ে সরকারি সংস্থা বা সেখানে কর্মরত কোন ব্যক্তির স্বার্থের কোনো অনিষ্ট করে তা।"[৪৪]

এরপরই উলে-খ করতে হয় 'প্যাসিফিক পরিকল্পনা'র কথা। প্রশান্ত মহাসাগরীয় ১৬টি দ্বীপরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ এই পরিকল্পনার অনুমোদন দেন। এই পরিকল্পনার একটি বড় দিক ছিল, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে তথ্য স্বাধীনতার লক্ষ্যে বিদ্যমান কাঠামোগুলোর বিকাশ সাধন করা।[৪৫] পরিকল্পনার এ দিকটি নির্দেশ করছে সংশি-ষ্ট দেশগুলো তথ্যে অংশীদারিত্ব বাড়াতে কতটা আগ্রহী। বর্তমানে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোর ফোরাম সচিবালয় তথ্য উন্মুক্তকরণের নিজস্ব নীতিমালা তৈরির প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এ ধরনের নীতিমালার মাধ্যমে ফোরামের কাছে থাকা নীতিমালায় নাগরিকদের ব্যবহার সক্ষমতা গড়ে উঠবে।

"তথ্যের অধিকার" সুশাসন ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি বহু ক্ষেত্রেই একে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিকল্পনায় একে অন্তর্ভুক্ত করে, আমাদের নেতৃবৃন্দ নিজেদের প্রতিই এই আহ্বান রাখছেন যে, অন্য অনেক বিষয়ের পাশাপাশি আমাদের অঞ্চল "তার শাসন প্রক্রিয়ার ধরনের কারণেও সম্মান প্রত্যাশী। যেমনটি সে সম্মানিত তার সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পূর্ণ বাস্তবায়ন, প্রতিবেশি ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং মানবাধিকারের সুরক্ষা ও বিকাশে ভূমিকার কারণে। তথ্য অধিকার আমাদের বোঝাপড়া ও যোগাযোগ সামর্থ্য বৃদ্ধি করবে এবং সবার টেকসই অস্তিত্বের নিশ্চয়তা বাড়াবে।"

– গ্রেগ উরউন, সেক্রেটারী জেনারেল, প্যাসিফিক আইল্যান্ড ফোরাম সেক্রেটারিয়েট[৪৬]

কমনওয়েলথ

১৯৮০ সালে বারবাডোসে কমনওয়েলথ আইনমন্ত্রীদের এক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলন শেষে যে আনুষ্ঠানিক বার্তাটি প্রচারিত হয় তাতে উলে-খ করা হয়: "সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী মন্ত্রীরা এই মর্মে মতপ্রকাশ করেছেন যে, সরকারি তথ্যে যখন নাগরিকদের পর্যাপ্ত অভিগম্যতা থাকে তখনি কেবল সরকার ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ প্রকৃতভাবে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে।" ১৯৯৯ সালে কমনওয়েলথ 'জানার অধিকার এবং গণতন্ত্র ও উন্নয়নের বিকাশ' সম্পর্কিত তার বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে তথ্য অধিকারের মূল্যবান ভূমিকার সপক্ষে কয়েকটি কতগুলো শক্তিশালী নীতিমালা ও নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত ছিল–

> তথ্য অধিকারের সুবিধা বহুমুখী। প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত করে এই অধিকার। এর মাধ্যমে জনস্বার্থ সংশি-ষ্ট কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। তথ্যে অভিগম্যতা থাকার কারণে তখন মানুষ সত্যিকারের পছন্দকে বাছাই করতে পারে। এ প্রক্রিয়াতেই কেবল

গণতন্ত্রের চর্চা কার্যকর রূপ নেয়। এটা আবার পরোক্ষে সরকারের জবাবদিহিতাকে বেগবান করে, নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটায় এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্যও তা সহায়ক হয়– কারণ তারা জনভাবনা বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকে। এই প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের কাছে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে, সরকারি-বেসরকারি কাজে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তিশালী সহায়তা পাওয়া যায়। যেসব জনপদে দারিদ্র্য ও ক্ষমতাহীনতা প্রবল, সেখানে জীবনযাত্রার মান বাড়াতে এবং উন্নয়নকে বিকশিত করতে এর ভূমিকা মৌলিক ও অপরিহার্য।[৪৭]

উপরোক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই কমনওয়েলথ-এর তথ্যের স্বাধীনতা বিষয়ক নীতিমালার খসড়া তৈরি হয়। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১৯৯৯ সালে কমনওয়েলথ আইনমন্ত্রীদের বৈঠকে এ বিষয়ে যে চূড়ান্ত নীতিমালা অনুমোদিত হয়, তা পূর্বাহ্নে দেয়া এসংক্রান্ত বিশেজ্ঞ দলের নীতি ও নির্দেশনার মতো পূর্ণাঙ্গ এবং প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্যের ছিল না। পরবর্তীকালে ওই বছরই কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে উপরোক্ত নীতিমালার আরো গভীরতর স্বীকৃতি মেলে যখন তারা সম্মিলিতভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের পূর্ণ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা, শাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানো এবং সরকারের কাছে থাকা তথ্যে নাগরিকদের বাড়তি অভিগম্যতার অঙ্গীকারের কথা বলেন।

তথ্যের স্বাধীনতা বিষয়ক কমনওয়েলথ নীতিমালা

১. তথ্য স্বাধীনতাকে একটি আইনগত এবং বাস্তবায়নযোগ্য অধিকার হিসেবে গণ্য করাকে সদস্যভুক্ত দেশগুলো উৎসাহিত করবে;

২. তথ্যকে সর্বান্তকরণে উন্মুক্ত বিবেচনার একটি সংস্কৃতি মেনে চলতে হবে। সরকারকে তার কার্যক্রমের তথ্যাদি প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করতে হবে;

৩. তথ্য উন্মুক্তকরণের নীতি বা তথ্যে অভিগম্যতার অধিকারের কিছু পরিমাণে সীমা থাকতে পারে। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে এই সীমার ভেতরে যত কম তথ্য রাখা যায়। অর্থাৎ সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্মুক্তকরণের নীতি অনুসরণ হওয়া উচিত;

৪. সরকারকে তার দলিলপত্র রক্ষা ও সংরক্ষণ করতে হবে;

৫. দলিলপত্রে অভিগম্যতা প্রত্যাখ্যাত হলে বা কাউকে সরকার তা ব্যবহার করতে দিতে অস্বীকৃত হলে এরূপ নীতি থাকা উচিত যে, এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা নিরপেক্ষ কোনো সংস্থা কর্তৃক মূল্যায়িত হওয়ার সুযোগ থাকবে।

তথ্য অধিকার 'অন্য সকল অধিকারের কষ্টিপাথর' তুল্য

তথ্য অধিকার হলো এমন এক অধিকার যে, তাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করলে এর গুরুত্ব পুরোপুরি অনুভব করা যায় না। বরং অন্যসকল মানবাধিকারের বাস্তবায়নে এর রয়েছে মৌলিক ভূমিকা। জাতিসঙ্ঘ যেমনটি বলেছে, "তথ্য অধিকার হলো অন্য সকল স্বাধীনতার কষ্টিপাথর।" প্রথাগতভাবে, তথ্য অধিকারকে জনগণের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার হিসেবেই চিত্রিত করা হয়। বিশেষ করে, আইসিসিপিআর (ICCPR)-এর ১৯ নম্বর আর্টিক্যালে তথ্য অধিকারের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে তার এই বিশেষ পরিচয়। কিন্তু এই অধিকার ক্রমাগতভাবে এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাচ্ছে যে, সমস্ত ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ব্যবহারিক পরিসরে বাস্তবায়ন করতে হলে তথ্যে স্বাধীন অভিগম্যতা অপরিহার্য। সমাজের বিশেষ কিছু জনগোষ্ঠী, যেমন- নারী ও শিশুদের অধিকার কার্যকর করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকারের গুরুত্ব আরো বেশি।

অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার

যদিও আইসিইএসসিআর (ICESCR) সনদে তথ্য অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, তবুও 'কমিটি অন সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক রাইটস্' নামে এর যে আন্তর্জাতিক মনিটরিং কাঠামো রয়েছে, তার তরফ থেকে আইসিইএসসিআর সনদের অধিকারগুলোর বাস্তবায়নে তথ্য অধিকারের প্রয়োজনীয় ভূমিকা সম্পর্কে অনেক 'সাধারণ মন্তব্য' রয়েছে। বিশেষ করে শাসন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং সেই প্রক্রিয়ায় জনগণের অভিগম্যতার জন্য তথ্যের জরুরি ভূমিকা সম্পর্কে কমিটি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। যেমনঃ সবচেয়ে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়ার অধিকার সম্পর্কিত ১৪ নম্বর সাধারণ মন্তব্যে বলা হয়ঃ "স্বাস্থ্য অধিকারের সকল রূপ এবং সকল স্তরের ক্ষেত্রে আন্তঃসম্পর্কিত এবং অতি জরুরি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তু থাকতেই হবে, যথা– তথ্যে সহজে প্রবেশের সুযোগ; এই সুযোগের মধ্যে থাকতে হবে স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া, জানতে পাওয়া ও প্রাপ্ত তথ্য বিনিময়ের অধিকার।"[৪৮]

উপরোক্ত দলিলের ৪৪(বি) নম্বর অনুচ্ছেদে আইসিইএসসিআর (ICESCR) চুক্তির রাষ্ট্রপক্ষসমূহের দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে যেয়ে বলা হয়েছে : "যে কোনো কমিউনিটির মুখ্য স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো সম্পর্কে, সেসব সমস্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উপায়সহ এ বিষয়ক সকল তথ্যাদি সেখানকার মানুষকে সরবরাহ করতে হবে এবং তাদের মাঝে এ বিষয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হবে।"[৪৯] 'কমিটি অন সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক রাইটস্' প্রায় অনুরূপ আন্তঃসম্পর্ক নির্দেশ করেছে পানির অধিকার (১৫ নম্বর সাধারণ মন্তব্য)[৫০], শিক্ষার অধিকার (১৩ নম্বর সাধারণ মন্তব্য)[৫১] এবং খাদ্যের অধিকার (১২ নম্বর সাধারণ মন্তব্য)[৫২]-এর সঙ্গে তথ্য

অধিকারের। পানি, শিক্ষা, খাদ্য ইত্যাদি মৌলিক অধিকারে নাগরিকদের অভিগম্যতা এগুলো সম্পর্কে সহজে তথ্য পাওয়ার অধিকারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। এসব অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হলে, লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে এসব অধিকার সম্পর্কিত প্রকল্পগুলোর নীতিগত প্রস্তুতি থেকে শুরু করে তাদের কার্যকারিতা তদারক করা এবং তার মূল্যায়ন করার জন্য সামগ্রিক তথ্যাদি পেতে হবে।

অধিকার আন্দোলনের 'তৃতীয় প্রজন্ম' তথা গ্রুপভিত্তিক অধিকার

সমাজের বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষার বিষয়েও ইতিমধ্যে বিশ্বে অনেক চুক্তি হয়েছে। এরূপ মানবাধিকার চুক্তিগুলোতেও তথ্য অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে স্বীকৃতি রয়েছে। এক্ষেত্রে সিডও সনদ (কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অব অল ফর্মস্ অব ডিসক্রিমেনেশন এগেইনস্ট উইমেন), সিআরসি (কনভেনশন অন দ্য রাইটস্ অব দ্য চাইল্ড) সনদ, প্রবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের অধিকার সম্পর্কিত সনদ (ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন দ্য প্রটেকশন অব দ্য রাইটস্ অব অল মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড মেম্বার অব দেয়ার ফ্যামিলিস)[৫৩]-এর উলে-খ করা যায়। সরকারের কাছ থেকে উলি-খিত বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী যাতে অধিকার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য পায়, সেই নিশ্চয়তা দেয়ার দায়িত্ব এসব সনদে অর্পিত হয়েছে রাষ্ট্রপক্ষগুলোর উপর।

নারী ও শিশুদের জন্য তথ্য খুবই জরুরি

সিডও তথা 'নারীর বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্য নির্মূল সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ'[৫৪]

১০ নম্বর অনুচ্ছেদ (শিক্ষা)

"রাষ্ট্রপক্ষগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে তার বিরুদ্ধে বিদ্যমান বৈষম্য নির্মূলে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে এবং বিশেষভাবে এটা নিশ্চিত করবে যে,... স্বাস্থ্য ও পরিবারের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিষয়ক সুনির্দিষ্ট তথ্যসমূহ, যেমন, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যাদি নারী যেন পায়।"

১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ (বিয়ে এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে)

"রাষ্ট্রপক্ষগুলো বিয়ে এবং পারিবারিক সম্পর্কের সকল বিষয়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে তার বিরুদ্ধে বিদ্যমান বৈষম্য নির্মূলে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে এবং বিশেষভাবে এটা নিশ্চিত করবে যে,...পরিবারের সম্ভাব্য সন্তান সংখ্যা, তাদের জন্মদানের মধ্যবর্তী বিরতি ইত্যাদি বিষয়ে নারী স্বাধীনভাবে এবং দায়িত্বের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে, পাশাপাশি এসব বিষয়ে তার অধিকার চর্চা এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও শিক্ষাও সে পাচ্ছে।"

শিশু অধিকার বিষয়ক সনদ[৫৫]

১৩ নম্বর অনুচ্ছেদ

"শিশুদের প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে, এটা তার অধিকার; যে কোনো বিষয়ে, প্রসঙ্গ নির্বিশেষে, প্রয়োজনীয় তথ্য ও ভাবনা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে জানতে চাওয়া, সেটা পাওয়া এবং তা বিনিময়ের অধিকারও শিশুর প্রকাশের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করতে হবে। তথ্য ও ভাবনার হদিসের মাধ্যম হতে পারে মৌখিক, হতে পারে তা মুদ্রিত বা লিখিত বা কোনো শিল্পিত রূপে। শিশু তার পছন্দনীয় ভিন্ন কোনো মাধ্যমেও তথ্য চাইতে পেতে পারে।"

অন্য অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়তো সেগুলোতে মানবাধিকার সুরক্ষার বিষয় বিস্তারিতভাবে উলে-খ নেই– ভিন্ন প্রসঙ্গই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে, সে রকম বহু ক্ষেত্রেও জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার উপায়স্বরূপ তথ্যে প্রবেশগম্যতাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উলে-খ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ, পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক 'রিও ঘোষণা'র উলে-খ করা যায়– যেখানে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছিল যে, জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদান এবং এরূপ কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যে প্রত্যেক নাগরিকের অভিগম্যতা থাকতে হবে। রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব হলো এ সম্পর্কিত তথ্য জনসমাজে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা।[৫৬] টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক ২০০২ সালের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো এটা স্বীকার করেছিল যে, রিও ঘোষণার বাস্তবায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো সুশাসনের। সেক্ষেত্রে শেষোক্ত সম্মেলন থেকে টেকসই উন্নয়ন নীতি তৈরি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বাড়াতে আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[৫৭] অন্যদিকে উন্নয়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণকে অংশগ্রহণের জন্য সমর্থ করে তুলতে হলে রাষ্ট্রসমূহের দায়িত্ব হয়ে পড়ে তাদের আইন, বিধি ইত্যাদি সম্পর্কে জানানো। টেকসই উন্নয়নের বিকাশে বিভিন্ন সময়ে সরকারের গৃহীত নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জনগণকে অবহিত রাখাও এক্ষেত্রে জরুরি।

দুর্নীতিবিরোধী ২০০৩ সালের জাতিসঙ্ঘ সনদেও তথ্যে প্রবেশাধিকার দুর্নীতি নির্মূল বিষয়ক কেন্দ্রীয় ভাবনার গুরুত্বপূর্ণ এক উপাদান হিসেবে উলে-খ রয়েছে। এই সনদের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জনগণকে অংশীদার হতে উদ্বুদ্ধ করতে তথ্যের ভূমিকার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়।[৫৮]

সবশেষে বলতে হয়, তথ্যে মানুষের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অঙ্গীকারের ঘাটতি নেই। বিশেষ করে, বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য উন্মুক্তকরণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার এখন খুবই শক্তিশালী। উন্নত এবং

উন্নয়নশীল সকল ধরনের দেশই ইতিমধ্যে নানাভাবে মানবাধিকার বিষয়ক সনদ এবং বিভিন্ন সম্মেলন থেকে উচ্চারিত ঘোষণামূলক অঙ্গীকারগুলো স্বচ্ছতার সঙ্গে বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রতিশ্রুত। তবে এও নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হয় যে, উপরোক্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বত্র রাজনৈতিক সদিচ্ছার গতি খুবই ধীর। শাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার বিষয়টি প্রতিশ্রুতির সঙ্গে পাল-া দিয়ে এগোচ্ছে না। বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মধ্যে এখনো অর্ধেকেরও কম দেশ তথ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আইন তৈরি করেছে।

অধ্যায় তিনঃ
জাতীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার

তথ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে সরকারগুলো যা করছে

মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দলিল, ঘোষণা, স্বীকৃতি ও কাঠামোতে তথ্য অধিকারের উলে-খ থাকলেও তার বাস্তব মূল্য কম– যদি না কোনো দেশের সরকার তথ্য অধিকারের চর্চার সুযোগ করে দেয়। জনগণ যাতে সরকারের জিম্মায় থাকা তথ্য ব্যবহার করতে পারে, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ আইনগত রক্ষাকবচ প্রয়োজন।

অনেকেই এ রকমটি মনে করেন যে, সরকারিভাবে তথ্য অধিকার বিষয়ক আইন হলেই কেবল সরকার তার জিম্মায় থাকা তথ্য মানুষকে জানতে দেবে। আসলে একটি সরকার চাইলে নানাভাবে সরকারি তথ্য জনগণকে জানাতে পারে।

স্বউদ্যোগে সরকারি তরফ থেকে জনগণকে তথ্য জানানো

তথ্য অধিকার চর্চায় জনগণের জন্য সরকারিভাবে প্রথম করণীয় হলো এই নিশ্চয়তা দেয়া যে, এ বিষয়ে আইন না থাকলেও একজন নাগরিক চাইলে প্রয়োজনীয় তথ্য পাবে। এক্ষেত্রে সরকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজে থেকেই তথ্য প্রকাশের নীতি গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সোলোমন দ্বীপপুঞ্জের কথা বলা যায়, যেখানে সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সরকার তার নীতি ও কর্মসূচির তথ্যাদি জনগণকে জানাচ্ছে, যা এই অধিকারের পক্ষে তার বাড়তি অঙ্গীকারই প্রকাশ করে। এ দেশটির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্যের জন্য আবেদন না করলেও এবং দীর্ঘ অপেক্ষায় না থেকেও সরকারি তথ্য পেয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সরকার তথ্য প্রকাশের কিছু কাঠামো গড়ে তুললে মানুষ তার ব্যবহারের মাধ্যমেই তাদের প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুযায়ী সেখান থেকে তথ্য পেতে পারে।

সোলোমন দ্বীপপুঞ্জ : 'পিপলস্ ফাস্ট' নেটওয়ার্ক

সরকারি কাজের প্রতি জনআস্থা ও বিশ্বাস বাড়াতে সোলোমন দ্বীপপুঞ্জের বেসরকারি একটি সংগঠন তাদের বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে 'পিএফ নেট' (পিপলস্ ফাস্ট নেটওয়ার্ক) নামে একটি কর্মসূচি চালু করে। ২০০৫ সালে সোলোমন দ্বীপপুঞ্জের পল-ী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় আরডিভিএ (রুরাল ডেভেলপমেন্ট ভলান্টিয়ার অ্যাসোসিয়েশন)-এর এই কর্মসূচি শুরু করে।[১] 'পিএফ নেট' কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল : "তথ্যে অভিগম্যতা বাড়িয়ে এবং গ্রামীণ এলাকায় মানুষের যোগাযোগ সক্ষমতা বাড়িয়ে শান্তি স্থাপন-উদ্যোগকে সহায়তা এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সফলতা অর্জন।"[২] এই উদ্দেশ্য অর্জন করতে যেয়ে 'পিএফ নেট' গ্রামীণ বিভিন্ন কমিউনিটির মাঝে দেশব্যাপী ইমেল স্টেশনের একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে। সরকারি বিভিন্ন অবকাঠামো, যেমন– স্থানীয় স্কুল, প্রাদেশিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

ইত্যাদিতে এই ইমেল স্টেশনগুলো স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশটির রাজধানী হানিয়ারাতে[৩] একটি ইন্টারনেট ক্যাফে স্থাপিত হয়। পাশাপাশি 'পিএফ নেট' প্রতিনিয়ত স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত সার তৈরি করত এবং তা ইমেল স্টেশনগুলোতে পাঠিয়ে দেয়া হতো, যাতে জনগণ সহজেই দেশ-বিদেশের খবরাখবরও নিয়মিত জানতে পারে।

তথ্য অধিকার চর্চার জন্য জনগণের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা তৈরি করা এই অধিকার অর্জনের পথে একটি উলে-খযোগ্য অগ্রগতি হলেও তা তখনি কেবল পূর্ণতা পায়, যদি জনগণকে পুরোমাত্রায় সেই কাঠামোগত হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়া হয়। 'পিএফ নেট' প্রকল্পের বিবেচনাতেও এটা ছিল যে, গ্রামীণ জনগণের কাছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহজবোধ্য কোনো ব্যাপার নয়, এক্ষেত্রে তাদের ব্যবহারিক সহায়তা প্রয়োজন। এ কারণে 'পিএফ নেট' প্রতিটি ইমেল স্টেশনে যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ দু'জন করে কর্মী নিয়োগ করে। এই কর্মীরা অপারেটরের ভূমিকা পালন করতেন। তারা গ্রামীণ মানুষদের চাহিদা বুঝে সেই অনুযায়ী তথ্য পেতে তাকে সহায়তা করতেন। ফলে নিরক্ষরতা কখনো ওই মানুষদের তথ্য অনুসন্ধানে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়নি।[৪]

'পিএফ-নেট' কর্মসূচির ফলাফল ছিল সোলোমন দ্বীপপুঞ্জে অত্যন্ত ইতিবাচক। দেশটিতে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য এই প্রকল্প সুধীজনের বিশেষ স্বীকৃতি পায়। জনগণকে তথ্য সমৃদ্ধ রাখা এবং ভুল তথ্য প্রচার করে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা প্রতিরোধে এই কর্মসূচি বেশ কার্যকর প্রমাণিত হয়।[৫]

'পিএফ-নেট' কর্মসূচির সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সোলোমন দ্বীপপুঞ্জের সরকার ২০০৬ সালে একটি অফিসিয়াল ওয়েব সাইট চালু করে। এটা ছিল এরূপ প্রথম উদ্যোগ। ওয়েব সাইটটি চালুর লক্ষ্য ছিল: "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে সরকারি সার্ভিসগুলো জনগণের মাঝে প্রচার করা, সেগুলোর প্রসার ঘটানো এবং সরকারি কাজের কার্যকারিতা ও স্বচ্ছতা বাড়ানো।"[৬]

এই ওয়েব সাইটে সরকার নিজে থেকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রেস রিলিজ, ধারণাপত্র, খসড়া বিল এবং অন্যান্য সরকারি দলিলপত্র তুলে ধরছে।[৭] তথ্য প্রকাশে সরকারের এরূপ স্বয়ংক্রিয় উদ্যোগের মাধ্যমে এবং প্রতিনিয়ত তথ্য-অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় সোলোমন দ্বীপপুঞ্জের সরকার জবাবদিহিতার বৃহত্তর ও বিশ্বাসযোগ্য এক পরিসর তৈরির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরকারের ওপর জনআস্থা বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

কিছু বিশেষ ধরনের তথ্য পেতে আইন

অনেক দেশে এমন কিছু আইন তৈরি হয়েছে, যেসব আইনের আওতায় বিশেষ কিছু বিষয়ে তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ পরিবেশ সুরক্ষা আইনের কথা বলা যায়। এরূপ আইন থাকার কারণে অনেক সরকারকে নিজে থেকেই এখন যে কোনো প্রকল্পের পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া যাচাই করতে হয় এবং জনগণের মাঝে সে তথ্য প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা থাকে।

কানাডার পরিবেশ সুরক্ষা আইন অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠান যখন প্রচুর রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে কোনো কাজ করে তখন সেই প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বর্জ্য কোথায় কীভাবে ফেলা হচ্ছে কিংবা নিষ্কাশন করা হচ্ছে, সে সম্পর্কিত তথ্য জনগণকে জানানোর ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে রিপোর্ট করতে হয়।[৮] দেশটির অন্যতম শহর টোরেন্টোর স্থানীয় সরকার এই বিধানকে আরো সম্প্রসারিত করে কমিউনিটিভিত্তিক জানার অধিকার বিষয়ক আরেকটি নিয়ম করেছে যে, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বর্জ্য নিয়ে যাদের কারবার, সে রকম ক্ষুদে ব্যবসায়ীদেরও এখন থেকে কমিউনিটিকে রাসায়নিকের ব্যবহার এবং নিষ্কাশন সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানাতে হবে।[৯] জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিবেশ সুরক্ষা কার্যালয়ের একজন ব্যবস্থাপকের বক্তব্য হচ্ছে, এরূপ আইনের মাধ্যমে দূষণকারীদের উপর "রাসায়নিকভিত্তিক তাদের কাজে আরো মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য এবং কোথায় কীভাবে এরূপ কাজের বর্জ্য নির্গত হচ্ছে সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য এক ধরনের চাপ তৈরি হবে। দূষণ রোধে এরূপ সতর্কতা ও আইনগত চাপ অবশ্যই সর্বোচ্চ জনস্বার্থের জন্য উদ্দীপনামূলক।"[১০] একজন স্থানীয় পরিবেশবাদী কর্মী বলেন, পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক রাসায়নিক সংক্রান্ত তথ্যের এরূপ উন্মুক্তকরণ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কার্যক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের নজরদারির সুযোগ বাড়িয়েছে। এখন স্থানীয় নাগরিকরা লক্ষ্য রাখতে পারবেন সংশি-ষ্ট ব্যবসায়ীরা পরিবেশ বিষয়ক আইন মেনে চলছেন কি না।[১১] এর ইতিবাচক ফল যে অনিবার্য তা বোঝা যায়, যখন দেখা গেল, টোরেন্টোর পরিবেশ বিষয়ক এরূপ সংঘবদ্ধতা ম্যাসাচুসেটস 'টক্সিক রিডাকশন অ্যাক্ট' (কমিউনিটির পরিবেশ বিষয়ক তথ্য জানার অধিকার বিষয়ক অনুরূপ এক আইন) তৈরি হতে ভূমিকা রেখেছিল। এ ধরনের আইন স্থানীয় পর্যায়ে বিষাক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার অন্তত ৪০ ভাগ কমিয়েছে।[১২]

বেসরকারি কর্পোরেশনগুলোকে নিয়মনীতির মধ্যে নিয়ে আসতে অনেক দেশেই বিস্তারিত আইন রয়েছে এখন। এসব আইনের আওতায় কর্পোরেশনগুলোকে বাৎসরিক প্রতিবেদন, ব্যালান্সশিট, আয়-ব্যয় ও খরচের বিবরণী প্রকাশ করতে বাধ্য করা যাচ্ছে। অনেক স্থানে ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ আইনের কারণে উৎপাদক বা বিপণনকাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের পণ্যের গুণগত মান এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মানদণ্ড সম্পর্কিত অনেক তথ্য ক্রেতাকে জানাতে বাধ্য করা যাচ্ছে। অনেক দেশে সম্পত্তির তথ্যাদি নথিভুক্ত করা ও সংরক্ষণ করা বিষয়ে যুগোপযোগী আইনগত বিধি- বিধানের

মাধ্যমে নাগরিকদের প্রয়োজনে সহজে সেসব নথি ব্যবহার এবং অনুলিপি পাওয়ার সুযোগ করে দেয়া যাচ্ছে।[১৩]

তথ্য অধিকারের সাংবিধানিক সুরক্ষা

বলার স্বাধীনতা এবং প্রকাশের স্বাধীনতাকে সুরক্ষা দিয়েছে অনেক দেশের সর্বোচ্চ আইন তথা সংবিধান। ওইসব দেশের সংবিধানের সংশি-ষ্ট ধারাগুলোকে স্থানীয় আদালত অনেক সময়ই এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যে, বলা ও প্রকাশের স্বাধীনতায় তথ্য অধিকারও সংযুক্ত বিবেচনা করতে হবে। যেমন– ভারতে তথ্য অধিকার বিষয়ক সুনির্দিষ্ট আইনটি তৈরি হয়েছে মাত্র ২০০৫ সালে। কিন্তু তার ২৫ বছর পূর্বে সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে অভিমত দিয়েছিল যে, বলা ও প্রকাশের যে স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে তথ্যে প্রবেশের অধিকার তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।[১৪] আগ্রহ উদ্দীপক আরেকটি দিক হলো, ভারতীয় সর্বোচ্চ আদালত কেবল যে তথ্য অধিকারকে বলা ও প্রকাশের স্বাধীনতার অংশ বিবেচনা করেছে তা-ই নয়, আদালত এই মতও দিয়েছিল যে, তথ্য অধিকার হলো জীবনের অধিকারের অপরিহার্য উপাদান– প্রত্যেক মানুষের যে অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা রয়েছে।[১৫]

অনেক দেশে তথ্য অধিকারের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ আরো সবল; বিশেষত যেখানে সংবিধানে একটি পৃথক ও সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে তথ্যে অভিগম্যতাকে অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, হাঙ্গেরির সংবিধানের ৬১ নম্বর অনুচ্ছেদে তথ্য অধিকারকে সুরক্ষা দিয়ে বলা হচ্ছে: "মানুষের এই অধিকার থাকবে যে, সে স্বাধীনভাবে তার মতামত রাখতে পারে এবং পাশাপাশি জনস্বার্থ জড়িত এমন তথ্যে তার প্রবেশ নিশ্চিত করতে হবে; এরূপ তথ্যের বিতরণও নিশ্চিত করতে হবে।"[১৬] হাঙ্গেরির সাংবিধানিক আদালত এই মর্মেও রায় দিয়েছে যে, সংবিধান যে কেবল তথ্য স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তা-ই নয়, এটা গোপনীয়তা আইনের অবসানের নির্দেশনাও দেয়, যে আইন জানার অধিকারের সুফলকে খর্ব করে।[১৭]

অনেক সংবিধানই কার্যত যা দাবি করে তা হলো, সরকার সংবিধানের চেতনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি নতুন আইন করে সরকারি বিভিন্ন দফতরে নাগরিকদের তথ্য অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে ব্যবহারিক কাঠামো গড়ে তুলবে। উদাহরণ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানের কথা বলা যায়। সেখানে (অনুচ্ছেদ নম্বর ৩২) প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য জানার অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, [উপ-অনুচ্ছেদ ৩২(২)] নাগরিকদের "ওই অধিকারের বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই জাতীয়ভিত্তিক আইন তৈরি করতে হবে।"[১৮] সেই নির্দেশনার আলোকে দেশটিতে ২০০০ সালে 'তথ্য অধিকার বিকাশ আইন' তৈরি করে জাতীয় পার্লামেন্ট।[১৯] উগান্ডা এবং পাপুয়া নিউগিনির সংবিধানও তথ্য অধিকার বিষয়ে সমধর্মী বৈশিষ্ট্যের। সেখানেও সংবিধান

তথ্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে তার ব্যবস্থাপনাগত দিকের জন্য আইন তৈরির নির্দেশনা দিয়েছে। পাপুয়া নিউগিনি এখনো তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য পৃথক কোনো আইন না করলেও উগান্ডা ২০০৫ সালে এরূপ আইন তৈরি করে নিয়েছে।

তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনগুলো

রাষ্ট্রের মাঝে সকল ধরনের তথ্যে মানুষের জানার অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৮০টি দেশে সুনির্দিষ্ট আইন তৈরি হয়েছে।[২০] তথ্য অধিকারকে কেন্দ্র করে একটি পৃথক ধাঁচের আইন সরকার ও জনসাধারণ উভয়কে বুঝতে সাহায্য করছে কোন ধরনের তথ্যে কমিউনিটির জানার অধিকার রয়েছে এবং আইনগতভাবেই কোন কোন খাতের তথ্য গোপন থাকতে পারে। পাশাপাশি তথ্য প্রত্যাশী কোন নাগরিককে যখন অযৌক্তিকভাবে তার প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়, তখন করণীয় কী– সে ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় অনুরূপ আইনে। ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এরূপ আইন থাকার মাধ্যমেই ব্যবহারিকভাবে জনগণের তথ্য অধিকারের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। যেখানে এরূপ আইন নেই এবং যেখানে অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট এখনো রাজত্ব করে যাচ্ছে, সেখানে সরকারি জিম্মায় থাকা কোনো তথ্য পেতে নাগরিকদের আদালতে গিয়ে আবেদন করতে হয়। বলা বাহুল্য, এ প্রক্রিয়াটি কেবল সময়সাপেক্ষই নয়, ব্যয়বহুলও বটে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির কোনো সহজ ও ব্যবহারযোগ্য পথ হতে পারে না এটা।

তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করতে আইন তৈরিই হলো সর্বোত্তম পন্থা

জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য থাকে সচরাচর সরকারি সংস্থাগুলোর কাছে। সেই তথ্য মানুষের দরকার। এটা পাওয়া তাদের অধিকার। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে কীভাবে আবেদন জানাতে হবে এবং সে তথ্য পাওয়ার প্রক্রিয়া কী হবে সেটা নিশ্চিত করে আইন। নাগরিকরা কীভাবে বৈধ পথে এবং সকলে একই কাঠামোবদ্ধ পথে তাদের তথ্য অধিকারের প্রয়োগ ঘটাতে পারে সেই নিশ্চয়তা তৈরি করে আইন। লক্ষ্য করা গেছে, তথ্য অধিকার বিষয়ক পৃথক আইন থাকলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনের প্রতি অধিক দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন করে। অর্থাৎ সরকারি সংস্থাগুলোর জনমুখী দায়িত্বশীলতা বাড়াতেও তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা রয়ে গেছে। 'ওপেন সোসাইটি জাস্টিস ইনিশিয়েটিভ'-এর এক অনুসন্ধানে বলা হয়–

> গবেষণার অংশ হিসেবে যখন বিভিন্ন দেশে সরকারি সংস্থাগুলোর কাছে জনগণের দিক থেকে প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়েছিল, তখন যেসব দেশে তথ্যের স্বাধীনতার জন্য আইন রয়েছে, সেখানে সহজে তা পাওয়া গেছে। যেসব দেশে অনুরূপ আইন নেই, সেখানে তথ্য পাওয়া

তুলনামূলকভাবে অনেক দুরূহ দেখা গেছে। গবেষণার আওতাধীন সকল দেশে তথ্য অধিকার আইনের ইতিবাচক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দেখা গেছে। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফলের বিশেষ একটি দিক হলো, যেসব দেশে সরকার আন্তরিকভাবে তথ্য স্বাধীনতার আইনকে কাজ করতে দিচ্ছে, সেখানে সরকারি দফতরে তথ্যের জন্য জনগণের আবেদন আগের চেয়ে অন্তত তিনগুণ বেশি দ্রুততায় মীমাংসিত হচ্ছে।[২১]

তথ্য অধিকারের সুরক্ষায় তৈরি আইনে যা থাকা উচিত

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তথ্য অধিকারের সপক্ষে বা এই অধিকার সম্পর্কিত বহু ধরনের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এসব মানদণ্ডের মাধ্যমে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, মানুষের তথ্য অধিকারের কোন কোন মৌলিক উপাদান এ সংক্রান্ত আইনে অপরিহার্যভাবে সুরক্ষিত থাকা উচিত, সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক ঐকমত্য এখনো তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এ সত্ত্বেও আন্তর্জাতিকভাবে এক্ষেত্রে যেসব ভালো ব্যবহারিক উদাহরণ রয়েছে তার সঙ্গে যদি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার বিষয়ক সনদ ও কাঠামোগুলোর অন্তর্নিহিত প্রবণতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়– তা হলে, তথ্য অধিকার বিষয়ে সকলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর কিছু নীতি শনাক্ত করা দুরূহ নয়– যার উপর ভিত্তি করেই তৈরি হওয়া উচিত যে কোনো দেশের নিজস্ব তথ্য অধিকার আইন।

সর্বোচ্চ মাত্রায় তথ্য উন্মুক্তকরণ

যে কোনো তথ্য অধিকার আইনেই এটা স্বীকার করতে হবে যে, প্রত্যেক নাগরিকের অন্যতম 'মানবাধিকার' হলো তার তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার। আর সরকারের এক্ষেত্রে দায়িত্ব হলো তথ্য উন্মুক্ত করে দেয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সরকারের তথ্য উন্মুক্তকরণ নীতির স্পষ্ট অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সরকারি বিভিন্ন সংস্থার কাছে জনস্বার্থ সংশি-ষ্ট যেসব তথ্য আছে এবং আরো যেসব তথ্য জমা হবে, তা উপরোক্ত অঙ্গীকারের আলোকেই বিবেচিত হতে হবে। সরকারের 'উন্মুক্তকরণ নীতি' এমনভাবে তৈরি হতে হবে, যাতে সকল ধরনের তথ্যে মানুষের অভিগম্যতা বাড়ে। সরকারি প্রশাসনে জনগণের করের টাকায়ই তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার হচ্ছে। যদি এটা সত্য হয় যে, 'বৃহত্তর জনস্বার্থে' এ কার্যক্রমগুলো চলছে, গণতন্ত্রে স্বাভাবিকভাবেই যা হওয়ার কথা, তাহলে সরকারের সকল তৎপরতা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি হওয়া উচিত জনস্বার্থ সুরক্ষিত করা এবং জনগণকে জানতে দিতে হবে তাদেরই দেয়া অর্থে সরকারি সংস্থাগুলো কী করছে।

তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনের বিভিন্ন ধারা - উপধারায় উপরোক্ত নীতির প্রতিফলন

থাকা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ তথ্যে প্রবেশগম্যতা সকল মানুষের অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, কেবল একটি দেশের নাগরিকদের মাঝে তা সীমাবদ্ধ করে রাখা সঙ্গত নয়। একইভাবে কেবল কোনো ডকুমেন্ট বা রেকর্ডপত্রকে তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচনা না করা। জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য কোনো মডেল আকারে, পরিকল্পনা আকারে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ডাটা আকারে থাকতে পারে। সরকারি কোন গণপূর্ত কাজে কী ধরনের উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে, তার নমুনাও জনগণের জানার জন্য জরুরি তথ্য হতে পারে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সে সমস্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করতে হবে যারা জনস্বার্থ সংশি-ষ্ট কাজ করছে বা কোনোভাবে সরকারের কাছ থেকে জনগণের দেয়া অর্থ পাচ্ছে অথবা বাণিজ্যিক কার্যক্রমে সরকারি কোন বিশেষ মর্যাদা বা সুবিধা ভোগ করছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তারিত বিবরণী পুরোপুরি জনগণের কাছে উন্মুক্তকরণের জন্য বলা জরুরি, বিশেষ করে তাদের যেসব তথ্য সাধারণ নাগরিকদের মানবিক ও আইনগত অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

অন্যদিকে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের সময় এ বিবেচনাও সক্রিয় রাখতে হবে যে, তা যেন অপরাপর অধিকারের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ হয়। বিশেষ করে ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার তা যেন ক্ষুণ্ন না করে। এছাড়া বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আইনগত ব্যবসায়িক স্বার্থকেও পর্যাপ্ত সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সর্বোচ্চ মাত্রায় তথ্য উন্মুক্তকরণ নীতির আরেকটি দিক হলো, সরকার কেবল যে অনুরোধ পেলে তথ্য জানাবে তা-ই নয়; বরং নিজে থেকে জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টগুলো স্বউদ্যোগে সরকার প্রকাশ ও বিতরণ করবে। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি কোন অফিস সম্পর্কে জনগণকে জানাতে হবে যে, এই দফতরের কাঠামো ও কাজ কী, সেখানে কী কী ধরনের ডকুমেন্ট থাকছে, এর আয়-ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য, এই দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলোচনার নিয়মাবলি, জনস্বার্থ সম্পর্কিত দাফতরিক নীতি ও সিদ্ধান্তবলি– সব কিছুই নিয়মিত ভিত্তিতে প্রকাশ করতে হবে।

তথ্য অব্যাহতি ন্যূনতম মাত্রায় সীমিত রাখা

সকল ধরনের তথ্য অধিকার আইনই এটাও বলে থাকে, কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে সরকারকে কিছু বিষয় গোপন রাখতে হয় কিংবা রাষ্ট্রীয় এমন কিছু বিষয় থাকে, সরকার তার তথ্য সাধারণের কাছে পুরোপুরি উন্মোচন করে দিতে পারে না। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একদিকে তথ্যের 'সর্বোচ্চ উন্মুক্তকরণ নীতি', অন্যদিকে তথ্য প্রকাশ সীমিত রাখার এই যে ব্যতিক্রম তার ব্যবধান যেন বেশি না হয়। আইনে 'উন্মুক্তকরণ অব্যাহতি' সর্বোচ্চ মাত্রায় সীমিত রাখতে হবে এবং এ সম্পর্কিত নির্দেশনায় কোনো অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না। এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, তথ্য তখনি কেবল আইনগতভাবে সীমিত রাখা সঙ্গত, যখন তা বৃহত্তর জনস্বার্থে

জরুরি হয়ে ওঠে। আইনে এমন বিধান থাকা উচিত নয় যে, কোনো ঘটনায় সরকার বিব্রত হবে কিংবা তার অপকীর্তি উন্মোচিত হয়ে পড়বে বলে তথ্য আইনিভাবে গোপন রাখা যাবে। অনেক সময় সরকারি মহল থেকে 'জনগণের কাছে বোধগম্য হবে না' বিবেচনা করে অনেক তথ্য প্রকাশ না করার নীতি নেয়া হয়। আইনে এরকম বিধান না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এ রকম অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখেই বলা যায় যে, তথ্য উন্মুক্তকরণে যে কোনো অব্যাহতি মানেই অন্ধভাবে 'জনস্বার্থের পদদলন' মাত্র। নীতি-নির্ধারকদের সেভাবেই বিষয়টি বিবেচনায় রাখা সঙ্গত। যখন কোনো তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন সরকারি বিবেচনায় 'অব্যাহতিপ্রাপ্ত বিষয়'-এর আওতার মধ্যে পড়ে যায়, তখনো পুনর্বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, এক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশের মাধ্যমেই সর্বোচ্চ জনস্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে– না কি তথ্য গোপন রাখার মাধ্যমে তা অর্জিত হচ্ছে। অর্থাৎ 'তথ্য প্রদান থেকে অব্যাহতি'র বিষয় ন্যূনতম মাত্রায় সীমিত রাখতে হবে জনস্বার্থ মাথায় রেখেই এবং এই নীতিতে অটল থাকলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে সেরূপ অব্যাহতির অন্তর্ভুক্ত করা মোটেই সঙ্গত হবে না। যেমন– মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের তথ্যাদি বা কিছু দফতর ও বিভাগের কার্যক্রমকে তথ্য প্রকাশ থেকে অন্ধভাবে অব্যাহতি দেয়া (অনেক দেশেই প্রেসিডেন্টের দফতর, প্রতিরক্ষা বিভাগ ইত্যাদি এরূপ অব্যাহতি পেয়ে থাকে), আর্মড ফোর্সেস ও গোয়েন্দা বিভাগগুলোসহ কিছু সংস্থার সকল তথ্যই প্রকাশ অযোগ্য বিবেচনা করা সব সময় কতটা 'সর্বোচ্চ জনস্বার্থ'-এ হয়ে থাকে তা গভীরভাবে ভাবনার বিষয়।

সহজে তথ্য পাওয়ার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি

যে কোন তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতার প্রকৃত পরীক্ষা হলো জনগণ চাহিদামাফিক তথ্য কত সহজে, স্বল্প ব্যয়ে এবং কত দ্রুততার সঙ্গে পাচ্ছে তার ভিত্তিতে। কমিউনিটি পর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্য যদি পূর্বের মতো অধরাই থাকে, তাহলে তথ্য অধিকার আইন হওয়ার কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই। এক্ষেত্রেই আসে আইনের বাস্তবায়ন প্রশ্ন। অর্থাৎ তথ্য পাওয়ার প্রক্রিয়াটি যাতে সহজ ও স্পষ্ট থাকে এবং সে প্রক্রিয়া অনুযায়ী সরকারি সংস্থাগুলোর কাছ থেকে যাতে দ্রুত তথ্য সহায়তা পাওয়া যায় আইনে সে নিশ্চয়তা প্রয়োজন। তথ্য পাওয়ার আবেদনপত্রগুলো সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নিরক্ষর, প্রতিবন্ধী এবং দরিদ্র মানুষ যাতে এরূপ আইন ব্যবহারে অসমর্থ না হয়। যতদূর সম্ভব তথ্যপ্রাপ্তির জন্য কোনো ফি ধার্য করা উচিত নয়। যদি কোন ক্ষেত্রে ফি ধার্য করতেই হয়, তাহলে সেটি অতি স্বল্প হওয়াই সঙ্গত। অধিক ফি ধার্য হলে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মানুষ তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত হবে। তথ্য অধিকারের সফল অভিজ্ঞতাগুলোর আলোকে বলা যায়, ফি ধার্যের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তথ্য দিতে গিয়ে ফটোকপি বা রেকডিং ইত্যাদি প্রয়োজনে যতটুকু খরচের সম্ভাবনা, ততটুকুই যেন ফি হিসাবে নির্ধারিত হয়। তথ্য চাহিদা মেটাতে যেয়ে বা তথ্য খুঁজে পেতে কিংবা তথ্য সন্নিবেশ করতে গিয়ে

একজন বা একাধিক কর্মচারীর যে সময় ব্যয় হয়েছে তার মূল্য কোনো অবস্থাতেই আবেদনকারীর কাছে দাবি করা উচিত নয়। কারণ সরকারী সংস্থাগুলোর কাজ পরিচালিতই হচ্ছে জনগণের করের অর্থে। জনগণ প্রতিনিয়ত এসব সংস্থার পরিচালনায় বিনিয়োগ ও ব্যয় করে যাচ্ছে। সুতরাং এসব সংস্থাগুলো জনগণের সেবক হিসেবেই তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে। সহজে তথ্য পাওয়ার জন্য প্রতিটি আবেদন মীমাংসা করার প্রক্রিয়ায় আইনগতভাবেই সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া উচিত।

তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে স্বাধীন আপিল কাঠামো

তথ্য অধিকার বিষয়ে স্বতন্ত্র দেশীয় আইন থাকলে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান সেই আইন মেনে চলছে কি না তা নিশ্চিত করার বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে একটি কাঠামোগত ব্যবস্থা প্রয়োজন। কাঠামোগত এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই তথ্য অধিকার আইনের বিধি বিধান সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন একটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র, পক্ষপাতহীন সংস্থা– তথ্য প্রদানের অস্বীকৃতির বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার অধিকার থাকবে যার। এরূপ সংস্থা কর্তৃক তদন্ত শেষে যদি দেখা যায়, কোনো ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি আইনসম্মত ছিল না, অযৌক্তিকভাবেই তথ্য অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তখন সংশি-ষ্ট সংস্থাকে চাহিদামত তথ্য উন্মুক্তকরণে বাধ্য করবে ওই স্বাধীন আপিল কাঠামো।

ব্যবহারিক বিবেচনায় এরূপ স্বাধীন আপিল কাঠামোর কার্যকারিতার ক্ষেত্রে পূর্ব করণীয় হলো আইনে এমন বিধান রাখা, কোনো বিশেষ তথ্য প্রদানে বা কোনো সংস্থায় তথ্য উন্মুক্তকরণে যে কোন অস্বীকৃতি অবশ্যই লিখিত আকারে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হবে। এরূপ লিখিত অস্বীকৃতিপত্রের ভিত্তিতেই কেবল বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে একজন আপিলকারী তার আবেদন পুনর্বিবেচনার দাবি তুলতে পারেন। এ ধরনের আপিল প্রক্রিয়া অবশ্যই কম ব্যয়সাপেক্ষ এবং কম সময়সাপেক্ষ হওয়া সঙ্গত। সে জন্যই তা আদালতধর্মী হওয়া উচিত নয়। কেবল অতি অপরিহার্য ক্ষেত্রেই আপিল প্রক্রিয়াটি কোর্টধর্মী উপায়ে মীমাংসার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন আপিল সংস্থার আরেকটি ভূমিকা হবে তথ্য অধিকারের সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। যে সমস্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন লঙ্ঘন করবেন তাদের জরিমানা করা বা শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা এবং এসব কর্মকর্তার তথ্য প্রদানে দায়িত্বশীল ভূমিকার অভাবে যেসমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষমতাও থাকতে হবে ওইরূপ আপিলসংস্থার। যেসব সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারি আইন অনুযায়ী কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হবেন বা আইনের দৃষ্টিতে কোনো অযৌক্তিক ভূমিকা পালন করবেন কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো প্রমাণ নষ্ট বা ধ্বংস করবেন, তাদের এরূপ আচরণ সংশোধনের জন্য জরিমানা বা দণ্ডের ব্যবস্থা আইনে অন্তর্ভুক্ত না থাকলে

আলোচ্য তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন দুরূহ হবে এবং দুর্বল অন্যান্য রাষ্ট্রীয় আইনের পরিণতি ভোগ করবে এটিও।

প্রশিক্ষণ ও জনশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে শাসন প্রক্রিয়ায় খোলামেলা বৈশিষ্ট্য উৎসাহিতকরণ

বিশ্বের দেশে দেশে এখন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ন্যায়পাল প্রভৃতি ধাঁচের প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী এবং ক্ষমতায়িত করতে প্রতিনিয়ত অনেক আইন তৈরি হচ্ছে। স্বাধীন আপিলকাঠামো হিসেবে তথ্য কমিশনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যদি তাকে পক্ষপাতহীনভাবে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য অধিকারের বিকাশে সহায়তা করতে হয় কিংবা ভূমিকা রাখতে হয়। এরূপ সংস্থাকে সংশি-ষ্ট মানবাধিকার বিষয়ক আইন বাস্তবায়নে আচরণগত ব্যবহারিক নীতিমালা ও নির্দেশনা তৈরির ক্ষমতা দিতে হবে। পাশাপাশি তারা এরূপ আইন ও অধিকার বাস্তবায়নে অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্যও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে।

সরকার জনগণকে তার অধিকার বিষয়ে শিক্ষিত করতে এবং সেই সব অধিকারের বাস্তবায়নে কর্মকর্তা কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ দিতে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করছে কি না তার নিশ্চয়তা বিধানেও ভূমিকা রাখবে ওইরূপ সংস্থা। যেমন, তথ্য অধিকার কমিশনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব হবে এ রকম যে, তারা লক্ষ্য রাখবে‒ যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারি জনগণের তথ্য পাওয়ার আবেদন প্রক্রিয়াজাত করা ও মীমাংসার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে কি না এবং জনগণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রচার ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কি না।

তদারকির বাস্তবায়ন

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে তথ্য অধিকার বিষয়ে অগ্রসর যেসব আইন তৈরি হয়েছে তার মধ্যে আইনের বাস্তবায়ন তদারকি বিষয়ে একটি ধারা অন্তর্ভুক্ত হতেও দেখা গেছে। আইনের মধ্যে এও থাকা সঙ্গত উচিত যে, এই আইনের বাস্তবায়ন তদারকের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা উপরে যেসব তদারককারী প্রতিষ্ঠানের উলে-খ রয়েছে, সেরকম কোনো স্বাধীন সংস্থা থাকলে তারা তথ্য অধিকারের বাস্তবায়ন বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সংসদ কিংবা অনুরূপ কোথাও প্রতিবেদন পেশ করবে। আইনের বাস্ত বায়নে কী কী করা হয়েছে এবং আইনের কার্যকারিতা বিষয়ে বিশে-ষণ তৈরিতে সক্ষম অন্যান্য তথ্যও থাকবে এই প্রতিবেদনে। জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ ও টোবেগো প্রভৃতি দেশের মতো অনেক দেশেই তথ্য অধিকার আইনের আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তি তদারকির লক্ষ্যে বিশেষ ইউনিট তৈরি করেছে। এরূপ ইউনিট তথ্য অধিকার বাস্ত বায়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা, নির্দেশনা তৈরি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ

দেয়া, আইনের আওতা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিশে-ষণ প্রচার করা, সংস্কার সম্পর্কিত সুপারিশ তৈরি এবং জনশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য গ্রন্থাদি প্রস্তুতির কাজ করবে। এরূপ উদ্যোগের অংশ হিসেবেই ক্যাইমান দ্বীপপুঞ্জের সরকার সম্প্রতি তথ্য অধিকার বিষয়ক আইন পার্লামেন্টে অনুমোদনের আগেই সেখানে তথ্য স্বাধীনতা তদারকির জন্য একজন সমন্বয়ক নিয়োগ করেছে।[২২]

তদারকি বাস্তবায়নের গুরুত্ব

যদি কোনো দেশে তথ্য অধিকার আইন থাকে এবং সবাই যদি তা উপরে উলি-খিত উত্তম নীতিমালার আলোকে মেনে চলে তাহলেও সরকারকে এই আইনের পূর্ণ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারে আবদ্ধ রাখতে এবং এ সম্পর্কিত সরকারি প্রশাসনিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে কমিউনিটির বিরাট দায়িত্ব রয়েছে।

প্রকৃতগতভাবেই তথ্য অধিকার সরকারের কাজে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসে। অনেক দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সরকারের ক্ষমতা ও জ্ঞানগত সম্পদে জনগণের অংশীদারিত্ব বাড়ার মাধ্যমে সমাজে ব্যাপক ভারসাম্য তৈরি করছে এই বিধান। এই প্রবণতার কারণে অনেক স্থানেই এরূপ আইন তৈরি এবং তার বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ কারণে সরকার যাতে শাসন প্রক্রিয়ায় খোলামেলা ভঙ্গী বজায় রাখে, স্বচ্ছতা ও জবাবাদিহিতার নীতি অনুসরণ করে, সে জন্য কমিউনিটির তরফ থেকে প্রতিনিয়ত দাবি জারি রাখা খুবই অপরিহার্য, অর্থাৎ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে কমিউনিটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সমাজে এমনও দেখা গেছে, এরূপ যে একটি আইন রয়েছে নাগরিক সমাজ সে বিষয়েই অবহিত নয়। উদাহরণস্বরূপ সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনেডা দ্বীপপুঞ্জের কথা বলা যায়, যেখানে ২০০৩ সালে তথ্য স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আইন কার্যকর হয়েছে। কিন্তু এই আইনের ফলে জনগণের অধিকারগত কী লাভালাভ, সে সম্পর্কে তাদের শিক্ষিত করা হয়েছে খুবই কম। এন্টিগুয়া এবং বারবাডোস ২০০৪ সালে তথ্য স্বাধীনতা বিষয়ক আইন তৈরি করেছে।[২৩] কিন্তু সেখানে তথ্য কমিশনার নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে সরকার খুবই ধীরে চলো নীতিতে অগ্রসর হচ্ছে। আইন তৈরির ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে সেই আইনের সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে সাফল্য নির্ভর করে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সংগ্রামে কমিউনিটির অংশগ্রহণ কতটা নিবিড় ও দীর্ঘস্থায়ী, তার ওপর। 'ওপেন সোসাইটি জাস্টিস ইনিশিয়েটিভ'-এর অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছিল যে,

> জাতীয় তথ্য অধিকার বা তথ্যের অবাধ প্রবাহ বিষয়ক আইনের আওতায় তথ্য পাওয়ার আবেদনের প্রতি সেসব দেশেই সবচেয়ে বেশি সাড়া মিলছে যেখানে নাগরিক সমাজ এরূপ আইন বাস্তবায়নের দাবিতে এবং আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরবর্তী সহায়ক নীতিমালা তৈরির দাবিতে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। এরূপ দেশের মধ্যে রয়েছে আর্মেনিয়া, বুলগেরিয়া, মেক্সিকো,

পেরু এবং রুমানিয়া। এসব দেশে বেসরকারি সংগঠনগুলো বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের কাছে থাকা তথ্য চেয়ে অসংখ্য আবেদন করেছে এবং যখন কোথাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তখনি তথ্য পাওয়ার আবেদন পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল করেছে। পাশাপাশি তারা এসব বিষয়ে গণমাধ্যমভিত্তিক ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বিশেষ করে দুর্নীতি ও গভর্ননেন্স সংক্রান্ত ইস্যুগুলোতে তথ্য পাওয়ার জন্য দাখিল করা আবেদনগুলো যাতে মিডিয়ার মনোযোগে থাকে, সেজন্য খুবই তৎপর এসব দেশের নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি সংগঠনগুলো।'[২৪]

বলা বাহুল্য, তথ্য অধিকার আইনের যথার্থ কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারি তরফ থেকে আন্তরিক অঙ্গীকার প্রয়োজন। এই অঙ্গীকার তখনি বাস্তব রূপ পায় যদি সমাজে জনগণের তরফ থেকে এ বিষয়ে সক্রিয় চাপ থাকে।

তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা রক্ষায় নজরদারি ব্যবস্থা

ইতিমধ্যে উলে-খ করা হয়েছে যে, তথ্যে নাগরিক সমাজের অভিগম্যতা বাড়াতে কোনো দেশে শক্তিশালী আইন থাকার পরও তার কার্যকারিতা লোপ পেতে পারে, যদি এ বিষয়ে নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম তার প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন না করে। তবে এই ভূমিকায় একদিকে যেমন অতিরিক্ত জোর দেয়া যাবে না, তেমনি আবার দিনে দিনে এই ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণও হয়ে উঠছে। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটেনের কথাই ধরা যাক। সেখানে যথেষ্ট প্রচার ছাড়াই ২০০৭ সালে সরকার পার্লামেন্টে তথ্য স্বাধীনতা বিষয়ক আইনের একটি সংশোধনী অনুমোদনের চেষ্টা চালায়।[২৫] এই সংশোধনীর মূল বিষয় ছিল পার্লামেন্ট সদস্যদের কাছে থাকা কিছু তথ্যে জনগণের জানার অধিকার থাকবে না। যদি তখন সাংবাদিক ও নাগরিক অধিকার আন্দোলন কর্মীদের তরফ থেকে তাৎক্ষণিক যথেষ্ট প্রতিবাদ না হতো তাহলে সংশোধনীটি পাস হয়ে যেত এবং সেক্ষেত্রে মাত্র দু'বছর আগে কার্যকর হওয়া সেখানকার তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হতো।

অধ্যায় চারঃ

আমাদের তথ্য আমাদের অধিকার
নানান দেশের নানান অঞ্চলের অভিজ্ঞতা

শিশু অধিকার

উন্মুক্ত তথ্যের চাপে শিশুসেবার মানোন্নয়নে বাধ্য হলো জ্যামাইকা সরকার

জ্যামাইকায় দারিদ্র্যের মাঝে বসবাসকারী শিশু ও তরুণ জনসংখ্যার হার অনুরূপ অবস্থার শিকার বিশ্বের অপরাপর দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর (সমগ্র জনসংখ্যার ১৪.৮%) প্রায় অর্ধেকই এ দেশে ১৯ বছরের কম বয়সী।[১] জনসংখ্যা বিষয়ক এ সকল তথ্য-উপাত্ত উদ্ঘাটনের ফলে সে দেশের সরকার অনেকটা বাধ্য হয়েই শিশুসেবা ও নিরাপত্তার জন্য বেশ কিছু শিশু সদন চালু করে। জ্যামাইকার অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, রাষ্ট্র পরিচালিত শিশু সদন দুর্দশাগ্রস্ত এ বাচ্চাদের যথাযথ নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত গার্ডিয়ান (অভিভাবক)দের হাতে এরা অনেকেই অবহেলিত, অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়।

জ্যামাইকা সরকার ২০০২ সালে তথ্য অধিকার আইন পাস করে।[২] এই আইনের (ATI Act) বলে সে দেশের নাগরিকদের পক্ষে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিশু সদনগুলোতে শিশুদের হাল হকিকত সংক্রান্ত তথ্য জানা ও সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠন তথ্য বিনিময়ের আনুষ্ঠানিক দাবি জানিয়ে শিশু বিকাশ কেন্দ্রের (সিডিএ) মতো সরকারি তদারকি সংস্থা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দেনদরবার শুরু করলো। একই ধারাবাহিকতায় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের একটি জোট প্রতি মাসেই সদনগুলোর অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট দাবি করে। এতে যে সকল তথ্য জানতে চাওয়া হয়, তার মধ্যে উলে-খযোগ্য হলো– সদন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিতদের আচরণবিধি, তাদের প্রশিক্ষণের রেকর্ড এবং সদনের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব। তাদের এ দাবির মূল লক্ষ্য ছিল সদনগুলোর সঠিক তথ্য এবং সেই সাথে সেখানকার জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা। এই উদ্যোগের সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে 'জ্যামাইকান ফর জাস্টিস' (জেএফজে) নামে একটি বেসরকারি সংগঠন। দেশের তথ্য অধিকার আইনের আওতায় সরকারের কাছে যারা তথ্যের আবেদন করছে তাদের সাহায্য করা এবং সেসব আবেদনের পরিণতি তদারক করার জন্য নিজেদের কার্যালয়ে তারা একটি হেলপ ডেস্ক বা সহায়তা কেন্দ্রও চালু করে।[৩]

তথ্য অধিকার আইন-এর আওতায় তথ্য সরবরাহে শিশু বিকাশ কেন্দ্রগুলোর বাধ্যবাধকতা ছিল। আর তা কাজে লাগিয়ে জেএফজে তাদের তথ্য সংগ্রহের অভিযান শুরু করে। সংগৃহীত এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এরপর তারা প্রকাশ করে 'জ্যামাইকা সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকা শিশুদের অবস্থা' শীর্ষক প্রতিবেদন।[৪] সদনগুলোর মানবেতর জীবন আর ভয়াবহতার এক দলিল ছিল ওই প্রতিবেদনটি। এতে উলে-খ করা হয়, মানসিক ও আচরণগত সমস্যার শিকার শিশুদের কেউ কেউ আত্মহত্যারও

চেষ্টা করে। স্বাভাবিক শিশুদের বেলায় শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের ঘটনার কথাও এতে বেরিয়ে আসে। শুধু তা-ই নয়, সদনগুলোর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নোংরা ও মলিন বিছানাপত্র এবং ময়লা-আবর্জনা নিষ্কাশনের অব্যবস্থাপনার চিত্র, এমনকি সেখানে বসবাসকারী শিশুদের নাম ও রেকর্ড সংক্রান্ত সঠিক লগবই ব্যবহারে ধারাবাহিক ব্যর্থতার নজিরও বেরিয়ে আসে রিপোর্টে।

নাগরিক সমাজের রিপোর্টের ভিত্তিতে জনমনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তারই তীব্র চাপের মুখে সরকার অনেকটা বাধ্য হয়েই শিশু সদনগুলোর অবস্থা উন্নয়নে উদ্যোগী হয়। এরই সূচনা হিসেবে সরকার সদনগুলোর অবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করায় এবং তার ভিত্তিতেই তৈরি হয় 'দ্য কিটিং রিপোর্ট: এ রিভিউ অব চিলড্রেন হোমস্ অ্যান্ড পে-সেস অব সেফটি ইন জ্যামাইকা' শীর্ষক প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটি জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয় ২০০৪ সালে। যে সকল বিষয় জেএফজে অনুসন্ধানে প্রাধান্য দেয়া হয়, তার সবই কিটিং রিপোর্টে সরকারিভাবে মেনে নেয়া হয়। সদনের শিশুদের যৌন ও অন্যান্য নির্যাতনের কাহিনী এবং অবহেলা আর অবজ্ঞার কারণে কারো কারো আত্মহত্যার প্রচেষ্টার কথাও স্বীকার করে নেয়া হয় সরকারি রিপোর্টে।[৫] এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সদনে নির্যাতনের জন্য রিপোর্টটিতে সরাসরি জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় সরকারকে এবং সেই সাথে শিশুদের প্রতি তাদের যত্ন ও দায়িত্বের কথাও পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।[৬] সদন ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের মাধ্যমে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ, সেগুলো পরিদর্শনের সুব্যবস্থা, শিশুদের রেকর্ড বইয়ের অসামঞ্জস্যতা দূর করা, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নিশ্চিত করা এবং হেলপলাইনগুলো পুনঃসংযোগের সুপারিশ করে প্রতিবেদনটি।

অক্টোবর ২০০৬-এ জেএফজে তাদের আগের প্রতিবেদন ইন্টার-আমেরিকান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটস্ (আইএসিএইচআর)-এ পেশ করে। এতে জ্যামাইকার সরকারের টনক নড়ে। সে বছরই নভেম্বরে কর্তৃপক্ষ 'অফিস অব দ্য চিলড্রেন অ্যাডভোকেট' (ওসিএ) এর সঙ্গে বৈঠকে বসে। শিশু অধিকার নিশ্চিত করার ম্যান্ডেট রয়েছে চিলড্রেন এডভোকেট (ওসিএ) সংস্থাটির ওপর। শুধু তা-ই নয়, শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ সংরক্ষণে সরকারের অগ্রগণ্য ভূমিকা নিশ্চিত করাও এরই আওতাধীন। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সদনগুলোতে শিশু অধিকার লঙ্ঘনের মারাত্মক অভিযোগগুলোর তদন্তে নিয়োজিত ছিল চিলড্রেন অ্যাডভোকেট। নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গে তাদের বৈঠকে এই তদন্ত প্রক্রিয়া পরিবর্তনের আলোচনা হয়। বৈঠকের ফলে জেএফজে এবং চিলড্রেন এডভোকেট-এর মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তির সিদ্ধান্ত হয়। এরই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান দুটির ভেতর চিঠিপত্র আদান-প্রদান এবং যোগাযোগের রাস্তা উন্মুক্ত হয়।[৭]

এ ঘটনা থেকে এটাই ফুটে ওঠে যে, তথ্য অধিকার আইন কীভাবে অনেক দেশে শিশু সদন, প্রবীণনিবাস, কারাগার, অপরাধ সংশোধন কেন্দ্র প্রভৃতি ধরনের অস্বচ্ছ

প্রতিষ্ঠানের তথ্যাদি উন্মোচন করে তাদের জনগণের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। তথ্য অধিকার আইনের সুবাদে জ্যামাইকায় সরকারি নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন, আইন-কানুন মেনে চলায় অব্যাহত অসম্মতি ও উপেক্ষার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রকারের যে নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া হতো তার চিত্র বেরিয়ে পড়ে। তাছাড়া সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু তদারকির অভাবের বিষয়ও পরিলক্ষিত হয়। জ্যামাইকার শিশু সদনগুলোর দুরবস্থা উদ্ঘাটনে জেএফজেসহ অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান এটিআই অ্যাক্টকে মূল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এই আইন না থাকলে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে শিশুদের দুরবস্থার খবর জনগণের অগোচরে থাকত, অজানা থাকত। শুধু তা-ই নয়, সকলের অলক্ষ্যে এই শিশুদের উপর নির্যাতন চলতে থাকতো আরো অনেক বছর ধরে।[৮] বেসরকারি জোটবদ্ধ এই উদ্যোগ থেকে এটাও প্রতীয়মান হয়, কেমন করে অনেক সংগঠন একই সঙ্গে একই লক্ষ্যে কাজ করে যথেষ্ট সময় নিয়ে প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যুৎসই হস্তক্ষেপ ও ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে মৌলিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, তাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং বিশে-ষণ জনসম্মুখে তুলে ধরার ফলে সরকার সাড়া দিতে বাধ্য হয়, পদ্ধতিগত উন্নয়ন ঘটে তার কাজে এবং উন্মুক্ত হয় পরিবর্তনের দুয়ার।

জ্যামাইকার তথ্য অধিকার আইন ২০০২

জ্যামাইকার তথ্য অধিকার আইন তৈরি হয় ২০০২ সালে।[৯] তবে তা ধাপে ধাপে কার্যকর হয় জানুয়ারি ২০০৪ থেকে।[১০] সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তথ্য প্রদান ছিল বাধ্যতামূলক। সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এমনকি যে সকল প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ সরকারি মালিকানা রয়েছে তাদের সকলের দলিল-দস্তাবেজে এই আইনবলে সাধারণভাবে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়– গভর্ণর জেনারেল, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো, আদালতের বিচারিক কার্যাবলি এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের ডিক্রিবলে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে।

আইনটির বাস্তবায়ন তদারকির জন্য একটি তথ্য অধিকার ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই আইনের কোন্ কোন্ বিধান কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সে সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তথ্য অধিকার ইউনিট সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের জন্য প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আইনটি কার্যকর হওয়ার দু'বছরের মাথায় পার্লামেন্টে তা আবশ্যিকভাবে পুনর্মূল্যায়নের কথা থাকলেও প্রক্রিয়াটির এখনো সমাপ্তি ঘটেনি।

শিশু অধিকার

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিগুলোর আওতায় পূর্ণবয়স্ক প্রত্যেক মানুষের মতো শিশুদেরও স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। যেহেতু শিশুরা তাদের প্রয়োজন, চাহিদা এবং সেবার জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের ওপর নির্ভরশীল এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণে অপারগ, তাই শিশুদের এই বিশেষত্বের ভিত্তিতে জাতিসঙ্ঘ বিশেষ নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে তাদের অনন্য অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে, যা শুধু তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এরই ফলে 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন দ্য রাইটস্ অব চাইল্ড (সিআরসি)' কেন্দ্রিক অগ্রগতি সাধিত হয় এবং ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ সালে এই সনদ কার্যকারিতা লাভ করে।[১১]

সিআরসি হচ্ছে প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি যা জাতিসঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক এবং এতে শিশুর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে বিশদ পর্যালোচনার ভিত্তিতে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ক হাতিয়ারগুলোর মধ্যে এটিই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক দেশে গৃহীত হয়েছে। অনেক দেশই এর বিধানাবলি মেনে নিতে রাজি হয়েছে, যা অন্য অনেক মানবাধিকার আইনের ক্ষেত্রেই ঘটেনি। কনভেনশনে সন্নিবেশিত অধিকারগুলো এই পূর্ব ধারণার উপর ভিত্তি করে স্বীকৃত যে, সকল শিশু ক্ষুধা, অবহেলা ও নির্যাতন থেকে মুক্ত জীবনের অধিকারী। শুধু তা-ই নয়, তাদের অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে রাষ্ট্র বা শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ন্যস্ত কারো হাতে সে যেন ক্ষুধা, চাহিদা, অবহেলা বা নির্যাতনের শিকার না হয়– এ কথাও যথাযথভাবে বলা হয়েছে সনদে। এ সকল অধিকার এ কারণেই নিশ্চিত করা হয়েছে, যেন শিশুরা পূর্ণ সম্ভাবনা নিয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।

চারটি মূলনীতির ওপর সিআরসি'র ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে। তা হলো শিশুদের মাঝে বৈষম্য না করা, শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষায় আত্মনিয়োগ, জীবনের অধিকার, বেঁচে থাকা এবং উন্নয়নের অধিকার, সেই সাথে বিশেষভাবে তার মতামতের মর্যাদা ও স্বীকৃতি।[১২] শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং নাগরিক ও সামাজিক অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানসহ তা নিশ্চিত করা সনদের আওতায় রাষ্ট্রপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক। সশস্ত্র সংগ্রামে[১৩] জড়িয়ে থাকা এলাকাগুলোর শিশুদের বাড়তি সুরক্ষার জন্য সিআরসিতে দুটি প্রটোকল রয়েছে। এতে শিশুদের কেনাবেচা, যৌনকাজে ব্যবহার এবং পর্নোগ্রাফিতে অংশগ্রহণের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে।[১৪] যে সকল দেশ অতিরিক্ত প্রটোকল দুটোকে স্বীকৃতি দিয়েছে সে দেশগুলোর জন্য শিশু অধিকার সংশি-ষ্ট বিষয়াদি স্বাধীনভাবে তদারকির জন্য কনভেনশনের আওতায় স্বাধীন সংস্থা 'শিশু অধিকার কমিটি' গঠন করার বিধান রয়েছে। সেখানে সউদ্যোগে শিশু অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থা রয়েছে।

১৯৯১ সালের জুনে জ্যামাইকা কনভেনশনটি অনুসমর্থন করে। তারা অতিরিক্ত প্রটোকল দুটিতেও পক্ষ হয়।

ক্রেতা ও ভোক্তার অধিকার

কর্নগেট কেলেঙ্কারি

পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নিজ নিজ দেশের নাগরিকদের লাভবান করতে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের যৌথভাবে কাজের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এ ধরনের যৌথ উদ্যোগের একটি আলোচিত নজির ছিল উভয় দেশে ব্যবহৃত খাদ্যের মান বিষয়ে। দুটি দেশ এ বিষয়ে একটি একক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে তা সুরক্ষার জন্য একটি সংস্থাও গড়ে তোলে, যার নাম ছিল 'ফুড স্ট্যান্ডার্ড অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড' (এফএসএএনজেড)। সংস্থাটি ছিল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে বাজারজাত করার জন্য তৈরি খাদ্য মান যাচাই বিষয়ে একটি রেগুলেটারি প্রতিষ্ঠানের মতো। এই প্রতিষ্ঠানের আইনগত ভিত্তি দেয়া হয় 'ফুড স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্ট অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড'-এর মাধ্যমে।[১৫] সাধারণভাবে বাজারজাত করার সময় খাদ্যসামগ্রী সম্বন্ধে কী কী তথ্য প্রদান করা হবে সেই নির্দেশনা দেয়ার এখতিয়ারও ছিল প্রতিষ্ঠানটির আওতাধীন।

বিটি-১০ প্রজাতির এক লাখ ৬৫ হাজার টন জেনেটিক্যালি উদ্ভাবিত ভুট্টা, যা শুধু পশুখাদ্য হিসাবে মনোনীত, ভুলবশত মানব খাদ্য হিসেবে উপযুক্ততার লেবেল লাগিয়ে, ২০০১-০৪ সালে বিশ্বব্যাপী বিতরণ করা হয়।[১৬] এক পর্যায়ে ফ্রিল্যান্স স্বাধীন গবেষকরা সউদ্যোগে আবিষ্কার করলেন, পশুখাদ্য হিসেবে মনোনীত ভুট্টাই মানবখাদ্য হিসেবে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। তখন অনেক সরকার এবং অনেক দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এই ভুট্টার আমদানি নিষিদ্ধ করে। শুধু তা-ই নয়, জনগণকে এর ক্ষতিকর দিকগুলো চিহ্নিত করে তা পরিহার করার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে এফএসএএনজে-এর আচরণ ছিল ভিন্ন, তারা এ বিষয়ক তথ্য অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডবাসীর কাছে চেপে যায়।

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড উভয় দেশে তথ্য অধিকার আইন রয়েছে। নিউজিল্যান্ডের ক্রেতা-ভোক্তারা তখন সে দেশের তথ্য অধিকার আইন (অফিসিয়াল ইনফরম্যাশন অ্যাক্ট ১৯৮২)[১৭]-এর আওতায় জানতে চাইলো তারা যে ভুট্টা ক্রয় করছিলেন, সেটি 'বিটি-১০' প্রজাতির কি না। এফএসএএনজে যেহেতু অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত, তারা 'টেকনিক্যাল সমস্যা'র[১৮] কথা বলে ভিন্ন দেশের মানুষকে তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি প্রদান করল। তখন অস্ট্রেলিয়ার তথ্য স্বাধীনতা আইন ১৯৮২[১৯]-এর আওতায় বিদ্যমান কাঠামোর মাধ্যমে নিউজিল্যান্ডের ক্রেতাদের তথ্য সংগ্রহের অনুরোধ জানানো হয়। সেই অনুসারে নিউজিল্যান্ডের ক্রেতা সমাজ ও ক্রেতাদের সংগঠনগুলো নতুন করে তথ্য

পাওয়ার আবেদন করে। কিন্তু তখনো তারা এই মর্মে প্রত্যাখ্যাত হন যে, 'আবেদনকারীরা অস্ট্রেলিয়ার কোনো ঠিকানা ব্যবহার করেননি', যা দেশটির আইন অনুযায়ী অপরিহার্য।[২০]

খুব স্বাভাবিকভাবেই অস্ট্রেলিয়ার প্রতিক্রিয়ায় নিউজিল্যান্ডের ক্রেতারা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কৃত্রিম উপায়ে জেনেটিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে চারিদিকে যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে এ থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, খাদ্যসামগ্রীর মান ও গুণাগুণ জেনে পছন্দ করার জন্য তথ্য অধিকারের নিশ্চয়তা আবশ্যক। এ সময় তারা দেশটির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে জেনেটিক প্রক্রিয়াজাত ভুট্টা ও আমদানিকৃত অন্য খাদ্যসামগ্রী সম্বন্ধে আরো তথ্য প্রদানের নিশ্চয়তা দাবি করে। এই প্রচার অভিযান এমন গণঅসন্তোষ সৃষ্টি করে যে, সে দেশের প্রচার মাধ্যমে এটিকে 'কর্নগেট' (Corngate) কেলেঙ্কারি নামে আখ্যায়িত করে।[২১]

এ সময় নিউজিল্যান্ড সররকার জনগণের সঙ্গে কোনো পরামর্শ বা পার্লামেন্টে কোনো বিতর্ক ছাড়াই 'কান্ট্রি অব অরিজিন' লেবেলের মানদণ্ড বিষয়ক অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের যৌথ প্রস্তাবনায় ভিটো প্রদান বা আপত্তি উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।[২২] কেবিনেটের এ সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত নথি তথ্য অধিকার আইনে দেশটির গ্রিন পার্টি বের করে নেয়। সাধারণত 'কান্ট্রি অব অরিজিন' লেবেল থেকেই ক্রেতারা খাদ্যসামগ্রীর উৎস সম্বন্ধে ধারণা পেয়ে থাকেন। কোনো কোনো দেশ লেবেল ছাড়াই জেনেটিক পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত সব্জি, প্রক্রিয়াজাত ফল ইত্যাদি রফতানি করে থাকে। 'কান্ট্রি অব অরিজিন' লেবেল লাগানো থাকলেই কেবল ক্রেতারা জানতে পারেন কোনো সামগ্রী জেনেটিক পদ্ধতিতে তৈরি। কেবিনেট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে শুধু অস্ট্রেলিয়ার ক্রেতারাই তাদের খাদ্যসামগ্রীর উৎস জানতে পারবেন, নিউজিল্যান্ডবাসী রয়ে যাবে অন্ধকারে।

খাদ্য সামগ্রীতে অপর্যাপ্ত তথ্যের অভিযোগে যে হাজারো নাগরিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছিলেন, তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এ সময় গ্রিণ পার্টি খাদ্য তথ্যের জন্য একটি ক্রেতা অধিকার বিল (Consummer Right to know, Food Information Bill) প্রস্তাব করে ২০০৬ সালের জুনে। ক্রেতারা যখন কোনো পণ্য ক্রয় করবেন, তখন যাতে যথেষ্ট তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতেই তারা পণ্য বাছাই করতে পারেন, সে লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বিলে জেনেটিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত খাদ্যসামগ্রীতে লেবেল লাগানো বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়। গ্রিন পার্টি নিউজিল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে ছোট বিরোধী দল। সরকার পক্ষের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার কারণে প্রথম যাত্রায় বিলটি নাকচ হয়ে যায়।[২৩] তবে সরকার কর্তৃক বিলের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তারই ফলে শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ড সরকার স্ব-উদ্যোগে আমদানিকৃত খাদ্য সামগ্রীর গায়ে 'কান্ট্রি অব অরিজিন'-এর বিস্তারিত বিবরণ সম্পন্ন লেবেল থাকার বিষয়ে নির্দেশনা জারি করে।[২৪]

অনেক বছর ধরে তথ্য পাওয়ার মতো আইন বলবৎ থাকলেও জনস্বার্থে জানা জরুরি এমন অনেক তথ্যই জানা যায়নি আমলাতন্ত্রের ধারাবাহিক অস্বীকৃতির কারণে। যেসব তথ্য তাদের জন্য অস্বস্তিকর এবং বিড়ম্বনা বয়ে আনবে, স্পর্শকাতর সেসব তথ্যের ক্ষেত্রেই এই অস্বীকৃতির ঘটনা বেশি ঘটেছে। তবে অন্যায্য বা অবৈধভাবে কোনো বিশেষ স্বার্থে তথ্যপ্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে বলে জনমনে ধারণা সৃষ্টি হলে তারা নিজেরাই এর বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য সোচ্চার হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে গণপ্রচারণা অনেক সময়ই প্রতিরোধের জন্ম দেয়, প্রাথমিকভাবে তার চাপ ভবিষ্যতে স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কর্নগেট কেলেঙ্কারি অসম্পূর্ণ লেবেলের খাদ্যসামগ্রীর ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করে। চাপের মুখে সরকার এ কথা মেনে নিতে বাধ্য হয় যে, জনগণ 'শুধু বিশ্বাস'-এর উপর নির্ভর করে *খাদ্যসামগ্রী নিরাপদ* এ কথা মেনে নিতে আর রাজি নয়। স্বাধীনভাবে খাদ্য সামগ্রী বাছাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়ার অধিকার জনগণের রয়েছে।

নিউজিল্যান্ড : তথ্য অধিকার আইন ১৯৮২

নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্ট ১৯৮২ সালে তথ্য অধিকার আইন পাস করে।[২৫] এই আইন পাস করার উদ্দেশ্য ছিল: "যাতে সরকারি তথ্য আরো সহজলভ্য হয়, সরকারের জিম্মায় থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ স্বার্থ সংশি-ষ্ট তথ্যপ্রাপ্তির উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি হয়; জনস্বার্থে সরকারি তথ্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধান করা যায়; উপরন্তু ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান এবং উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনে একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়া গড়ে তোলা যায়।"[২৬] ১৯৫১ সালের সরকারি গোপনীয়তা আইন নতুন তথ্য অধিকার আইনের অধীনে বাতিল ঘোষিত হয়। পাশাপাশি নতুন আইনের আওতাধীন বিষয়গুলো তদারকির জন্য ন্যায়পালের পদও সৃষ্টি করা হয়।

আইনটির পরিধি বেশ বিস্তৃত ছিল। এই আইনের ফলে সরকারি অবস্থানের কারণে মন্ত্রীর গোচরীভূত কোনো বিষয়, সরকারি অধিদফতর, পরিদফতর সংক্রান্ত– এমনকি মন্ত্রণালয়, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, গোয়েন্দা নিরাপত্তা সংস্থা এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে থাকা তথ্যের ওপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্থানীয় সরকারগুলোর ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয় আলাদা একটি আইনে– যার নাম 'স্থানীয় সরকার : প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য ও বৈঠক আইন, ১৯৮৭।'[২৭]

বেশ কয়েক বছর ধরে আইনটি চালু আছে। এরই মধ্যে কয়েক দফা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আইনটি আরো যুগোপযোগী করার জন্য সরকারের কাছে বেশ কিছু সুপারিশ পাঠানো হয়।[২৮] কয়েকটি সুপারিশ ইতিমধ্যে আইনে সংযোজিতও হয়েছে।

ক্রেতা ও ভোক্তার অধিকার

মানুষ মাত্রই ক্রেতা, পণ্যের বা সেবার । প্রত্যেকেরই দরকার রয়েছে খাবার কেনার ও স্বাস্থ্যসেবার; উৎপাদিত বা প্রচলিত পণ্যসামগ্রী, যেমন– কাপড়-চোপড়, গাড়ি, ফার্নিচার, শেয়ার অথবা নিত্যব্যবহার্য সেবা– বিদ্যুৎ, পানি, যাতায়াত ও যোগাযোগ সুবিধাগুলো সবারই প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের সামগ্রী ও সেবার গুরুত্ব চিন্তা করে এবং সাধারণ মানুষের যেন এ সকল সুবিধা পেতে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার হতে না হয়, তার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য এসব ক্ষেত্রে ক্রেতা ও ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় জাতিসঙ্ঘ কিছু নির্দেশনাও ঘোষণা করেছে।[২৯]

এই নির্দেশনায় ক্রেতা ও ভোক্তার শারীরিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার গুরুত্ব ও নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। ক্রেতা-স্বার্থ রক্ষায় পণ্য ও সেবার মান সংক্রান্ত তথ্য জানার বিষয়েও ওই নির্দেশনায় পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন রয়েছে। তার অনুচ্ছেদ ৩১ অনুসারে, "স্থানীয় লোকজনের ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে সরকারের উচিত স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অথবা কোনো মাধ্যমে ক্রেতা সচেতনতা সৃষ্টিতে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ। এ ধরনের কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ক্রেতারা যেন পণ্যের পার্থক্য নিরূপনে সমর্থ্য হয়, পণ্য ও সেবা বেছে নেয়ার সক্ষমতা অর্জন করে। সেই সাথে সজাগ থাকে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে। এ ধরনের কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত দুর্বল ক্রেতাদের, যারা শহর-গ্রাম উভয় স্থানেই থাকতে পারেন। এক্ষেত্রে বিশেষ সুরক্ষা প্রয়োজন অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর স্বল্প আয়ের ক্রেতাদের।"[৩০]

শিক্ষার অধিকার

স্কুলের ভর্তি কেলেঙ্কারি যেভাবে থাইল্যান্ডের শিশুদের বিচার প্রার্থনার পথ উন্মুক্ত করলো

১৯৯৮ সালের শুরুর দিকে নাথ্থানিত নামে এক থাই মেয়েশিশু সরকার নিয়ন্ত্রিত 'Katsetsart Demonstration School' নামের নামকরা প্রাইমারি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। স্বনামধন্য এ স্কুলটিতে ভর্তি হওয়ার আশায় মেয়েটি দীর্ঘ দুই বছর কঠিন মেহনতও করে। নাথ্থানিতকে জানানো হলো সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তাই তাকে স্কুলে ভর্তি করা যাবে না। মেয়েটির মা স্কুলের রেক্টরের সঙ্গে দেখা করে মেয়েটির পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখতে চাইলে রেক্টর তাতে অস্বীকৃতি জানান।[৩১]

এরপর থাইল্যান্ডের তথ্য অধিকার আইনের[৩২] আওতায় নাথ্থানিত-এর মা সুমালী লিম্পা-ওমার্ট মেয়ের উত্তরপত্র এবং পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর জানানোর আবেদন করেন। ১৯৯৮ সালের নভেম্বরে সরকারি তথ্য কমিশন এক আদেশে নাথ্থানিত-এর উত্তরপত্র এবং সেসহ ভর্তির সুযোগ পাওয়া ১২০ জন শিক্ষার্থীরই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর প্রকাশের আনুষ্ঠানিক হুকুম জারি করেন। আদেশে বলা হয় 'Katsetsart Demonstration School'-এর ওই তথ্যগুলো সর্বজনীন এবং তা তারা জানাতে বাধ্য। কিন্তু যে সকল শিক্ষার্থী স্কুলটিতে ভর্তির সুযোগ পেল তাদের বাবা-মা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই তথ্য প্রদানে বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করলেন এই অজুহাতে যে, এসব নেহাত ব্যক্তিগত তথ্য, যা সবার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে না। ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ১০৯ জনের অভিভাবক এক পর্যায়ে একজোট হয়ে নাথ্থানিত-এর মায়ের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন করার দায়ে আদালতে নালিশ জানান। সুমালী ছিলেন রাষ্ট্রীয় পাবলিক প্রসিকিউটর।[৩৩] আদালতের আর্জিতে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগও তোলা হয়। পরবর্তীকালে নাথ্থানিত-এর মায়ের পক্ষে আদালতের আদেশ সত্ত্বেও স্কুল কর্তৃপক্ষ অব্যাহতভাবে তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানাতে থাকে। তারা যুক্তি দেখায়, পরীক্ষার ফল সবার জন্য উন্মুক্ত করার প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য তাদের কাউন্সিল অব স্টেইট, অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস ও বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আরো আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের ভাষায়– ভবিষ্যতেও এ রকম অনুরোধ ও আবেদন আসতে পারে বিধায় পূর্বাহ্নে এর প্রক্রিয়াটি অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।[৩৪]

মেয়ের পরীক্ষার নম্বর জানার অধিকার সংক্রান্ত আইনগত লড়াইয়ের মাঝপথে স্কুল কর্তৃপক্ষ নাথ্থানিত-এর মাকে সমঝোতার প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবে বলা হয়, তিনি ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের শিট দেখতে পারেন; তবে তাতে তার মেয়ে ছাড়া অন্যদের নাম

মুছে রাখা হবে। বাস্তবে দেখা গেল, তালিকা অনুসারে স্কুলে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের এক তৃতীয়াংশই ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল।[৩৫] নাথ্থানিত-এর মায়ের সন্দেহ হলো স্কুলটিতে বোধহয় এ দফাই কেবল এমনটি ঘটেনি। হয়তো এখানে এটা হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এই স্কুলে ভর্তিকে কেন্দ্র করে দুর্নীতি এবং ঘুষের অভিযোগ সংক্রান্ত মুখরোচক গল্প আর কানাঘুষা ছিল সর্বত্রই। যে শিশুদের পিতা-মাতারা সমাজে উচ্চপদে আসিন তথা যারা সমাজের এলিট শ্রেণীভুক্ত তারাই উপরোক্ত অনৈতিক সুযোগগুলো গ্রহণ করছিলেন।[৩৬] অভিযোগ ছিল, যে সকল শিশু ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর পেতে পারেনি তাদের ভর্তির ব্যাপারে পিতা-মাতারা প্রায়ই 'চা খাওয়ার টাকা' দেয়ার নাম করে ঘুষ দেয়া থেকে শুরু করে প্রভাব বিস্তারে সামাজিক পদমর্যাদাকেও নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন।[৩৭]

অনিয়মের বাস্তব ইঙ্গিত পেয়ে নাথ্থানিত-এর মা পরবর্তী সময়েও তার আইনগত লড়াই চালিয়ে যান। ফলে ২০০০ সালে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট এ সংক্রান্ত এক আদেশে স্কুলটিকে পরীক্ষার্থীদের নাম ও প্রাপ্ত নম্বরসহ পুরো তালিকা ঘোষণা করার আদেশ দেন। রেকর্ড থেকে জানা যায়, স্কুলটিতে ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের বেশির ভাগের ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর আশাব্যঞ্জক না হলেও তারা ছিল বড় বড় ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। এই তথ্য গণমাধ্যমে এবং সাধারণ জনগণের মাঝে গণঅসন্তোষ সৃষ্টি করে। আর তথ্য অধিকার আইন[৩৮] কাজে লাগিয়ে স্কুলটির ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর বাবা-মায়েরা নিজ সন্তানের পরীক্ষার ফল জানার জন্য ভীড় জমান।

এসময় থাইল্যান্ডের স্টেইট কাউন্সিল এক রুল জারি করে যে, দেশের সংবিধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে সকলকে শিক্ষার সমান সুযোগের যে নিশ্চয়তা দেয়, স্কুলটিতে ভর্তির নীতি সেই অধিকারকে অগ্রাহ্য করেছে।[৩৯] তখন থাইল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রক থেকেও বলা হয়, 'Katsetsart Demonstration School'-এর মতো রাষ্ট্রচালিত স্কুলগুলোকে তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। স্টেইট কাউন্সিলের রায় ও সরকারি মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্ত ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তা দেশটির স্কুল ব্যবস্থাপনায় 'স্বজনপ্রীতি এবং গোষ্ঠীতন্ত্র' খর্ব করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।[৪০]

নাথ্থানিত-এর মায়ের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে, ব্যক্তিগত ক্ষোভে দাবি করা তথ্য কীভাবে সামগ্রিক নীতি-নির্ধারণে পরিবর্তন এনে বৃহত্তর পটভূমিতে গোটা সমাজের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে। সুমালীর অভিযোগ এমন একটি অবিচারকে ঘিরে ছিল, যার বেদনা বইছিলেন সমাজের অনেকেই। স্কুলে ভর্তির তালিকার মতো মামুলি তথ্য গোপনের যে নজির অকাট্য প্রমাণ হিসেবে বেরিয়ে আসে তা প্রকৃতপক্ষে এতদিন জনগণের নজরদারির আড়ালেই ছিল। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে নথি বের করার সুমালির নজির অনেককে অনুপ্রাণিত করল মুখ বুজে অন্যায় - অবিচার মেনে

নেয়ার রেওয়াজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। তার দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে দেশব্যাপী গুণগত শিক্ষায় সকলের প্রবেশাধিকারের দাবি দানা বেঁধে ওঠে। প্রচার শুরু হয় শিক্ষা শুধু সমাজের বিত্তবান এবং অগ্রসর শ্রেণীর জন্যই নয়, দাবি ওঠে শিক্ষায় সমঅধিকারের।

থাইল্যান্ডের তথ্য অধিকার আইন ১৯৯৭

১৯৯১ সাল থেকে থাইল্যান্ডে তথ্য অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। এর আগে থাই ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ১৯৭৭ সালে জনগণের তথ্যের অধিকার প্রয়োগের আইনগত ভিত্তি সম্বলিত রূপরেখা অনুমোদন করে।

এই আইন অনুযায়ী সে দেশের নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় যে কোনো প্রতিষ্ঠানের তথ্য দাবি করতে পারে। তা সত্ত্বেও দুর্নীতি দমন কমিশনের মতো কিছু প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতাধীন নয়। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে দাবিকৃত তথ্য বিনিময়ের সময়সীমাও বেঁধে দেয়া নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে তথ্যবিনিময়ে মর্জিমাফিক অব্যাহতিও প্রদান করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, (দেশটিতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র থাকায়) রাজকীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য গোপনীয়তার সময়সীমা হচ্ছে ৭৫ বছর। তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনুশীলনগুলোর সঙ্গে মিল রেখে 'থাইল্যান্ড অফিসিয়াল ইনফরমেশন অ্যাক্ট'-এ এরূপ বিধান অবশ্য রয়েছে, যেসব প্রতিষ্ঠানকে তথ্য প্রকাশ থেকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে, তাদেরও অন্তত সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য নিজে থেকে প্রকাশ করতেই হবে। বিশেষ করে তাদের কাঠামো, ক্ষমতা, কী কী ধরনের কাজের জন্য তারা নিয়োজিত– এসব জানানো প্রয়োজন।

আইনটি জারি হওয়ার প্রথম কয়েক বছর তথ্য অধিকার আদায়ের বেশ কয়েকটি সফল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এবং কোনো কোনোটি প্রচলিত নীতিমালার পরিবর্তনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। যেমনটি আমরা দেখেছি উপরে সুমালীর লড়াইয়ের ক্ষেত্রে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আইনটির বিষয়ে জনগণের আগ্রহ এবং এর প্রয়োগ দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষভাবে বলা যায়, প্রচারমাধ্যম কর্মীরা এই আইনের সুবিধা ব্যবহার করছেন খুবই নগণ্য মাত্রায়।[৪১]

শিক্ষার অধিকার

শিক্ষার অধিকার নিবিড়ভাবে তথ্যের অধিকারের সঙ্গে জড়িত। তথ্যই জনগণ ও সমাজকে শিক্ষিত করে তোলার চাবিকাঠি। জনগণকে অনেকগুলো ইস্যুতে বিশেষ করে মানবাধিকারের মৌলিক বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব সরকারের। শিক্ষা শিশুদের জন্য বিশেষভাবে জরুরি তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য এবং বিশ্ব সম্বন্ধে তাদের ধারণা সৃষ্টির জন্য।

জাতিসঙ্ঘ-এর সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে: "শিক্ষার অধিকার সবার জন্য স্বীকৃত"[৪২] এবং "ন্যূনতম প্রাথমিক পর্যায়ে বিনামূল্যের শিক্ষা থাকতেই হবে।" দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাস্তবতা ভিন্ন। তবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ (আইসিইএসসিআর)-এর ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদ উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষার অধিকারকে বেশ প্রশস্ত করে দিয়েছে। জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটি রাষ্ট্রপক্ষের জন্য ঘোষণা করে রেখেছে যে, "আইসিইএসসিআর চুক্তির পক্ষগুলো এমন একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান গঠন ও চালু করতে বাধ্য থাকবে– যা চুক্তির ১৩(১) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য কতটা পূরণ হচ্ছে তা তদারকি করবে।"[৪৩] শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের উচিত রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা ও অন্য নাগরিকদের জন্য তথ্য অধিকারের সুযোগ নিশ্চিত করে দেয়া।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিশ্বের অনেক দেশই স্কুল বয়সী বাচ্চাদের জন্য রাষ্ট্রীয় খরচে অথবা বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেনি। এমনকি যেসব দেশে বিনামূল্যে শিক্ষার আইনগত নিশ্চয়তাও বিদ্যমান, সেখানেও শিক্ষায় ফি ধার্য হতে দেখা যায়।[৪৪] অনেক দেশে আবার কাজে প্রবেশের ন্যূনতম কোনো বয়সও নির্ধারিত নেই। এ কারণে সেসব স্থানে শিশুদের শ্রমঘন কাজে নিয়োজিত দেখা যায়। ওইসব দেশে নিজ পছন্দে কাজের বদলে স্কুলে যাওয়ার অধিকার শিশুরা চর্চা করতে ব্যর্থ; বরং শ্রমিক জীবন বেছে নিতেই বাধ্য হয় তারা।[৪৫]

১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে থাইল্যান্ড অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের অধিকার

তথ্য অধিকার আইন স্লো-াভাক জনগণকে বন রক্ষায় সাহায্য করেছে

স্লো-াভাকিয়ায় বনে গাছ কাটার কাজ অবশ্যই সরকারি বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় পরিচালিত হওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এর বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা আবার তৈরি করে সেসব কোম্পানি, যারা গাছ কাটার কাজ পেতে ইচ্ছুক। দশ বছরের ছকে তৈরি এরূপ পরিকল্পনা সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ এবং এর কার্যক্রম সরকারি তদারকির আওতাধীনও বটে। এরূপ বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনাটি কতটা পরিবেশ-বান্ধব এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় উপযোগী সেটিই থাকে তাদের অনুমোদনের মূল বিবেচ্য।[৪৬]

২০০৫ সাল পর্যন্ত বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় জড়িত ছিল মাত্র তিনটি পক্ষ– গাছ কাটার কাজ পেতে আগ্রহী সংস্থা, পরিকল্পনা অনুমোদনকারী কৃষি মন্ত্রণালয় এবং রাষ্ট্রীয় এসংক্রান্ত তদারকি প্রতিষ্ঠান। বন ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে সরকারি তরফ থেকে তথ্য বা মতবিনিময়ের কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। ফলে সাধারণের জন্য তথ্য জানার কিংবা বন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অথবা নিজেদের পরিবেশ রক্ষায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ ছিল না।

২০০০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে পূর্ব স্লো-াভাকিয়াতে বন উজাড়ের বহু প্রকল্প গৃহীত হয়। এ সময় ভিআইকে ('VIK', যার স্থানীয় অর্থ 'নেকড়') নামে একটি বড় পরিবেশবাদী সংগঠন উপরোক্ত বিষয়ে সোচ্চার হয় এবং পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলে। 'ফ্রি একসেস টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট ২০০০' নামে সম্প্রতি তৈরি তথ্য অধিকার আইনের আওতায় স্থানীয় পরিবেশবাদীরা প্রিসোভ নামে শহরে প্রশাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাবিত বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সম্বন্ধে তথ্য জানার আবেদন জানায়।[৪৭] ভিআইকে সংগঠন হিসেবে বিশ্বাস করত– গাছ কাটার পরিকল্পনার সিদ্ধান্তে জনগণের অংশীদারিত্ব থাকা ন্যায্য। নিজস্ব পরিবেশ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য জানার অধিকার সবার রয়েছে। পাশাপাশি বনের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে তাদের অংশগ্রহণের অধিকারও রয়েছে। এরূপ বিশ্বাসই তাদের তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন জানাতে উদ্বুদ্ধ করে। তথ্যের গোপনীয়তার অজুহাতে নগর প্রশাসন এবং মন্ত্রণালয় উভয়ে ভিআইকে-এর তথ্যবিনিময়ের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু তথ্য অধিকার আদায়ে দৃঢ় সংকল্প ভিআইকে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়। তথ্য প্রদানে সরকারি অস্বীকৃতি তথ্য অধিকার আইনে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে দাবি করে সংগঠনটি আদালতের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করে।

সুপ্রিম কোর্ট ভিআইকে-এর পক্ষে রুল জারি করে এবং বেআইনিভাবে তথ্য গোপন করার অভিযোগে সরকারকে দায়ী করে। সরকারকে আদালত স্মরণ করিয়ে দেয় আইনের আওতায় বন ব্যবস্থাপনা কিংবা বন প্রশাসনের গোপনীয়তার কিছু নেই।

আদালতের আদেশে এও বলা হয়, সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই তথ্যটি গোপনীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এরূপ আইনগত রায়ের পর সরকার বন ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়।

আদালতের নির্দেশনামতো তথ্য পেয়ে ভিআইকে-এর কাছে এ পর্যায়ে স্পষ্ট হয়ে যায়, সরকার বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছিল। স্লোভাকিয়ায় জাতীয় বনাঞ্চল এবং সংরক্ষিত এলাকার আয়তন বৃদ্ধি ও তার কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণের দাবি জানিয়ে ভিআইকে তখন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। শেষপর্যন্ত ভিআইকে-এর দাবি চূড়ান্তভাবে গৃহীতও হয়। সরকার বনাঞ্চল সংরক্ষণের তাদের দুটি পরিকল্পনা সম্প্রসারিত করে। সংরক্ষণযোগ্য এলাকার আয়তন মূল পরিকল্পনার ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৪০০ হেক্টরে উন্নীত করা হয়। উপরন্তু নিছক নামসর্বস্ব ন্যাশনাল পার্কের পরিবর্তে স্লোভাকিয়ায় এরপর আইন অনুযায়ী গড়ে ওঠে বনাঞ্চল সংরক্ষণের সুবিন্যাস্ত কাঠামো।

পরিবেশ বিষয়ক তথ্য অধিকারের সংগ্রাম আদালতে গড়ানো এবং পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে এই অধিকার প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে পরিবেশের হুমকি এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে স্বচ্ছতার গুরুত্ব সম্বন্ধে স্লোভাকিয়ায় এসময় বিশেষ জনসচেতনতাও সৃষ্টি হয়। এ থেকে বন রক্ষায় আইন পরিবর্তনের দাবি জোরদার হয়। ফলে ২০০৫ সালে বন সংক্রান্ত আইন সংশোধন করে বন সংরক্ষণ কর্মসূচির পরিকল্পনা এবং সেসব পরিকল্পনা তৈরির প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত তথ্যে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের জানার অধিকার স্বীকৃত হয়। নতুন এই সংশোধনীর গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সরকারি বৈঠকে বেসরকারি প্রতিনিধিদের উপস্থিতির অনুমোদন। এর ভেতর দিয়ে বন উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পরিকল্পনায় জনগণের অংশীদারিত্বের অনন্য নজির সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়ায় বন সম্পর্কিত বিষয়ে বহু ব্যক্তির অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। যে দেশগুলোর মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ নেহাত সীমিত, তেমন দেশে জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ বিশেষভাবে জরুরি। স্লোভাকিয়ার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তায় সরকারের তথ্য ভাণ্ডারের বন্ধ দুয়ার যখন খুলে যায় তখন প্রভাবশালীদের বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে সরকারের সংঘাতের শঙ্কাও কমে যায়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি অথবা অপ্রয়োজনীয় আইনগত মারপ্যাচের মাধ্যমে বিপত্তি ঘটানোর সম্ভবনা কমে। সরকারি প্রক্রিয়ার ওপর তথ্য অধিকারের কর্তৃত্ব স্বীকৃতির ভেতর দিয়ে কেবল যে প্রাকৃতিক রিজার্ভগুলোর আয়তন বড় হলো বা সেগুলো সুরক্ষিত হলো তা-ই নয়, বন ব্যবস্থাপনা আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী সুপারিশ করার মতো দক্ষতা এবং বাড়তি যোগ্যতাও অর্জন করে ভিআইকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ভেতর দিয়ে স্লোভাকিয়ায় বন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণধর্মী কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশীদারিত্ব প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করে।

স্লোভাকিয়ার তথ্য অধিকার আইন ২০০০

নব্বইয়ের দশকে প্রণীত বিভিন্ন দেশের সংবিধানের মতোই ১৯৯২ সালে তৈরি স্লোভাকিয়ার সংবিধানেও তথ্য অধিকার-এর স্বীকৃতি ছিল।[৪৮] সেই স্বীকৃতি নিশ্চিত করেছে দেশটির 'ফ্রি একসেস টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট' বা তথ্য অধিকার আইন।[৪৯] ২০০০ সালে প্রণীত হওয়ার পর আইনটি ২০০১ সালে কার্যকারিতা লাভ করে। এই আইন অনুযায়ী জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত যে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা ব্যক্তি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠানের কাছে সে দেশের কোনো আইনানুগ নাগরিকের জানার অধিকার স্বীকৃত হয়। এই আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্যের আবেদন পৌঁছার দশ দিনের মধ্যে জবাব দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই আইনে দু'ধাপে আপিল শুনানির সুযোগ এবং যে সকল কর্মকর্তা আইনটি লঙ্ঘন করবেন, তাদের জন্য মোটা অংকের অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার

প্রথাগত নাগরিক অধিকারের আওতায় না এলেও জাতিসঙ্ঘ অনেক আগেই স্বাস্থ্যকর ও পরিছন্ন পরিবেশের অধিকারকে অন্য সকল মানবাধিকার বাস্তবায়নের সহায়ক এক প্রধান শর্ত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ সংক্রান্ত এক সম্মেলনে জাতিসঙ্ঘ ঘোষণা দিয়েছিল "মানুষের পরিবেশ– তা প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট যা-ই হোক না কেন, তা তার উত্তম জীবনযাপনের জন্য এবং মৌলিক মানবাধিকারগুলোর বাস্তব চর্চার জন্য অপরিহার্য এবং কেবল বেঁচে থাকার অধিকারের জন্যও তা জরুরি।"[৫০] এ ঘোষণার পর ক্রমেই আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে এ স্বীকৃতি আসতে থাকে যে, সুস্থ ও দূষণমুক্ত পরিবেশে বসবাসের অধিকার প্রতিটি মানুষের মৌলিক মানবাধিকারের অংশ। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসঙ্ঘ কমিটি বলেছে, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার "স্বাস্থ্যের মূল নির্ণায়ক" এবং তা স্বাস্থ্য অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসঙ্ঘ সনদের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদেরও প্রধান প্রতিপাদ্য।[৫১]

পরিবেশ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত 'রিও ঘোষণা' সম্ভবত নাগরিকদের স্বাস্থ্যকর এবং টেকসই পরিবেশের নিশ্চয়তা বিধানে রাষ্ট্রগুলোর সবচেয়ে জোরালো এবং পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার। এই ঘোষণায় নিজ নিজ নাগরিকদের স্বাস্থ্যকর এবং স্থায়িত্বশীল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রগুলোর বাধ্যবাধকতার কথা রয়েছে। এর ১ নম্বর মূলনীতিতে রয়েছেঃ মানুষ "প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যকর ও উৎপাদনশীল জীবনের অধিকার লালন করে।" একই মূলনীতির ১০ নম্বর নির্দেশনায় এই অধিকারের পরিধি বিস্তৃতি করে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তির পরিবেশ এবং এতে ব্যবহৃত স্বাস্থ্যহানিকর পদার্থ এবং সে সম্পর্কিত কার্যক্রম বিষয়ে সরকারি তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।[৫২]

আগে চেকোস্লোভাকিয়ার অঙ্গীভূত আজকের স্লোভাকিয়া স্বাধীন দেশ হিসেবে ১৯৯৩ সালের মে মাসে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদের উত্তরাধিকার লাভ করেছে। চেকোস্লোভাকিয়া শুরুতেই চুক্তিটি গ্রহণ করেছিল। স্লোভাকিয়া 'রিও ঘোষণা'রও সদস্য রাষ্ট্র। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে স্লোভাকিয়া এখন যেসব আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের আওতাধীন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো Aarhus Convention. অনেকেই হয়তো ওয়াকিবহাল আছেন যে, তথ্য জানার অধিকার, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ এবং পরিবেশ বিষয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই এ কনভেনশনের লক্ষ্য ছিল।[৫৩]

খাদ্য অধিকার

ভারতে তথ্য অধিকার আইনে গরিবের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো যেভাবে

এক শত কোটির বেশি লোকের দেশ ভারত। এই দেশে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ এমনভাবে বেঁচে আছেন যে, তাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের ব্যয় ২ ডলারেরও নিচে।[৫৪] গরিবের সাহায্যের জন্য এবং বঞ্চনার হাত থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কিছুদিন আগে সীমিত আয়ের লোকজনের জন্য বিশেষ বিতরণ ব্যবস্থায় দেশব্যাপী ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করেছে। চাল, আটা, চিনি, ভোজ্যতেল, কেরোসিনসহ জ্বালানি তেল, নিত্য ব্যবহার্য বেশ কিছু সামগ্রী এ দোকানগুলোতে ভর্তুকি দিয়ে বিক্রি করা হয়।[৫৫] গরিবদের ভেতর ভাগ্যবান যারা এ ব্যবস্থার আওতাধীন, তারাই কোনো রকমে এই রেশনের পণ্যসামগ্রী কিনতে পারেন। তবে এর ব্যবস্থাপনা দুর্নীতিমুক্ত নয়। অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমলাদের যোগসাজশে রেশন দোকানের পণ্যসামগ্রী অন্যত্র বিক্রি করে দেয়া বা কালোবাজারির ঘটনা বিভিন্ন সময় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।[৫৬]

হাজার হাজার গরিব পরিবার অধ্যুষিত গুজরাট প্রদেশের কালাল তালুক এলাকায় ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ রয়েছে। দারিদ্র্যের কারণে এবং বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলোর উপর। প্রতিটি গরিব পরিবারকে রেশন কার্ডের জন্য স্থানীয় সরকার অফিসারের কাছে বিধি মোতাবেক আইনের আওতায় আবেদন করতে হয়। পরিবারের সকল সদস্যের নাম এই কার্ডে নথিভুক্ত করা হয়। ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে প্রাপ্য রেশনের পরিমাণও এতে উলে-খ থাকে। কাগজ কলমে অবস্থা দেখে মনে হবে যেন কোনো ব্যক্তি যে কোনো কার্যদিবসে স্থানীয় সরকার অফিসারের কার্যালয়ে গিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণ করার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেই রেশন কার্ডের আবেদন করতে পারেন। কিন্তু জীবনরক্ষাকারী এই কার্ড পাওয়া বাস্তবে এত সহজ নয়। কালাল তালুকে স্থানীয় সরকার কর্মকর্তার দফতরের বাইরের দেয়ালে জনগণের জ্ঞাতার্থে শুধু শনিবার রেশন কার্ডের আবেদনের জন্য যোগাযোগের কথা বলা হয়েছে। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে দফতরটি গরিবের যোগাযোগের জন্য নয়। প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় সপ্তাহে শনিবার গুজরাট প্রদেশে সরকারি অফিস খোলা থাকে। বাকি শনিবারগুলো ছুটি। এর মানে হচ্ছে স্থানীয় সরকার কর্মকর্তার অফিসে আশপাশের ৭০ গ্রামের গ্রামবাসী মাসে শুধু দুই দিনই তাদের কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবে। এটা সবারই জানা ভিড়ের মধ্যে ওই দু'দিনে তাদেরই অগ্রাধিকার থাকবে যারা কর্মকর্তাদের বা তাদের টাউটদের ঠিকমতো ঘুষ দিতে পারবে। অন্যদের হয় অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে অথবা পরবর্তী আরেক শনিবারের কার্যদিবসে আবারও আসতে হবে।

এই অবস্থায় জর্জরিত কালালের বাসিন্দা আসলাম ভাই দেওয়ান স্থানীয় সরকার অফিসারের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং ন্যায্যমূল্যের দোকানে জনগণের অধিকার সম্বন্ধে ২০০৫ সালের ভারতীয় তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিস্তারিত জানতে আবেদন করেন।[৫৭] আসলাম ভাইয়ের অনুরোধে এও ছিল যে, সরকারি এমন কোনো আদেশ রয়েছে কি না যার বলে রেশন কার্ড সংক্রান্ত বিষয়গুলো শুধু শনিবারেই বিহিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে তারও অনুলিপিও যেন তাকে দেওয়া হয়। সরকারি তথ্য অফিসার শুরুতে এ আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। আসলামভাই তখন রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে তার আবেদন পাঠিয়ে দেন। স্থানীয় সরকার অফিসার ১৫ দিন পর আসলাম ভাইকে তলব করেন এবং তার আবেদন তুলে নেয়ার উপদেশ দেন। তাকে বলা হয় সরকারি কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করা তার সমীচীন নয়। আসলাম ভাই তার চাওয়া তথ্যের আবেদন তুলে নিতে অস্বীকার করেন এবং স্পষ্ট জানিয়ে দেন তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তার আবেদনের জবাব পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আসলাম ভাই এও বলেন, সংশি-ষ্ট কর্মকর্তার তার আবেদন প্রত্যাখ্যানের সুযোগ রয়েছে; তবে সেক্ষেত্রে তাকে লিখিতভাবে জানাতে হবে যে, কেন তাকে তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানানো হচ্ছে। এসময় আসলাম ভাইয়ের বাবাকেও চাপ প্রয়োগ করা হয় ছেলের তথ্য প্রার্থনার আবেদন প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য। কিন্তু আসলাম ভাই লিখিত প্রত্যাখ্যানপত্র পাওয়ার দাবিতে অটল থাকেন।

এ রকম অবস্থায় ‘উপ-মামলতদার’ নামে পরিচিত স্থানীয় ওই কর্মকর্তার আর কোনো রাস্তা খোলা থাকলো না। নিয়ম অনুযায়ী তথ্যের জবাব না দিলে তাকে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে। আসলাম ভাইকে তিনি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন যে, রেশন কার্ড সংক্রান্ত কাজ শনিবারই কেবল করা যাবে এ ধরনের সরকারি কোনো বিধি-বিধান বা নিয়ম-নীতি নেই। গরিবের ‘সুবিধা’র কথা ভেবেই আপাতদৃষ্টিতে প্রক্রিয়াটি চালু করা হয়। কারণ তারা বেশিরভাগই দিনমজুর। তবে এখন থেকে প্রত্যেক কার্যদিবসে অফিস চলাকালীন রেশনকার্ড সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে বলে তিনি লিখিতভাবে আশ্বস্ত করেন। অফিসার তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আশঙ্কা থেকে আসলাম ভাইকে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত না করার অনুরোধ জানান।

ভারতীয় তথ্য অধিকার আইনের অধীনে আসলাম ভাই-এর অভিযোগের পর থেকে স্থানীয় সরকার অফিসে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। রেশন কার্ডের জন্য পরিবারগুলো এখন ঘুষ আর লম্বা লাইন ছাড়াই তাদের ইচ্ছামত সপ্তাহের যে কোনো কার্যদিবসে আবেদন জানাতে পারে। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে আসলাম ভাই-এর সম্প্রদায়ের শত শত লোক ভারতীয় ন্যায্যমূল্যের দোকান ব্যবস্থায় তাদের অধিকার নিশ্চিত করেছে।[৫৮]

দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্রের হাতে নাজেহাল ভারতবাসী তাদের মৌলিক অধিকারের সংগ্রামের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তথ্য অধিকার আইন পেয়েছে। আইনটি নতুন হলেও

দেশটির সকল প্রান্তের হাজারো মানুষ এ থেকে সুবিধা গ্রহণ করেছে। জনগণ সক্রিয়ভাবে আইনটি ব্যবহার করছে। গৃহায়নের ভর্তুকি, স্বাস্থ্যসেবা বা শিক্ষার মতো খাতে যেখানে প্রচুর পরিমাণে সরকারি বিনিয়োগ হচ্ছে, সেগুলোতে মানুষ নিজেদের অধিকার নিশ্চিত করছেন এই আইন দ্বারা। সমাজের যেসব শ্রেণী-পেশার মানুষের কথা মাথায় রেখে আগে এসব স্কিম চালু করা হতো তাদের খুব অল্পসংখ্যকই আগে এসবের ফায়দা পেত। সকল স্তরের লোকের দ্বারা এ আইনটির ব্যবহার সমাজে এর মর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ বহন করে। তবে সমাজের একেবারে চরম গরিব ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকজনের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব ও সমস্যা সমাধানে, নিজস্ব অধিকার আদায়ে এবং বিশেষভবে তাদের ঘিরে আবর্তিত দুর্নীতি এবং বৈষম্যমূলক আচরণ উন্মোচনে এ আইনের কার্যকর ভূমিকা এ সত্যই তুলে ধরে যে, তথ্য অধিকারের নিশ্চয়তা অন্যান্য মৌলিক অধিকার অর্জনের বাস্তব পূর্বশর্ত।

ভারতীয় তথ্য অধিকার আইন ২০০৫

ভারতীয় তথ্য অধিকার আইনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলো, সরকারি সংস্থা বা সরকারি অর্থায়নে চালিত সংস্থাগুলোতে নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

আইনটিতে উত্তমভাবে ব্যবহারিক কাজে লাগানোর মতো বেশ কিছু বিধান রয়েছে। তথ্যকে বিশদ পরিসরে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এতে, যা অন্যান্য আইনে পাওয়া যায় না বললেই চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গণপূর্ত বিভাগের অধীনে যেসব কাজ পরিচালিত হয়, তাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রীর নমুনাও 'তথ্য'-এর আওতাভুক্ত। এ আইনের আওতায় প্রতিটি সরকারি সংস্থায় একজন তথ্য অফিসারের নিয়োগ বাধ্যতামূলক। তথ্য অফিসারই সকল তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত এবং অন্যায়ভাবে তথ্য আটকে দেয়া হলে তাকেই ব্যক্তিগতভাবে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। এই আইনের আওতায় তালিকাভুক্ত অনেক বিষয়ের তথ্য জনগণকে সক্রিয়ভাবে অবহিত ও হালনাগাদ করার বিধান রয়েছে। আইনটির বাস্তবায়ন এবং এর অধীনে উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে তথ্য কমিশন গঠন করার বিধান রয়েছে। তথ্য প্রকাশে যে সমস্ত ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে, সে সকল বিষয়ে জনস্বার্থের গুরুত্ব সংরক্ষিত স্বার্থের চেয়ে বেশি হলে জনস্বার্থ অগ্রাধিকারে অগ্রগণ্য বিবেচিত হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে তথ্য অধিকার পৌঁছে দেয়ার জন্য এই আইনে মৌখিকভাবে আবেদন করার বিধান রয়েছে, যেন অক্ষরজ্ঞানহীনরাও সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। আবেদন লিপিবদ্ধ এবং নথিভুক্ত করতে তথ্য অফিসারের তরফ থেকে সহযোগিতা বাধ্যতামূলক। ১৯২৩ সালের সরকারি গোপনীয়তা আইন দেশটিতে বলবৎ রয়েছে। গোপনীয়তা আইনসহ অন্য যে কোনো আইন দ্বারা তথ্য অধিকার সংকোচন বা ক্ষুণ্ণ হলে তথ্য অধিকার আইন অগ্রাধিকার পাবে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে এই আইনের বাস্তবায়ন হচ্ছে বিভিন্ন মাত্রায়। তথ্যের আবেদনে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার দলিল যে সকল ক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেসব জায়গায় সহিংসতার হুমকি, এমনকি সহিংস ঘটনা ঘটেছে বলেও খবর রয়েছে। আইনটি সম্পর্কে জনসচেতনতাও দেশের সর্বত্র সমভাবে ছড়িয়ে পড়েনি।

খাদ্যের অধিকার

জাতিসঙ্ঘের খাদ্য অধিকার সংক্রান্ত বিশেষ র‍্যাপোটিয়ারের ভাষায়: "ধনীদের টইটুম্বুর বিশ্বে ৮২৬ মিলিয়ন লোকের অনাহারে-অপুষ্টিতে দিন যাপন করা এবং প্রতি বছর তাদের ৩৬ মিলিয়নের অনাহার এবং খাবারের ঘাটতিতে মরে যাওয়া এক চরম নিষ্ঠুর কেলেঙ্কারি।"[৫৯] বাঁচার জন্য এবং স্বাস্থ্য অটুট রাখতে যতটুকু খাবারের প্রয়োজন ততটুকু পর্যাপ্ত খাবার ছাড়া মানুষের জীবন ধারণ সম্ভব নয়।

জাতিসঙ্ঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে খাদ্যের অধিকার সন্নিবেশিত রয়েছে এবং অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদের মাধ্যমে এই অধিকারকে আন্তর্জাতিক পরিসরে আইনগত সুরক্ষা দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : "প্রত্যেকের নিজের ও নিজের পরিবারের খাদ্যের, স্বাস্থ্যের এবং ভালো থাকার নিশ্চয়তাসহ মানসম্মত জীবনের অধিকার রয়েছে।"[৬০] দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটাই সত্যি, বিশ্বব্যাপী লাখো মানুষের জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে উপরোক্ত নির্দেশনার আশ্চর্যজনক বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

২০০২ সালের বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে অনেক দেশই অনাহারি লোকের সংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, যা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলেও পুনর্ব্যক্ত হয়।[৬১] দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দারিদ্র্যপীড়িত বেশিরভাগ দেশের জন্য বর্তমান অগ্রগতির ধারায় উপরোক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আরো বেশ অনেক দিন লেগে যাবে। খাদ্য অধিকারের নিরাপত্তা বিধান সরকারের জন্য এক বাধ্যতামূলক কর্তব্য। এই কর্তব্যের মধ্যে পড়ে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা। পাশাপাশি জনগণের খাদ্যের অপর্যাপ্ততা কিংবা অপুষ্টি সৃষ্টিকারী সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিহারের নিশ্চয়তা বিধানও সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক।

উলে-খ্য, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদটি ১৯৯৭ সালের জুলাইয়ে ভারত কর্তৃক গৃহীত হয়।

নারী-পুরুষের সমান অধিকার

সমকাজে সমমজুরির নীতি ও তথ্য অধিকার আইন

বিবিসিতে যেভাবে জেন্ডার বৈষম্যের তথ্য ফাঁস হলো

সাধারণভাবে এটা মনে করা হয় যে, ব্রিটেনে নাগরিকরা নারী অধিকারের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল এবং সেখানে নারী-পুরুষ সমান অধিকারের বিষয়গুলো মেনে চলা হয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের মতো নারীর সমঅধিকার ও সমস্বাধীনতা রয়েছে ব্রিটেনে। যেমন- ভোটাধিকার, সম্পত্তির মালিকানায় অধিকার, গণপ্রতিনিধি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে। কিন্তু সমকাজে সমমজুরির আইনগত বিধানটি বাস্তবে কার্যকর হচ্ছে বেশ ধীর লয়ে।

১৯৭০ সালে যুক্তরাজ্যে সমমজুরি আইন প্রবর্তিত হয়।[৬২] এই আইনের আওতায় একই বা প্রায় একই ধরনের কাজের জন্য নারী-পুরুষের বেতন বৈষম্য নিয়োগকর্তাদের জন্য অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। নারী-পুরুষের বেতন বৈষম্য কমিয়ে আনতে এই আইন সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ২০০৪ সালের সর্বশেষ পরিসংখ্যানেও এক্ষেত্রে বিশাল বৈষম্যের চিত্র ফুটে ওঠে এবং কিছু ক্ষেত্রে এই বৈষম্য বেড়েই চলছে বলে দেখা যায়।[৬৩] ২০০৪ সালে নিরপেক্ষ গবেষকদের অনুসন্ধানে দেখা যায়, গড়ে পুরুষ ও নারীর প্রতি ঘণ্টার আয় তুলনা করলে দেখা যাবে যে, নারীরা ২০ শতাংশ কম আয় করছেন।[৬৪] 'নারী-পুরুষের বেতন বৈষম্য'-এর বিষয়ে একাধিক কারণের কথা বলা হয়। যেমন- ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষায় ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় নারী-পুরুষে যে বৈষম্য রয়েছে তা বেতন বৈষম্য, জিইয়ে রাখতে ভূমিকা রাখছে বলে মনে করা হয়। তাছাড়া নিম্ন আয়ের কর্মক্ষেত্রগুলো নারীদেরই দ্বারাই পূরণ হবে এটাও যেন এক চিরসত্য।[৬৫] এছাড়া নারীরা ম্যানেজারধর্মী পদগুলোতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে খানিক বৈষম্যের শিকার হবেই এমন একটি ধারণাও সহনশীল হয়ে গেছে জনগণের মনোজগতে। এ কারণে সমঅভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা থাকার পরও শীর্ষ ম্যানেজমেন্ট পদগুলোতে নারীর তুলনায় পুরুষরাই পদোন্নতি পেয়ে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে কী ঘটে উদাহরণ হিসেবে অন্তত একটি নির্দিষ্ট সংস্থায় অনুসন্ধান করা যেতে পারে। সেই প্রতিষ্ঠানটি হলো বহুল পরিচিত ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বা বিবিসি।

ব্রিটেনের ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্টের[৬৬] আওতায় ২০০৬ সালে বেনামিতে তথ্যের এক আবেদন করা হয়। আবেদনকারী জানতে চান, প্রতিষ্ঠানটি তার নারী রিপোর্টারদের পুরুষ সহকর্মীদের সমান বেতন দিচ্ছে কি না। এ তথ্য উন্মোচনের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ রিপোর্টারদের বেতনের বিশাল ফারাক স্বীকার করে নেয়া হয়। জেন্ডার সমতার পক্ষে বিবিসির প্রকাশ্য ঘোষিত অঙ্গীকার সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি পুরুষ সহকর্মীদের চেয়ে নারী রিপোর্টারদের গড়ে প্রতি বছর ৬ হাজার ৫০০ পাউন্ড কম বেতন প্রদান করে থাকে।[৬৭]

ঘটনাটি এমন একটা সময় জনসম্মুখে বেরিয়ে আসে, যখন রাষ্ট্রীয় খাতে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার জন্য ক্রমেই জনগণের তরফ থেকে চাপ বাড়ছিল। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটেনের 'নারী কর্মকমিশন' 'ন্যায্য ভবিষ্যতের অভিমুখে'[৬৮] শীর্ষক তাদের প্রতিবেদনে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অভিজ্ঞতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে নারী-পুরুষের বেতন বৈষম্য নিরসনে বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে সরকার দু'বছর মেয়াদি এক পরিকল্পনার প্রস্তাব করে। এই পরিকল্পনায় মূল্য লক্ষ্য হিসেবে রাখা হয় নারী-পুরুষ কর্মীদের মাঝে মজুরি বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং পাশাপাশি ২০০৮ সালের মধ্যে বড় বড় সকল প্রতিষ্ঠানকে তাদের মজুরি কাঠামো পর্যালোচনার জন্য বলা।[৬৯]

বিবিসির বৈষম্যপূর্ণ বেতন কাঠামো জাতীয় প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ার পরপরই প্রতিষ্ঠানটি[৭০] তাদের বেতন কাঠামো পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার মাধ্যমে বৈষম্য শনাক্তকরণের ঘোষণা দেয়। রিপোর্টারদের বেতনের তারতম্যের বিষয়ে কারণ হিসেবে বিবিসি দাবি করে, বয়স আর অভিজ্ঞতাকে সেখানে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়– পার্থক্যের ভিত্তি নারী-পুরুষের ভেদাভেদ নয়। তারপরও এটাই সত্য যে, প্রতিষ্ঠানটি একই কাজের জন্য পুরুষের তুলনায় নারী কর্মীকে যথেষ্ট কমই বেতন দিচ্ছিল, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদণ্ডের রীতিনীতি লঙ্ঘনের এক দৃষ্টান্ত।[৭১] বেতন কাঠামো পুনর্মূল্যায়নের সময় বিষয়টির সুরাহা হবে বলে আশা করা যায়। এরপরও বলতে হয়, তথ্য অধিকারের মাধ্যমেই এই সত্য বিশেষভাবে সবার মনোযোগে এলো যে, ঐতিহ্যগতভাবেই মহিলাদের কাজের অবমূল্যায়ন হয়ে চলেছে এবং আচরণগত দিক থেকে বাস্তবে তা বদলায়নি, এমনকি সুপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের কাঠামোতেও বিষয়টি প্রোথিত হয়ে আছে। এখন অবশ্য তথ্য অধিকারের কল্যাণে সমাজের প্রচলিত পুরানো সংস্কারগুলো উন্মোচনের মধ্য দিয়ে তাতে পরিবর্তন সাধনের একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কর্মজীবী নারীদের সমঅধিকারের পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধানে যুক্তরাজ্যকে আরো বেশ অনেক দূর যেতে হবে। যে সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে, তাদের দায়বদ্ধতা সৃষ্টির মাধ্যমে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য জনগণের তথ্য অধিকার অব্যাহত রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, জেন্ডার সমতাধর্মী অধিকারগুলো অর্জনে হয়তো অনেক দিন লেগে যাবে। কিন্তু বিবিসির ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায়, সফলতা বা অগ্রগতি তখনি আসছে, যখন কোনো একটি প্রতিষ্ঠান জনসমাজে লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়ছে। তথ্য অধিকারের চর্চার ভেতর দিয়ে সেকেলে রীতি-নীতি উন্মোচিত হচ্ছে– আর তখন জনগণ পরিবর্তনের দাবি তোলার সুযোগ পাচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের তথ্য স্বাধীনতা আইন ২০০০

ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট নামে পরিচিত যুক্তরাজ্যের তথ্য অধিকার আইনটি[৭২] ২০০০ সালে গৃহীত হলেও ২০০৫ সালের আগে পুরোপুরি কার্যকারিতা লাভ করেনি। যুক্তরাজ্যে বহু দেশের মানুষ বাস করে। তবে এ আইনে দেশটির হাজারো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে, আবাসিক অধিকার এবং নাগরিকতার ঊর্ধ্বে সকল ব্যক্তির তথ্য জানার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তথ্যের আবেদনের ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহের বিধান এতে রয়েছে। আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহে জনস্বার্থ কতটুকু সংরক্ষিত হবে, তার যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে এই সময়সীমা বাড়ানোরও সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে এই সুযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের আবেদনে সমস্যার সৃষ্টি করা যায় বলে ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এতে আবেদনের স্তূপ তৈরি হয়। অবাধ তথ্যপ্রবাহের আওতাবহির্ভূত যে সকল বিষয় রয়েছে, তার বিবরণ এই আইনে ১৩ পৃষ্ঠা জুড়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর ভেতর কিছু বিষয় চূড়ান্তভাবেই এ আইনের আওতাধীন নয়। আবার কিছু বিষয় জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনার সঙ্গে সংশি-ষ্ট, অর্থাৎ গুরুত্বের দিক থেকে তথ্য প্রকাশে জনস্বার্থ বেশি রক্ষা হবে বিবেচিত হলে সেক্ষেত্রে তথ্যবিনিময় করা যাবে। কিছু বিষয়ে তথ্য প্রকশিত হলে কীরূপ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে সেটা যাচাই শেষেই কেবল তথ্য প্রকাশ স্থগিতের কথা বলা হয়েছে।

এই আইনের আওতায় স্বাধীন সংস্থা হিসেবে তথ্য কমিশনারের অফিস সৃষ্টি করা হয়। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোতে এ আইনের বাস্তবায়ন ও এর বিধানগুলোর সঠিক কার্যকারিতা তদারকি তথ্য-কমিশনারের দায়িত্বাধীন। যারা তথ্য উন্মোচনে ভূমিকা রাখবেন তাদের ব্যাপারে আইনে পর্যাপ্ত সুরক্ষা রয়েছে। তারপরও ১৯৮৯ সালের অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট[৭৩] কার্যকার থাকার কারণে এ বিষয়ে তথ্য অধিকার আইনকে ওই আইনের সঙ্গে অনেক আপস করতে হয়েছে।

এই আইন ইংল্যান্ড, ওয়েলস্, উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে অবস্থিত ইংল্যান্ডের দপ্তরগুলোর জন্য কার্যকর। স্কটিশ নির্বাহীদের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো সেদেশের তথ্য অধিকার আইনের অধীনে পরিচালিত। ২০০২ সালের মে মাসে স্কটিশ পার্লামেন্ট আইনটি অনুমোদন করলেও জানুয়ারি ২০০৫[৭৪]-এ তা কার্যকারিতা লাভ করে। স্থানীয় সরকার (তথ্য অধিকার) আইন[৭৫]-এর দ্বারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বৈঠকে নেয়া সিদ্ধান্ত এবং তাদের অন্যান্য কার্যক্রমের তথ্যে সাধারণের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

নারী অধিকার

অধিকার, সুরক্ষা এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমমর্যাদা কার্যকর থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। মানবাধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সনদসহ আন্তর্জাতিক যত হাতিয়ার রয়েছে, সেগুলোর প্রারম্ভিক ঘোষণাপত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার স্বীকৃত রয়েছে। বাস্তবে নারীদের প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেই গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারের সেকেলে আইন ও নীতির কারণে সমাজের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও সক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীরা সাধারণত পুরুষের মতো একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। সনাতনী এমনই একটি প্রচলিত ধারণা হচ্ছে নারী বাড়ির অন্দর মহলে কাজকর্ম করবে আর পুরুষরা বাড়ির বাইরে গিয়ে পরিবারের জন্য আয় রোজগার করে আনবেন। পশ্চিমা গণতন্ত্রের দেশ যুক্তরাজ্যেও ১৯২৮ সালের আগে নারীদের ভোটাধিকার ছিল না।

নারীর প্রতি বৈষম্য দুনিয়ার বিভিন্ন সমাজে যেভাবে প্রোথিত রয়েছে, তারই স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ[৬] ১৯৭৯ সালে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরোধ সংক্রান্ত কনভেনশনটি (CEDAW-সিডো) গ্রহণ করে। এতে স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা ১৮৫। শিশু অধিকার সনদের পর জাতিসঙ্ঘের এ সনদটিই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক দেশ অনুসমর্থন করেছে। সিডও-এ বৈষম্য সংজ্ঞায়িত হয়েছে এভাবে: "লিঙ্গভিত্তিক অজুহাতে কোনো পার্থক্য, বাধাদান বা নিষেধাজ্ঞায় নারীর স্বীকৃতি অকার্যকর করে দেয়া বা তার অগ্রগতির ক্ষতি সাধন; তার সুযোগ সুবিধা ও কর্মতৎপরতায় হস্তক্ষেপ করা– যা বৈবাহিক সম্পর্ক নির্বিচারে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য পরিমণ্ডলে মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ অধিকার সমতার ভিত্তিতে রচিত হওয়া উচিত ছিল।"

যুক্তরাজ্যে ১৯৮৬ সালের এপ্রিলে সিডও গৃহীত হয় এবং ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এর সহায়ক অপশনাল প্রটোকলেও সম্মতি জ্ঞাপন করে দেশটি।

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রবীণনিবাসের বেহাল দশা ফাঁস এবং প্রবীণদের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে আইরিশ সরকারের উদ্যোগ

২০০৫ সালের শুরুর দিকের কথা। ৭৩ বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধা আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনস্থ 'লেস ক্রস নার্সিং হোম' থেকে বেমন্ট হসপিটলে স্থানান্তরের পরই মারা যান। মৃতের সুরতহাল করার সময় তার চিকিৎসার বিষয়ে অবহেলার চিহ্ন মেলে এবং সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বৃদ্ধা দীর্ঘদিন শুয়ে থাকাজনিত পিঠের ক্ষতে ভুগছিলেন। "ক্ষতগুলো তরমুজের আকৃতির চেয়েও বড় হয়ে গিয়েছিল এবং কোনো কোনোটি হাড় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।"[৭৭] এ ঘটনা নিয়ে একাধিক তদন্ত চালানো হয়। ফলে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সেবা সদন লেস ক্রস এবং আয়ারল্যান্ডের অন্যান্য আরো প্রবীণ সদনের করুণ চিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

এ ঘটনার সুরতহালের পরপরই লেস ক্রস নার্সিং হোম-এ প্রবীণদের প্রতি অবহেলা ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তদন্তে চলতি ঘটনার টেলিভিশন অনুষ্ঠান 'প্রাইম টাইম ইনভেস্টিগেইট'-এর পক্ষ থেকে এক রিপোর্টার ছদ্মবেশ ধারণ করে সেখানে যান। লেস ক্রস-এ[৭৮] রোগীরা যে চরম অবহেলার শিকার হন, তা বেরিয়ে আসে গোপন ক্যামেরায় ধারণকৃত চিত্রে। তাদের ভেতর একজনের পিঠে অনেকগুলো ক্ষত ছিল, যথাযথ চিকিৎসা পাচ্ছিলেন না তিনি, সেকারণে চামড়ায় মারাত্মক সংক্রমণ সৃষ্টি হয়।[৭৯] ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে গণমাধ্যমে প্রচারণায় চাপ সৃষ্টি হলে তীব্র জনরোষের মধ্যে আয়ারল্যান্ডের সরকার লেসক্রস সেবা সদনটি ২০০৫ সালের আগস্টে বন্ধ করে দেয়। শুধু তা-ই নয়, দেশজুড়ে পরিচালিত রাষ্ট্রায়ত্ত সকল প্রবীণ সেবা সদনের অবস্থা পূর্ণমূল্যায়নেরও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়।[৮০] সরকার একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে এবং লেস ক্রস সেবা সদনের ব্যবস্থাপনা, কার্যক্রম ও তদারকির নিয়ম-নীতি পর্যালোচনার আদেশ জারি হয়।[৮১] তদন্ত কমিশন সেবা সদনটিতে ২০০২-০৫ সালে সংঘটিত মৃত্যুর ঘটনাগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং নভেম্বর ২০০৬[৮২]-এ তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। লেস ক্রস সদনটির সেবার মান পর্যালোচনা করে রিপোর্টে বলা হয়, "সদনটিতে প্রবীণদের সেবার মান ছিল দুঃখজনকভাবে নিম্নস্তরের ...[সামগ্রিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত] প্রাতিষ্ঠানিক নির্যাতনের প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ।"[৮৩] প্রতিবেদনের উপসংহারে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, "লেস ক্রস-এর বিচ্যুতিগুলোকে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বিবেচনা করা হলে মারাত্মক ভুল হবে।"[৮৪]

পরবর্তীকালে আয়ারল্যান্ডের তথ্য অধিকার আইন ১৯৯৭[৮৫]-এর সুবাধে সেবা সদনের উদ্বেগজনক পরিস্থিতি আরো ফাঁস হয়ে পড়লে অবস্থা বাড়তি জটিল রূপ নেয়। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইরিশ টাইমস্ পত্রিকা লেস ক্রসের ঘটনাটি সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং তারা এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনকে কাজে লাগায়।[৮৬]

নতুন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে যে দলিল-দস্তাবেজ বেরিয়ে এলো তা জনমনে চরম বিস্ময় ও গভীর চিন্তার সৃষ্টি করল। ১৯৯৮ সালেই হেলথ বোর্ডের পরিদর্শক সেবাসদনটিকে সরকারি অনুমোদন না দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন– ঘটনাটি সম্বন্ধে সে সময়ই জনগণ অবহিত থাকলে নিঃসন্দেহে অনেককে আর বিড়ম্বনায় পড়তে হতো না। সদনে বসবাসকারীদের পরিবারগুলো তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেখানে অথবা অন্যকোন সেবা সদনে[৮৭] তাদের ঘনিষ্টজনদের ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে পারতেন।

আরো দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, তথ্য অধিকার আইনে সেসময় আরেকটি সত্য উদ্ঘাটিত হয় যে, সরকার সেবা সদনে বসবাসকারীদের ওপর চরম অত্যাচারের বিষয়ে ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে অবগত হওয়া সত্ত্বেও এর দ্রুত প্রতিকারে অবহেলা করেছে। জানা যায়:

> প্রবীণ সেবা সংক্রান্ত বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত জুনিয়র মন্ত্রী আইভর ক্যালিলিকে প্রবীণ নিবাসের অন্যায় ও অন্যায্য আচরণ সম্বন্ধে অবহিত করার নথিপত্র বেরিয়ে আসে তথ্য অধিকার আইনে... ডাক্তারদের এ সম্পর্কিত ভাষ্য পাওয়া যায় যে, অত্যাচারিত প্রবীণ মহিলার মারাত্মক শারীরিক অসুস্থতা এবং ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে এবং ...তার ভাষায়, "আমার দেখা সবচেয়ে খারাপ নজির এটা"... ভদ্রমহিলা "মারাত্মকভাবে পানিশূন্য" হয়ে পড়েছিলেন।[৮৮]

লেস ক্রসের ঘটনা প্রচার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে আয়ারল্যান্ড সরকার এর প্রতিকারে একাধিক পন্থা অবলম্বন করে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মেরি হার্নে ঘটনাটিকে আখ্যা দেন 'অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়' হিসেবে এবং সকল সেবা সদন স্বতন্ত্র পরিদর্শন ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসার জন্য আইন প্রণয়নের আশ্বাস দেন।[৮৯] স্বাস্থ্য (সংশোধন) বিল ২০০৬ হিসাবে এ বিষয়ক আইনগত প্রস্তাবনাটি পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হয় এবং বর্তমানে সেখানেই বিবেচনাধীন রয়েছে তা।[৯০]

উন্নত বিশ্বে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোয় প্রবীণদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সিনিয়র সিটিজেনদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবায় ভর্তুকির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে এবং বার্ধক্য যেন দুর্বলতা ও দুর্বল স্বাস্থ্যের সঙ্গে তুলনীয় না হয়ে পড়ে, তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষ অতীতের চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগী। খাদ্য ও শরীরচর্চার বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে অনেক রাষ্ট্রই বর্তমানে স্বাস্থ্যকর এবং স্বাধীন জীবন যাপনে সক্রিয়ভাবে উৎসাহ প্রদান করছে। বৃহৎ এই জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি সরকারের আরো মনোযোগী এবং যত্নবান হওয়া উচিত। লেস ক্রসের অনিয়ম আয়ারল্যান্ডের জন্য এক অন্ধকার অধ্যায়।[৯১] তারপরও কেবল তথ্য স্বাধীনতার সুবাধেই ট্র্যাজিডিরূপী এই রহস্যের তথ্য উন্মোচিত হতে পেরেছে। বিশেষ করে প্রবীণদের মতো নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদানে যে বিপদের সৃষ্টি হতে পারে, সে ব্যাপারে সবার মনোযোগ

আকর্ষণ করে এই ঘটনা। রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব মনে করিয়ে দেয়া এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর শোষণ ও নির্যাতন প্রতিকারে রাষ্ট্রের তদারকি নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইনটি জরুরি।

আয়ারল্যান্ডের তথ্য অধিকার আইন ১৯৯৭

ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট[৯২] নামে পরিচিত আয়ারল্যান্ডের তথ্য অধিকার আইনটি অনুমোদিত হয় ১৯৯৭ সালে। তবে পরের বছর আইনটি কার্যকারিতা লাভ করে। এই আইনের ফলে যে কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন। এই আইনে প্রায় পাঁচশ' প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা দেয়া আছে, তার যে কোনোটিতে যে কোনো ব্যক্তি তথ্যের[৯৩] আবেদন করতে পারে। তবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এই আইনের আওতার বাইরেও রয়েছে।

ইউরোপিয় ইউনিয়নভুক্ত একমাত্র আয়ারল্যান্ডই তাদের পুলিশ বাহিনীর কার্যক্রম এই আইনের আওতামুক্ত রেখেছে। কিন্তু এই আইনের অধীনে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশকিছু বিষয়ে যেমন- কাঠামো, কার্যক্রম, দায়িত্ব, অভ্যন্তরীণ বিধি বিধান ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বউদ্যোগে তথ্য প্রদানের বিধান রয়েছে।

২০০৩ সালে উপরোক্ত আইনে সংশোধনীর মাধ্যমে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে তথ্য সরবরাহ স্থগিত এবং তথ্যের আবেদনের জন্য ফি ধার্য করা হয়। এসব সংশোধনীর ফলে স্বাভাবিকভাবেই তথ্যের আবেদন কমে যেতে থাকে এবং শতকরা প্রায় ৫০ শতাংশ কমে যায় তা।[৯৪]

ড্রাগ সংক্রান্ত তথ্যের অপর্যাপ্ততায় অস্ট্রেলিয়ার নারীদের স্বাস্থ্য অধিকার ক্ষুণ্ন

কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অস্ট্রেলিয়াই সর্বপ্রথম তথ্য অধিকার আইন পাস করে। বেলিজ, ত্রিনিদাদ ও টোবোগো, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, উগান্ডা প্রভৃতি দেশ তথ্য অধিকার আইন পাস করে নব্বইয়ের দশকে বা তারও পরে।[৯৫] অস্ট্রেলিয়ার আইনে বেশকিছু দুর্বলতা রয়ে গেছে। আইনটি সম্পর্কে উদ্বেগের এক বড় কারণ হচ্ছে, মোটা দাগে অনেক বিষয় এ আইনে তথ্য স্বাধীনতার আওতামুক্ত রেখে দেয়া হয়েছে। এ কারণে তথ্য সরবরাহে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। অথচ জনস্বার্থে এসব খাতের তথ্যই অনেক সময় উন্মুক্ত হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। এই বিধানের অসৎ ব্যবহারের মাধ্যমে কীভাবে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত হয়, এমন জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আটকে দেয়া যেতে পারে, তারই একটি নজির এখানে তুলে ধরা হলো:

হাল আমলে 'হারচেপটিন' নামে নতুন একটি ড্রাগ অস্ট্রেলিয়ায় বাজারজাত করা হয়। এই ওষুধ সেবনের ফলে ব্রেস্ট ক্যান্সার চিকিৎসাপ্রাপ্ত মহিলাদের অসুখটি পুনরাক্রমণের ঝুঁকি কমে যায় বলে কিছু ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়। জীবন বাঁচাতে আশাপ্রদ এই ওষুধটির দাম শুরুর দিকে বেশ চড়াই ছিল। ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত অনেক নারী, যারা ওষুধটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন দামের কারণে তারা নিরস্ত্র হয়েছেন প্রতিনিয়ত। তবে অস্ট্রেলিয়ার সরকারের একটি নীতিমালা রয়েছে যে, ফার্মাসিউটিক্যাল বেনিফিট স্কিমের (পিবিএস) আওতায় জরুরি প্রয়োজনীয় ড্রাগের দাম ভর্তুকির মাধ্যমে কিছু কম রাখা হয়।[৯৬] কিন্তু এক্ষেত্রে সরকার হারচেপটিনের দামে ভর্তুকি দিতে অস্বীকার করে। কেন এ রকম সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে, তা জানাতেও অস্বীকার করে সরকার।

ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত কয়েকজন নারীর একটি দল অস্ট্রেলিয়ার অবাধ তথ্য প্রবাহ আইনের আওতায় হারচেপটিন ওষুধের ক্ষেত্রে ভর্তুকি না দেয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চায়। সরকার তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় এবং দাবি করে যে, পদক্ষেপটি নেয়া হচ্ছে 'জনস্বার্থেই'।[৯৭]

জীবন রক্ষাকারী একটি ড্রাগ সম্পর্কে তথ্য প্রদানে সরকারের অস্বীকৃতি যে কোনো ভালো তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্যেরই পরিপন্থী। তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমেই কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের জনগণের কাছে জবাবদিহি করে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত ঘটনায় অনেক নারী অন্তত দুটি কারণে উপেক্ষিত বোধ করছিলেন, তারা সহজে প্রাপ্য, সুলভ এবং জীবনরক্ষায় সম্ভাবনাময় একটি ওষুধ থেকেই শুধু বঞ্চিত হলেন না; বরং তথ্য প্রদানে সরকারের অস্বীকৃতিতে তারা বুঝতেও পারলেন না সরকার কেন ভর্তুকি মূল্যে হারচেপটিন সরবরাহে আগ্রহী নয়। রাষ্ট্রকে নিয়মিত কর প্রদানকারী এই মহিলাদের জানার অধিকার ছিল তাদের প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ওষুধটিতে সরকার কেন ভর্তুকি প্রদানে রাজি হচ্ছে না। কিন্তু তথ্যের অভাবে সরকারের অস্বীকৃতির জবাবে নিজেদের সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো এদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। শুধু তা-ই নয়, তথ্য না পাওয়ায় বিষয়টির স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলারও কোনো অবস্থা থাকল না।

পরবর্তীকালে ২০০৬ সালের আগস্টে সরকার পিবিএস-এর আওতায় হারচেপটিন-এ ভর্তুকি প্রদানের ঘোষণা দেয়।[৯৮] কিন্তু তথ্য স্বাধীনতা আইনের আওতায় সরকারের দায়দায়িত্ব অস্বীকৃতির বিষয়টি অমীমাংসিতই রয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার শত শত নারীর জীবনে যে সিদ্ধান্তের প্রভাব রয়েছে, এমন একটি বিষয়ে তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি কীভাবে জনস্বার্থ সংরক্ষণে সহায়ক বিবেচিত হতে পারে? তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে মোটা দাগে যেসব ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়েছে, তা মন্ত্রীদের তথ্য গোপনের স্বীকৃতির মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধ্য অভ্যাসে পরিণত হতে পারে এবং অবাধ তথ্য স্বাধীনতাকে ঝুঁকির সম্মুখীন করে তুলতে পারে, এ ঘটনা তারই এক দৃষ্টান্ত। এই ঘটনাগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তথ্য অধিকার বিষয়ক সেরা আচরণবিধির

পরিপন্থী। সকল অবস্থায় জনস্বার্থ সংরক্ষণে জনমত নির্বাহী বিভাগের বিচার-বিবেচনার ঊর্ধ্বে স্থান পাওয়া উচিত।

স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার

সকলে যাতে সর্বোচ্চ মানের স্বাস্থ্যসেবা সহজে পায়– এটা মানুষের অধিকার। এই স্বীকৃতি বিশেষভাবে এসেছিল জাতিসঙ্ঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায়। এই সনদের অনুচ্ছেদ ২৫-এ এ সম্পর্কিত যে ঘোষণা রয়েছে, সেটিই আন্তর্জাতিক আইনগত সুরক্ষায় সংরক্ষিত করা হয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদের মাধ্যমে। সনদের এই অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপক্ষের জন্য দায়িত্ব হিসেবে "সকলের জন্য সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য"[৯৯]রক্ষার কথা বলা হয়েছে। এই অধিকার অর্জনে উপরোক্ত অনুচ্ছেদ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে রাষ্ট্রপক্ষের দায়বদ্ধতার নিশ্চয়তা বিধান করে। ১৯৭৮ সালে গৃহীত *আলমা আটা ডিক্লারেশন*-এ স্বাস্থ্যের গুরুত্বের আলোকে এটিকে মৌলিক মানবাধিকারের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।[১০০]

জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক কমিটি ২০০০ সালে স্বাস্থ্য অধিকারের পরিধি বিস্তৃত করে ঘোষণা দেয় : "কার্যকর জনস্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্যমূলক প্রতিষ্ঠান, পণ্য ও সেবা এবং পণ্য ও সেবা প্রদানের কর্মসূচি ...যথাযথ স্যানিটেশন সুবিধার নিশ্চয়তাসহ মানুষকে পেতে হবে।"[১০১] কমিটি আর্টিক্যাল ১২.১-এর আলোকে স্বাস্থ্য অধিকারের ব্যাখ্যা দিয়ে বলে যে, "এটা একটি সামগ্রিক অধিকার। যা শুধু তাৎক্ষণিক সময়োপযোগী চিকিৎসা প্রদানেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি স্বাস্থ্যের অন্যান্য নির্ণায়কের নিশ্চয়তা বিধানের সঙ্গে সংশি-ষ্ট। যেমন– নিরাপদ এবং পানযোগ্য পানির অধিকার, যথাযথ স্যানিটেশন সুবিধা, নিরাপদ খাবারের যথাযথ ব্যবস্থা, পুষ্টি ও গৃহায়ন... এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা ও খবরাখবর...।"[১০২]

অসহায়দের স্বার্থ সংরক্ষণ প্রশ্নে এসে স্বাস্থ্য অধিকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শিশু, গর্ভকালীন নারী এবং প্রবীণদের বেলায়, যাদের রোগাক্রান্ত অবস্থায় রয়েছে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা। ১৯৯১ সালে জাতিসঙ্ঘ 'প্রবীণদের জন্য করণীয়' বিষয়ক তার নীতিমালা প্রকাশ করে।[১০৩] এতে প্রবীণদের প্রয়োজন এবং অধিকার সন্নিবেশিত রয়েছে। এর অনুচ্ছেদ ১১-তে সুপারিশ করা হয়েছে, "প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবার এমন নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যেন তারা শারীরিক, মানসিক এবং আবেগগতভাবে সর্বোচ্চ সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারেন

অথবা সুস্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারেন এবং সেই সাথে রোগ ব্যাধির প্রতিকার, প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক নিতে সক্ষমতা লাভ করেন।”

আয়ারল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় যথাক্রমে আগস্ট ১৯৭৯ এবং মার্চ ১৯৭৬ সালে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ অনুসমর্থিত হয়। দুটি দেশই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা-এর সদস্য রাষ্ট্র।

জীবনের অধিকার

ইরানে সমকামীদের গণমৃত্যুদণ্ডের খবর ফাঁস হলো তথ্য অধিকারের প্রয়োগে

যৌন আচরণের ওপর ভিত্তি করে সমকামীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, তাদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, এমনকি তাদের বেঁচে থাকার অধিকারও অস্বীকার করা হয়ে থাকে। সমকামীদের জন্য বিশ্বের সাতটি দেশে এখনো মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে।[১০৪] তুচ্ছ অপরাধকে কেন্দ্র করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার অস্বীকার করার জন্য ইরান ইতিমধ্যে যথেষ্ট বদনাম কুড়িয়েছে। শুধু জঘন্য অপরাধের[১০৫] মৃত্যুদণ্ড প্রদান করার ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও ইরানে মৃত্যুদণ্ডের হার বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।[১০৬] "ইহজাগতিক দুর্নীতি"র মতো অস্পষ্ট শব্দের জালে ইরানে ফাঁসির সাজা কার্যকর করা হয়। অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে ইরানেই গত পাঁচ বছরে বেশিসংখ্যক তরুণকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে।[১০৭] কিছু দিন আগেও সমকামীতার কারণে দু'জন কিশোরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।[১০৮]

ইরানি পেনাল কোডের[১০৯] আওতায় সমকামিতা একটি ফৌজদারি অপরাধ এবং এতে সাজা হিসেবে আছে একাধিক বিষয়– বেত্রাঘাত থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন; এমনকি মৃত্যুদণ্ডেরও বিধান রয়েছে।[১১০] প্রকাশ্য জনসম্মুখে বিষয়টি অস্বীকার করা হলেও **১৯৭৯** থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় চার হাজার সমকামী নারী-পুরুষকে ইরানে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে বলে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা দাবি করেন।[১১১] এ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া পাশ কাটানোর লক্ষ্যে, সমকামিতার অভিযোগে দণ্ডিতদের প্রায়ই ধর্ষণ এবং হত্যা মামলার অভিযুক্ত বলে দাবি করা হয়ে থাকে।[১১২] এ বিষয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান এও দাবি করে রেখেছেন যে, ইরান রাষ্ট্রে একজনও সমকামী নেই।[১১৩]

এভাবে পুরো একটা জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব যখন অস্বীকার করা হলো, তখন ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য টাইমস্ যুক্তরাজ্যের তথ্য অধিকার আইনের আওতায়[১১৪] সে দেশটির 'ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস'-এ কিছু তথ্য পাওয়ার আবেদন করে। পত্রিকাটির তরফ থেকে ঐ সময়ে মে মাসে এসংক্রান্ত বিষয়ে ব্রিটেন ও ইরানি এমপিদের মধ্যে আন্তঃপার্লামেন্টারি ইউনিয়নের যে শান্তি আলোচনা হয়, তার বিবরণী চাওয়া হয়।

আইনটির অধীনে যে দলিল-দস্তাবেজ প্রচারের জন্য প্রকাশ করা হয়– তা ইরানে সমকামীদের অধিকার লঙ্ঘনের ভয়াবহ এক চিত্র তুলে ধরে। শুধু তা-ই নয়, সমকামীদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার বিষয়েও সাড়ম্বরেই তারা দায়িত্ব স্বীকার করছেন, এর পক্ষে বক্তব্য রাখছেন। ইরানের উচ্চপদস্থ এক রাজনীতিবিদ বৈঠক চলাকালে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, সমকামীদের

নির্যাতন করা উচিত এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান বাঞ্ছনীয়।[১১৫] তার বক্তব্যের রেকর্ড অনুযায়ী, "নারী এবং পুরুষের সমকামিতা ইসলামের বিধানবহির্ভূত", এবং তিনি দাবি করেন, "যারা প্রকাশ্যে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে, তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা উচিত" [প্রাথমিকভাবে নির্যাতনের কথা বললেও মত পাল্টে তিনি মৃত্যুদণ্ড প্রদানের কথা বলেন]। যুক্তি হিসেবে তিনি দাবি করেন, "সমকামিতা মানব সম্প্রদায়ের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। বংশ বৃদ্ধির ভেতর দিয়ে মানবজাতি বেঁচে থাকে। কিন্তু সমকামিতায় বংশবৃদ্ধি হয় না।"[১১৬] রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক সীমারেখার ঊর্ধ্বে উঠে অধিকার লঙ্ঘন এবং পক্ষপাতদুষ্টতা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা এ ঘটনা থেকে ফুটে ওঠে। যুক্তরাজ্যের প্রচার মাধ্যম এক দেশের তথ্য অধিকার আইন অন্য দেশে প্রয়োগ করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে চিত্র তুলে ধরল, তার সঠিক তথ্য সংশি-ষ্ট দেশ থেকে পাওয়া হয়তো দুষ্কর হতো অথবা আদৌ সম্ভবপর হতো কি না তা নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ।

সমকামীদের আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ইন্টারন্যাশনাল লেসবিয়ান অ্যান্ড গে অ্যাসোসিয়েটেড' (আইএলজিএ)-এর অন্যতম সহ-সাধারণ সম্পাদক ফিলিপ ব্রাউন এক বক্তব্যে বলেন, "একই লিঙ্গের কারো প্রতি ভালোবাসা এবং/অথবা ভালোলাগার কারণে মৃত্যুদণ্ড প্রদান... নিঃসন্দেহে বর্বোরোচিত, নিষ্ঠুর ও নির্মম।"

শুরুতেই উলে-খ করা হয়েছে যে, শুধু সমলিঙ্গের ভালোবাসার অভিযোগে সাতটি দেশে নরহত্যা সংগঠিত হয়। সে সকল দেশে জরুরি ভিত্তিতে এরূপ আইন সংশোধন এবং প্রাপ্তবয়স্ক সমকামীদের মৃত্যুদণ্ড বাতিলের দাবি জানায় আইএলজিএ।[১১৭]

ইরানে তথ্য অধিকার

ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানে সহজে তথ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনো আইন নেই। অনেক ধরনের তথ্য, বিশেষ করে ইসলাম অথবা রাষ্ট্রীয় নীতিমালা সংক্রান্ত সমালোচনামূলক তথ্য প্রকাশে এবং সম্প্রচারে ইরান সক্রিয়ভাবে বাধা প্রদান করে। এরূপ প্রকাশনাও জব্দ করা হয়। এসবের মাধ্যমে দেশটি ইতিমধ্যে কুখ্যাতি অর্জন করেছে। প্রকাশনা ও সম্প্রচার জগতে ইরানে কঠোর ভঙ্গিতে আনাড়ির মতো কাঁচি চালানো হয়। যে কারণে Tracy CheVallier-এর `Girl With a Pearl Earring' এবং William Faulkner-এর `As I Lay Dying.'-এর মতো অনেক মহৎ সাহিত্য নিষিদ্ধ করেছে ইরান।[১১৮] তথ্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিচালিত নির্যাতন আর দমনের শিকারে পরিণত হয়েছে সেখানকার প্রচার মাধ্যম– টেলিভিশন, রেডিও, চলচ্চিত্র, ইন্টারনেট এবং প্রকাশনা জগৎও।[১১৯]

জীবনের অধিকার

হিউম্যান রাইটস্ কমিটি, যা আইসিসিপিআর-এর চুক্তি তদারকির দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত, তারা জীবনের অধিকার বিষয়ে এক মন্তব্যে বলেছে, "এটি একটি পরম অধিকার, যার মর্যাদা, এমনকি জরুরি অবস্থায়ও ক্ষুণ্ন করা যাবে না।"[১২০] অন্য সমস্ত মানবাধিকারের প্রয়োজন গুণগতভাবে এক উন্নত জীবনযাপন করার জন্যই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জীবনের অধিকার সর্বাগ্রে। আর জীবনের অধিকারের মূল বিষয়ই হচ্ছে জীবনকে সুরক্ষিত রাখা। এই অধিকার অনুযায়ী রাষ্ট্রের ওপর তার নাগরিকদের হত্যা অথবা মৃত্যুর হুমকি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব বর্তায়। জীবনের হুমকি থেকে নাগরিকদের রক্ষাকল্পে রাষ্ট্রকে এমন সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে যে তাতে যেন পরিহারযোগ্য মৃত্যু থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা যায়।

জাতিসঙ্ঘের সর্বজনীন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক সনদ-এর[১২১] আর্টিক্যাল ৩-এ জীবনের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আইসিসিপিআর-এর আর্টিক্যাল ৬ অনুসারে[১২২] "প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিকভাবেই জীবনের অধিকার রয়েছে। এ অধিকার আইন দ্বারা অবশ্যই সংরক্ষিত হবে। স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে কাউকেই এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।"

১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে ইরান আইসিসিপিআর সনদ অনুসমর্থন।

জীবন এবং মৃত্যুতেও তথ্য অধিকার যখন ভূমিকা রাখে : সুনামি আক্রান্তদের বাধ্যতামূলক নাম ঘোষণায় আতঙ্কিত সুইডিশদের স্বস্তি

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ২০০৪ সালে ধেয়ে আসা সুনামির ধ্বংসযজ্ঞে হাজারো লোক এবং তাদের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নরওয়ে এবং ফিনল্যান্ডের মতো অনেক দেশের নাগরিকরা উপদ্রুত ও বিপর্যস্ত এলাকায় ওই সময় ছুটি কাটাতে এসেছিলেন। সুনামি ট্র্যাজেডিতে যারা হারিয়ে গেলেন বা যাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না, তাদের অনুসন্ধান এবং নাম প্রকাশে উদ্যোগী হয় ওইসব দেশ। এই তথ্য সরবরাহের ভিত্তিতে সরকারগুলো তাদের নাগরিকদের পরিবার ও প্রিয় স্বজনদের অবস্থাই শুধু জানল না; বরং হারিয়ে যাওয়া লোকজনের তালিকা থেকে অনেকের নাম বাদ দিতেও সংশি-ষ্ট বিভিন্ন বিভাগের সুবিধা হলো।

সুইডিশ মিডিয়া এজেন্সি 'টিডনিনঘারনাস টেলিগ্রামব্রা' (টিটি)[১২৩] সুনামিতে হারিয়ে যাওয়া বা মৃত বলে ধারণাকৃত সুইডিশদের অবস্থান নির্ণয় এবং তাদের নাম প্রকাশের স্বার্থে সুইডিশ পুলিশের কাছে ওইদিন উপদ্রুত এলাকায় উপস্থিত সে দেশের নাগরিকদের নামের তালিকার জন্য অনুরোধ জানায়।[১২৪]

১৭৬৬ সালে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে সুইডেন।[১২৫] কিন্তু সুনামিতে হারিয়ে যাওয়া লোকজনের নাম প্রকাশ হয়ে পড়লে তাদের স্বজনদের প্রতি সমাজের অনাকাঙ্ক্ষিত মনোযোগ বাড়বে এই অজুহাতে পুলিশ উপরোক্ত মিডিয়া এজেন্সির অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহে প্রথমে অস্বীকৃতি জানায়।[১২৬]

এরপর ওই এজেন্সি (টিটি) তথ্য প্রদানের আবেদন জানিয়ে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কোর্টের হস্তক্ষেপ কামনা করে। তথ্য প্রদানের আদেশ দিয়ে আদালত তার পর্যালোচনায় উলে-খ করে : যে সকল সুইডিশ নাগরিক সে সময় রিসোর্টে ছুটি কাটাচ্ছিলেন, তাদের সম্বন্ধে তথ্য প্রদান, আবেদনের সময়ের প্রেক্ষাপটে তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার শামিল হবে না। তথ্য প্রদানের আদেশ জারির পর সুইডিশ পুলিশ হারিয়ে যাওয়া ৫৬৫ জনের নাম প্রকাশ করতে বাধ্য হয়।[১২৭] পরবর্তীকালে এ সকল তথ্য সংবাদপত্র ও বিভিন্ন ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়। এতকিছুর পরও "সংরক্ষিত পরিচয়"-এর অজুহাতে ছয়টি নাম প্রকাশে অস্বীকার করা হয়।[১২৮]

সুনামি ক্ষতিগ্রস্ত রিসোর্টগুলোতে মৃত ট্যুরিস্টদের ভেতর সুইডিশদের সংখ্যাই ছিল বেশি। এত বড় জাতীয় ট্র্যাজেডি হওয়া সত্ত্বেও কোর্টের হস্তক্ষেপে সুইডিশ পুলিশের আচরণ শুধরে দেয়ার আগে তারা অস্বাভাবিকভাবে তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। এই মোকদ্দমা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য মানবাধিকারের মতোই তথ্য অধিকারও চূড়ান্ত কিছু নয়। অন্যান্য অনেক অধিকারের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করেই এ অধিকার চর্চা করতে হবে। যেমন, তথ্য অধিকার চর্চা করতে গিয়ে অনেক সময়ই ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আইনের সঙ্গে আপস করতে হয়। এ ঘটনা থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, কখনো কখনো ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণ এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবাধ তথ্যপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতার প্রয়োজন রয়েছে। আর এটাই ছিল সুইডিশ পুলিশের যুক্তি। কিন্তু এক্ষেত্রে জনগণের তাদের নিকটজন সম্পর্কে জানার অধিকার ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারের ওপর প্রাধান্য লাভ করে।

সুইডেনের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার আইন

তথ্য স্বাধীনতার লক্ষ্যে বিশ্বে প্রথম আইন সুইডেনেই পাস হয়। ১৭৬৬ সালে দেশটিতে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার আইন পাস করা হয়। দুটি অধ্যায় এবং ১৫টি অনুচ্ছেদে বিন্যাস্ত এই আইনে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার বিধান বর্ণিত হয়েছে। এই আইনের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট অথবা প্রাপ্ত দলিল দস্তাবেজে সুইডিশ জনগণের অবাধ তথ্য অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এই আইনের অধীনে সরকারি কর্মকর্তাদের নিজ ক্ষমতা ও আয়ত্তের মধ্যে স্বর্বস্ব নিয়োগ করে জনগণের তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনে সাড়া দেয়ার জন্য শর্তারোপ করা রয়েছে। সকল ধরনের সরকারি দলিল-দস্তাবেজে জনগণের জানার অধিকার স্বীকৃত হলেও আর্টিক্যাল ২-এর আওতায় কিছু তথ্য প্রদানে ছাড় দেয়া হয়েছে। এই ছাড়কে বিশেষ আইনের আওতায় (যেমন গোপনীয়তা আইন) তথ্য অধিকার সীমিতকরণ হিসেবেও বিবেচনা করা যায়।

যখন কোনো সরকারি কর্মকর্তা কোনো সরকারি নথি উন্মুক্তকরণে অস্বীকৃতি জানান, তখন সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণভাবে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে আপিল করার বিধান রয়েছে। এরপর বিষয়টি নিস্পত্তি না হলে সাধারণ প্রশাসনিক আদালত এবং সবশেষে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই আইনে সংসদীয় ন্যায়পালের কাছে অভিযোগ করার বিধানও রয়েছে।

সমতার অধিকার, বর্ণগত বৈষম্য ও তথ্য অধিকার

পুলিশের বর্ণবাদী বৈষম্যের রেকর্ডকৃত কথোপকথন প্রকাশ হয়ে পড়ায় অসাম্য নিরসনে কানাডা সরকারের উদ্যোগ

একটি সামরিক ঘাঁটি তৈরির উদ্দেশ্যে কানাডার প্রতিরক্ষা বিভাগ ১৯৪২ সালে 'স্টনি পয়েন্ট রিজার্ভ'[১২৯] নামে সে দেশের আদিবাসীদের (ফাস্ট নেশন) একটি অভয়ারণ্য অধিগ্রহণ করে নেয়।[১৩০] বলপূর্বক বেদখল হয়ে পড়া নিজ ভূমি ফিরে পাওয়ার জন্য ওই আদিবাসীরা (ফাস্ট নেশন) তখন সংগ্রাম শুরু করে। ফলে তাদের যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় এবং কোনো এক সময় বিবাদিত ভূমি ফিরিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়।

প্রতিরক্ষা বিভাগের ঠুনকো আশ্বাসে ক্লান্ত 'স্টনি পয়েন্ট'-এর মানুষজন ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে আইপারওয়াশ প্রাদেশিক পার্কে এক শান্তিপূর্ণ, অহিংস বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। পার্কটিতে ছিল তাদের জনগোষ্ঠীর একটি প্রাচীন কবরস্থান। তারা এই পবিত্র এলাকাটিকে আরো ধ্বংস ও কলুষতা থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল।

শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের এই পার্ক থেকে সরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ৬ সেপ্টেম্বর (১৯৯৫) রাতে ওনটারিও প্রাদেশিক পুলিশের সশস্ত্র দল এলাকাটিতে অবস্থান গ্রহণ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লে ডাডলে জর্জ নামে নিরস্ত্র এক বিক্ষোভকারী মারা যান। ওনটারিও পুলিশ পুরো ঘটনার ভিডিওচিত্র ধারণ করে।[১৩১]

এ সময় কানাডার ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল দল বিষয়টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তে অস্বীকৃতি জানালে ধারণা করা হয়, এই রাতের ঘটনাটি হয়তো অনির্দিষ্টকালের জন্য চাপা পড়ে যাবে। যাহোক, কানাডার তথ্য অধিকার আইন ১৯৮৩[১৩২] কাজে এলো এ সময়। এই আইনের মাধ্যমে বেরিয়ে এলো ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ অথচ উদ্বেগজনক সমস্ত বিবরণ। ওনটারিও প্রাদেশিক পুলিশের সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের পার্ক থেকে সরিয়ে আনার জন্য যে উস্কানিমূলক এবং জাতিগত বিদ্বেষপূর্ণ ভাষায় গালিগালাজ করছিল ভিডিওচিত্রে তা-ই প্রকাশিত হয়ে পড়ল।[১৩৩]

ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের তৈরি ভিডিও টেইপের কপি সংগ্রহের জন্য কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বা সিবিসি ২০০৪ সালে তথ্য অধিকার আইনের সাহায্য গ্রহণ করে। যদিও ক্যামেরার লেন্সে প্রতিবন্ধকতা ছিল, তবুও ঘটনার সময়ের কথোপকথন এবং আওয়াজ এতে রেকর্ড হয়ে যায়। অবস্থান ধর্মঘট থেকে সরতে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে পুলিশের গালাগালি এবং জাতিগত বিদ্বেষমূলক অপমানকর আচরণের সাক্ষ্য বহনকারী এই ভিডিও টেইপ পুলিশ বাহিনীর[১৩৪] উস্কানিমূলক চরম বর্ণবাদী বৈষম্যমূলক ব্যবহারের সংস্কৃতি উন্মোচন করে দেয়।

ভিডিও টেইপের বিষয় জনসম্মুখে উন্মোচিত হওয়ার পরই ওনটারিও প্রাদেশিক পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন জনগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ওই রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করে। ডাডলে জর্জকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত সার্জেন্ট-এর দায়িত্বে গুরুতর অবহেলা এবং মৃত্যুর জন্য তার দায়িত্ব প্রমাণিত হওয়া মাত্র তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।[১৩৫]

নতুন নির্বাচিত ওনটারিও প্রাদেশিক সরকারও পুরো ঘটনা তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করে। স্থানীয়ভাবে সম্মানিত ব্যক্তি সিডনে বি. লিনডেন তদন্ত দলের প্রধান নির্বাচিত হন। তিনি তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য ২০০৭ সালের মে মাসে জনসম্মুখে প্রকাশ করেন। আইপারওয়াশ ট্র্যাজেডির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা–[১৩৬] এমনতর ঘোষণাই দেন সিডনে বি. লিনডেন। ডাডলে জর্জের মৃত্যুর ভেতর দিয়ে পুলিশ বাহিনীতেও যে জাতিগত বিদ্বেষের গভীরতর সংস্কৃতি প্রোথিত রয়েছে, তা-ই বেরিয়ে এসেছে। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য কমিশন সরকারকে কিছু সুপারিশ করে।

দেশের ইতিহাস এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে শিক্ষার অভাব বর্ণগত উত্তেজনার অন্যতম কারণ হিসেবে কমিশন মন্তব্য করে। আদিবাসী বা ফাস্ট নেশন সম্প্রদায়ের সঙ্গে কানাডার সরকারের সম্পাদিত চুক্তির প্রতি দায়বদ্ধতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সংবলিত শিক্ষাসূচি প্রণয়নের জন্যও তদন্ত কমিটি তার সুপারিশে উলে-খ করে।[১৩৭] আদিবাসীদের বিষয়গুলোকে যথাযথ প্রাধান্য দিয়ে মনোযোগের কেন্দ্রে নিয়ে আসার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টির জন্য কমিশন সুপারিশ করে।[১৩৮] কমিশন এও বলে যে, অতীতে সম্পাদিত চুক্তিগুলোর আলোকে আদিবাসী (ফাস্ট নেশন) জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে স্থির করে নিতে হবে ওন্টারিওর কোনো এলাকায় তাদের অধিকার প্রমাণিত বা কোনো এলাকার ওপর তারা অধিকার দাবি করছে।[১৩৯]

আইপারওয়াশ তদন্ত কমিটি কানাডার বর্ণগত বৈষম্য এবং এ বিষয়ক টানাপোড়ন বিশে-ষণ করে এর সমাধানে কোথা থেকে কাজ শুরু করতে হবে সে রাস্তাও খুলে দেয়। এ ধরনের পরিবর্তন সাধনের জন্য সরকারের শাসন সংক্রান্ত ত্রুটিগুলো সম্বন্ধে জনগণের জানার অধিকারের স্বীকৃতি ও তথ্য প্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদান ভীষণ জরুরি। শাসন প্রক্রিয়ায় অদৃশ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা সৃষ্টি করা গেলে তা জনমানসে বঞ্চনাবোধ পরিসমাপ্তিতেও ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর একাংশের প্রতি পুলিশ বিভাগের বদ্ধমূল প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য ছিল। এসব বৈষম্যকে দৃশ্যমান করা গেলেই বঞ্চনাবোধ নির্মূল হয়। উপরোক্ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কানাডার তথ্য অধিকার আইন বৈষম্যগুলো তুলে ধরে প্রমাণাদি জনসম্মুখে হাজির করে পরিবর্তনের মুখ্য চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

কানাডার তথ্য অধিকার আইন ১৯৮৩

কানাডীয় ফেডারেল সরকার ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইন[১৪০] চালু করে। তখন থেকেই কোর্টগুলো আইনটিকে 'দৃশ্যত সাংবিধানিক' মর্যাদা দিয়ে আসছে। এই আইনের অধীনে কানাডীয় নাগরিক এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার স্বীকৃত। সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য পনের দিনের মধ্যে জনগণের আবেদনের জবাব দেয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই আইন সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, সরকারি তথ্যের ওপর জনগণের অধিকার স্বীকৃত এবং এর ব্যত্যয় ন্যূনতম মাত্রায় সীমিত রাখতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, মোটা দাগে এতে একাধিক কারণে তথ্য আটকে দেয়ার বিধানও রয়েছে। আবার বিভিন্ন বিধানের কারণে আইনটি ইতিমধ্যে প্রশংসাও কুড়িয়েছে। তথ্য উদ্ঘাটনকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে এতে বিস্তারিত যে বিধান রয়েছে, তা অন্যান্য তথ্য অধিকার আইনে নেই বললেই চলে।[১৪১] আইনটি না মানা, আবেদনের জবাবে ধীরগতি এবং অতিরিক্ত ফি গ্রহণের অভিযোগে কানাডার সরকার সমালোচিত হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে আইনটির বিভিন্ন পর্যালোচনা, সুপারিশ এবং সংশোধন চেষ্টা হলেও এর বেশিরভাগই এতদিন ধরে হয়েছে উপেক্ষিত।[১৪২] উলে-খ্য, জানার অধিকার বিষয়ে কানাডার সকল প্রদেশেরই নিজস্ব আইন রয়েছে।

জাতিগত বৈষম্যমুক্ত পরিবেশে বাঁচার অধিকার

কোনো রকমের জাতিগত বৈষম্য ছাড়া বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইহুদি, পোলিশ, জিপসি এবং অন্যান্য জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তারই ফলে রচিত হয় সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা। এতে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া হয়, "জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে এরা সকলেই সমান।" এ ঘোষণায় উলি-খিত "সকল স্বাধীনতা ও অধিকার কোনো ধরনের জাতিগত বিভেদবৈষম্য ছাড়াই সকলের প্রাপ্য।"[১৪৩] আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদের ভূমিকায়ও জাতিগত সাম্যের মূলনীতি তুলে ধরে বলা হয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক মানবাধিকার "যে কোনো ধরনের বৈষম্য, যেমন- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো মতামত, জাতীয়তা অথবা সামাজিক পরিচয়"-এর ঊর্ধ্বে থেকে নিশ্চিত করা হবে।[১৪৪]

দক্ষিণ আফ্রিকার তদানীন্তন বর্ণবাদী সরকারের কারণে বিশ্বব্যাপী যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়, তারই ফলে ১৯৬৫ সালে জন্মলাভ করে সকল ধরনের জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণের আন্তর্জাতিক কনভেনশন (আইসিইআরডি)।[১৪৫] জাতিগত বৈষম্য এবং সেকেলে রীতি-নীতির বিরুদ্ধে এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক হাতিয়ার, যা মেনে চলার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কনভেনশনে 'বৈষম্য' সংজ্ঞায়িত হয়েছে এভাবে- "জাতি, বর্ণ, বংশ বা জাতীয়তা বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা জনজীবনের অন্য কোনো ক্ষেত্রে বর্জন, নিষেধাজ্ঞা বা আনুকূল্য, উদ্দেশ্যমূলকভাবে যা সাম্যের ভিত্তি, মানবাধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে অকার্যকর বা ক্ষতি সাধন করে।"[১৪৬] যে সকল আইন জাতিগত বৈষম্যকে শক্তি জুগিয়ে চলেছে রাষ্ট্রপক্ষ, সেগুলোর পুনর্মূল্যায়ন করতে বাধ্য থাকবে। কোনো ব্যক্তিবিশেষ, জনগোষ্ঠী অথবা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যেন জাতিগত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

কানাডা ১৯৭০ সালের নভেম্বরে জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণের আন্তর্জাতিক কনভেনশন (আইসিইআরডি) অনুসমর্থন করে এবং ১৯৭৬ সালের মে মাসে আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

ধর্মচর্চার অধিকার

গ্রিসের ন্যায়পালের প্রতিবেদন : তথ্যের অপ্রাপ্তি সংখ্যালঘু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিপীড়ন তীব্র করে

প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দমতো ধর্মচর্চার অধিকার রয়েছে এবং রাষ্ট্রই সেই অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে– এই বলে গ্রিক সংবিধান তার জনগণের ধর্ম চর্চার স্বাধীনতাকে মৌলিক মানবাধিকারের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।[১৪৭] তবে ধর্ম চর্চার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা আর বাস্তবতার যে বিরোধ ইতিহাসে তার বহু সাক্ষ্য রয়েছে। গ্রিসের এক কোটি নাগরিকের ৯৫.২ শতাংশই হচ্ছেন গ্রিক অর্থডক্স খ্রিস্টান[১৪৮] সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাদের ওপর রয়েছে চার্চের যথেষ্ট প্রভাব, সাংবিধানিকভাবে এটাই গ্রিসে[১৪৯] বিরাজমান ধর্মমত হিসেবে স্বীকৃত। শিক্ষা ও ধর্ম মন্ত্রণালয় সেখানে যাজকদের বেতন ভাতা প্রদান এবং চার্চ ভবনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের খরচপাতি বহন করে।[১৫০] ঐতিহাসিকভাবেই গ্রিক অর্থডক্স চার্চ নতুন এবং সংখ্যালঘু ধর্মগুলোর প্রচার এবং প্রসারে অনীহা প্রকাশ করে আসছে। এটা অজানা নয় যে, চার্চের প্রাধান্য রক্ষার্থে সরকারও অন্যান্য ধর্মমতের চর্চায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

ইলিনেইজ (Ellinais) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ২০০৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা। তবে প্রাচীনত্বের দিক থেকে এরূপ বিশ্বাসীদের অবস্থান গ্রিক পৌরাণিক কাহিনীর ইতিহাসের প্রায় সমান।[১৫১] এই ধর্মমতের অনুসারীরা প্রাচীন গ্রিক দেব দেবীর পূজা-অর্চনা করেন এবং বিশ্ব শান্তি এবং পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা[১৫২] তাদের বিশ্বাসের এক বড় স্থান দখল করে আছে। গ্রিসের অর্থডক্স চার্চ এই ইলিনেইজ মতালম্বীদের 'পৌত্তলিক' আখ্যা দিয়ে জনসম্মুখে হেনস্থা করে এবং সরকারও তাতে মদদ জুগিয়েছে।[১৫৩] ২০০৬ সালে আদালতের লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে ইলিনেইজ নিজেদের একটি ধর্মীয় গ্রুপ[১৫৪] হিসাবে সরকারের স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। এতকিছুর পরও সরকার এই বিশ্বাসীদের সাংবিধানিক অধিকার অস্বীকার করতে থাকে। তাদের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠারও অনুমতি দেয়নি সরকার। ফলে এই ধর্মের অনুসারীদের কোনো উন্মুক্ত স্থানে বৈধভাবে উপাসনা বা উৎসব উদযাপনের সুযোগ নেই।

২০০১ সাল পর্যন্ত অর্থডক্স খ্রিস্টান, ইসলাম ও জুদাইজম-ই গ্রিসে সরকারিভাবে স্বীকৃত ধর্ম এবং এসব মতাবলম্বীদেরই কেবল রয়েছে আইনের চোখে বৈধতা। এর মানে আইনের আওতায়[১৫৫] এদেরই শুধু রয়েছে পূর্ণ স্বীকৃতি ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা। গ্রিক আইনে উপাসনালয় খোলার আগে শিক্ষা ও ধর্ম মন্ত্রণলয় থেকে 'উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা বিষয়ক অনুমোদন'-এর প্রয়োজন। অর্থডক্স চার্চের বিশপের সুপারিশ থাকলেই কেবল সরকার এরূপ অনুমোদন দিয়ে থাকে এবং অনুমোদনহীন[১৫৬] উপাসনালয় চালানোর জন্য দায়ী সকল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সরকারের রয়েছে।

২০০১ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সরকার গ্রিক জনগণকে অতীতের চেয়ে অধিক মাত্রায় তথ্য অধিকার প্রদান করে।[১৫৭] নতুন সংশোধনী জনগণের তথ্য অধিকারকে আরো মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ যেমন- জাতীয় নিরাপত্তা, অপরাধ দমন, মানবাধিকার সংরক্ষণ অথবা তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে এই আইনে কিছু বিধিবদ্ধ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে কোনো তদন্ত অথবা পর্যাপ্ত তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতিতে রাষ্ট্রীয় ন্যায়পালের দফতর এই আইনের বাস্তবায়নে জনগণকে সহায়তায় সক্রিয় ভূমিকা পালনের এখতিয়ার রাখে।[১৫৮]

২০০৬ সালে পার্লামেন্টে প্রদত্ত বার্ষিক প্রতিবেদনে ন্যায়পালের দফতর ২০০৫ সালে গৃহীত অভিযোগগুলো নিয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয় তথ্যপ্রাপ্তিতে কী কী ধরনের সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।[১৫৯] প্রতিবেদনে বিশেষভাবে ঠাঁই মিলেছিল সেসব ক্ষেত্রের তথ্যপ্রাপ্তির সমস্যার কথা, যেখানে সংখ্যালঘুদের বিশ্বাসের স্বাধীনতা সংক্রান্ত অভিযোগ ছিল। ন্যায়পাল দেখিয়েছিলেন, কীভাবে রাষ্ট্রীয় জনসমাজে সাধারণ তথ্যের অপর্যাপ্ততায় ভিন্নমতাবলম্বী সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর দমন-পীড়ন বেড়ে যায়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ন্যায়পাল দেখিয়েছেন, উপাসনালয় তৈরির বিষয়, ধর্মীয় শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারি নীতির বিষয় এবং স্কুলে অর্থডক্সদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং দীক্ষা উৎসব সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা রয়েছে।[১৬০] এ বাস্তবতাতেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক মনে হতে পারে এমন সকল বিষয় থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে ন্যায়পাল সরকারকে তার সুপারিশ পেশ করেন। ন্যায়পালের মতামতে জোর দিয়েই বলা হয় যে, অর্থডক্স চার্চ ব্যতীত অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কেও চার্চের সমমর্যদা ও স্বীকৃতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।[১৬১] ন্যায়পালের সুপারিশ সরকারের মেনে চলার বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সরকারের মতামত তৈরি এবং কর্মকাণ্ডে এর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। জনগণের পক্ষে যে সকল বিয়য় নিয়ে অতীতে ন্যায়পালের কার্যালয় থেকে সুপারিশমালা তৈরি করা হয়েছিল, তার অনেকগুলার আলোকে সরকার তার নতুন নীতিমালা তৈরি এবং আইন প্রণয়ন করেছে।[১৬২] গ্রিক সংবিধান সংশোধনকালে জনগণের জানার অধিকার আগের তুলনায় অনেক বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সে সময় জনগণের তথ্য অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগ ও এর তদন্তের দায়-ভার বর্তানো হয় ন্যায়পালের দফতরের ওপর। ফলে যে সকল সংখ্যালঘু ধর্মমতাবলম্বী এতদিন নিষ্পেষিত হচ্ছিলো তারা সকলেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ এবং তাদের জানার অধিকার লঙ্ঘন ও ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘনের বিষয়গুলো জনসম্মুখে নিয়ে আসার সুযোগ পেয়েছেন।

এই ঘটনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, তথ্য অধিকারের নিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে কীভাবে অন্যান্য অধিকারও সংরক্ষিত হয়। এই ক্ষেত্রে তথ্য অধিকারের স্বাধীনতার মাধ্যমে

এমন একটি সম্মিলিত আবহ তৈরি হলো, যেখানে অভাব-অভিযোগ সমাধানের আলোচনার দুয়ার হলো উন্মোচিত এবং গ্রিসের ধর্মীয় স্বাধীনতায় এলো এক নতুন মাত্রা।

গ্রিসের প্রশাসনিক কার্যবিধি, ১৯৯৯

গ্রিসের সংবিধানের ৫(ক) ধারায় বলা আছে, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য।[১৬৩] এই অনুচ্ছেদ জনগণকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতাও রাষ্ট্রের ওপর আরোপ করেছে। তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত উপরোক্ত সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রশাসনিক কার্যবিধি ১৯৯৯ দ্বারাও সমর্থিত।[১৬৪] গ্রিসের প্রশাসনিক কার্যবিধিও সরকারি দলিল দস্তাবেজে জনগণের অধিকারের সুযোগ করে দেয়। এমনকি উপরোক্ত কার্যবিধি অনুসারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্রেও জনগণের জানার অধিকার স্বীকৃত, যদি তাতে কোনো নাগরিকের আইনসম্মত এবং বিশেষ কোনো স্বার্থ সংশি-ষ্ট থাকে।

এই কার্যবিধি অনুসারে মোটা দাগের একটি তালিকাও রয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে তথ্য দেয়া যাবে না বা তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারে ছাড় দেয়া হয়েছে বা গোপনীয়তার বিধান রাখা হয়েছে। তবে তথ্য অধিকারের বাইরে কী কী বিষয় থাকবে, তা " আইন দ্বারা *গোপনীয়* হিসেবে সংজ্ঞায়িত রয়েছে।"

অধিকার হিসেবে ধর্মীয় স্বাধীনতা

পছন্দমতো ধর্ম গ্রহণ এবং ধর্মপালনে ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার[১৬৫] ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে, যা আবার আন্তর্জাতিক নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার সনদের ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদ দ্বারাও সুরক্ষিত। ধর্মের স্বাধীনতাকে উপরোক্ত দুটি মানবাধিকার হাতিয়ারই চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার আলোকে বিচার করেছে। এ প্রসঙ্গে নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার সনদে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা রয়েছে। এটা তার অধিকার। স্বীয় ধর্ম পালন বা নতুন ধর্ম গ্রহণ অথবা পছন্দের বিশ্বাসে দীক্ষা নেয়া, একাকী কিংবা সংঘবদ্ধভাবে, জনসম্মুখে বা ব্যক্তিগতভাবে, স্বাধীনভাবে উপাসনার মাধ্যমে তার ধর্মমত পালন, প্রদর্শন, চর্চা এবং শিক্ষার বিষয়ও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।"[১৬৬] "স্বীয় ধর্ম পালন, অথবা নতুন ধর্ম গ্রহণ বা পছন্দের মতবাদের স্বাধীনতাকে দমন পীড়নের মাধ্যমে খর্ব করা যাবে না" বলেও আলোচ্য সনদ বেশ জোরের সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে।

পছন্দের ধর্ম গ্রহণ এবং পালনের কারণে অনেকেরই বৈষম্য ও যন্ত্রণা ভোগের অভিজ্ঞতা রয়েছে। যে সকল দেশে ধর্মীয় বিশ্বাস বা মতবাদের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মতবাদ ও কাঠামো আবর্তিত হয় সে সকল জায়গায়, বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকেই।

ধর্ম বা বিশ্বাসের কারণে সৃষ্ট সকল ধরনের অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে জাতিসঙ্ঘের যে ঘোষণা রয়েছে (UN Declaration on the Elemination of All From of Intolerence and Discrimination Based on Religion and Belief), সেখানেও ধর্ম ও বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণে সৃষ্টি বৈষম্য দূরীকরণে কিছু আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বেঁধে দেয়া আছে।[১৬৭] বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় স্বাধীনতার অবস্থা পরখ করার জন্য জাতিসঙ্ঘের পক্ষ থেকে বিশেষ র‍্যাপোটিয়ারও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৭ সালের মে মাসে গ্রিস আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ (ICCPR)-এ সম্মতি জ্ঞাপন করে।

নির্যাতন থেকে মুক্তির অধিকার

নীরবতাও অনেক সময় নির্যাতন উসকে দিতে পারে : আর্ন্তজাতিক চাপের মুখে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ডিটেনশন ক্যাম্প সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জঙ্গিরা কয়েকটি বেসামরিক বিমান ছিনতাই করে আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা করলে প্রায় তিন হাজার মানুষ ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায়। হামলার পর তাৎক্ষণিকভাবে আমেরিকার তখনকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবি-উ বুশ দুনিয়াব্যাপী 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর ঘোষণা দেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিকে 'অসাধারণ অবস্থা'র দোহাই দিয়ে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' অংশ হিসেবে জঙ্গি তৎপরতায় সংশি-ষ্টতা সন্দেহে বা অভিযোগে যে কোনো ব্যক্তিকে আমেরিকার অভ্যন্তরে অথবা বাইরে আটক করে বলপূর্বকভাবে অজানা ঠিকানায় স্থানান্তর কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ সময় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গোপনে গড়ে তোলা হয় অভিযুক্ত সন্ত্রাসীদের জন্য নির্যাতন কেন্দ্র। এই প্রক্রিয়ায় অধুনা বহুল আলোচিত কিউবার 'গুয়ানতানামো বে' ক্যাম্পসহ যে কেন্দ্রগুলো গড়ে তোলা হয়, সে সম্পর্কে মাত্র কয়েক বছর আগ পর্যন্ত কিছুই জানত না মানুষ।

একই বিষয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ২০০১ সালে এক সামরিক ফরমান জারি করেন। যে ফরমানের বিষয়বস্তু হলো, সন্ত্রাসী সন্দেহে আটককৃত কোনো ব্যক্তি অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাম্পে বিনা বিচারে আটক থাকতে পারবে এবং আটককালে এসব বন্দিদের অভ্যন্তরীণ, বিদেশি অথবা আর্ন্তজাতিক আদালতে আইনগত সহায়তার অধিকার থাকবে না। শুধু সামরিক কমিশন গঠন করে তাদের বিচারের বিধান রাখা হয়।[১৬৯] ২০০২ সালে মার্কিন বিচার বিভাগ এক স্মারকপত্রের মাধ্যমে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে জানিয়েছিল, উপরোক্ত রাষ্ট্রীয় আদেশের কারণে তদন্তকারীদের কর্মকাণ্ড 'নির্যাতন' হিসেবে সরকারিভাবে স্বীকৃত হওয়ার আগেই তাদের হাতে আটককৃতদের চরম যন্ত্রণার শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট তদন্তকারীদের বন্দিদের প্রতি নির্দয়, মর্যাদা হানিকর এবং অমানবিক আচরণের "উলে-খযোগ্য পরিমাণে" অনুমোদন দিয়ে থাকতে পারেন যা নির্যাতন হিসাবে গণ্য হবে না বলে ঐ স্মারকপত্রে দুঃখের সঙ্গে সতর্ক করে দেয়া হয়।[১৭০]

বলা বাহুল্য, বন্দিশিবিরের বাসিন্দাদের প্রতি আচরণ এবং তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা সংক্রান্ত খবরাখবর বিষয়ে মার্কিন সরকারের এরূপ গোপনীয়তার নীতি দেশটির সরকারি প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত স্বচ্ছতার ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। মার্কিন ফেডারেল সরকারের ১৯৬৬ সালের তথ্য অধিকার আইনের আওতায় যে কোনো ব্যক্তির ফেডারেল সরকারের যে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্যের আবেদনের সুযোগ রয়েছে।[১৭১] দেশটির অঙ্গরাজ্য গুলোতেও জনগণের তথ্য অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে আইন পাস করা হয়েছে এবং এতে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া জনগণের বিচার - বিশে-ষণের

আওতাধীন রাখা হয়েছে। কিন্তু 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' জনগণের তথ্য অধিকার খর্ব করে দেয়। জাতীয় নিরাপত্তার[১৭২] অজুহাতে মার্কিন সরকার অনেক তথ্যই জনগণের কাছে থেকে আড়াল করে। ক্যাম্পে আটককৃতদের সম্পর্কে তথ্যও 'জাতীয় নিরাপত্তা'র পর্যায়ভুক্ত বিধায় ক্যাম্পের অবস্থা এবং কোথায় এসব ক্যাম্প রয়েছে, সে সংক্রান্ত সঠিক তথ্য পাওয়া অসম্ভব না হলেও মুশকিল হয়ে পড়ে। নিষেধাজ্ঞার কারণে ক্যাম্পে আটককৃতদের নাম পর্যন্ত উদ্ধার করা যাচ্ছিল না।

গুয়ানতানামো ডিটেনশন সেন্টারে দুই বছর অতিবাহিত করার পর শফিক রসুল, রুহুল আহমেদ এবং আসিফ ইকবাল নামে তিনজন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত নাগরিককে ২০০৪ সালে কোনো প্রকার অভিযোগ গঠন ছাড়াই মুক্তি দেয়া হয়। দুই বছরে তাদের প্রায় দুইশ' দফায় জিজ্ঞাসাবাদ এবং অগণিতবার নির্যাতনের শিকার হতে হয়। মুক্তির পর তারা তাদের বন্দি জীবন প্রথম অংশ পাকিস্তানে এবং পরবর্তীকালে গুয়ানতানামো বে-তে অবস্থানকালে যে লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তারই বর্ণনা দেন। তাদের অভিজ্ঞতায় এও ছিল যে, শ্বাসরুদ্ধকর একটি কনটেইনারে দুইশ'রও অধিক অন্য বন্দিদের সঙ্গে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল তাদের। সেই নির্যাতন সহ্য করে মাত্র ৩০ জন বন্দি বেঁচেছিলেন। মেশিনগানের গুলিতে কনটেইনারে যে ছিদ্র তৈরি হয়, তা দিয়ে তারা কোনো রকম শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে সক্ষম হন। তাদের জেরার সময় প্রায় ৮ ঘণ্টা ধরে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো, রক্ষীরা তখন শরীরে চড়ে বসে মাথায় বন্দুক তাক করে চিৎকার করে মৃত্যুর হুমকি দিতো।

এই তিনজন বন্দির এরূপ নির্যাতন ভাষ্য প্রকাশিত হয়ে পড়লে মার্কিন সরকারের ওপর এ সকল আটক লোকজনের প্রতি আচরণের তথ্য প্রকাশের জন্য আর্ন্তজাতিক চাপ বাড়তে থাকে। অ্যাসোসিয়েইটেড প্রেস (এপি) ২০০৬ সালে ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট বা তথ্য অধিকার আইন-এর আওতায় গুয়ানতামো বে-তে আটককৃতদের পরিচয় প্রকাশের আবেদন জানায়। মার্কিন সরকারের প্রতিরক্ষা দফতর (ডিপার্টমেন্ট অব ডিফেন্স-DOD) বন্দিদের প্রাইভেসির (গোপনীয়তার) ওপর আগ্রাসনের অজুহাতে তথ্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানায়। এরপরও এপি আদালতে সাফল্যের সঙ্গে আবেদন তুলে ধরতে সক্ষম হয়।[১৭৪] এপির আবেদনে বিচারক তার আদেশে বলেন, " কোনো বন্দিই বিচারকার্য চলাকালে ট্রাইবুন্যালে প্রাইভেসি আশা করতে পারে না।"[১৭৫] পরবর্তীকালে বন্দিদের ছবি প্রকাশ করার আদেশ জারি করে নির্দেশনা দেয়া হয়। কোর্ট এও বলে যে, "আটককৃতদের প্রতি DOD-এর আচরণ...ব্যবহার, খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা ইত্যাদি ছাড়াও আটককৃতদের তথ্যের ব্যাপারে অনেক মানুষের স্পষ্ট আগ্রহ রয়েছে।"[১৭৬]

আদালতের মাধ্যমে এভাবে জানার অধিকার সুরক্ষিত হওয়ায় দীর্ঘদিনের একটি আইনি মানদণ্ড রক্ষা করতে সরকারের জন্যও কিছু বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। নিরাপত্তা হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে সেখানকার গ্রহণযোগ্য আচরণের

সীমা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। এরূপ বিতর্ক নিরাপত্তা হেফাজেতে আরো অধিক নির্যাতনের আশঙ্কা কিছুটা হলেও কমিয়ে দিয়েছিল। এ ধরনের বিতর্ক চলতে থাকায় রাষ্ট্রীয় সংস্থার মধ্যেও এই সচেতনতার সৃষ্টি হয় যে, মানবাধিকার লজ্ঘনের কুখ্যাত ঘটনাবলির সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে ভবিষ্যতে কোনো এক সময় জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে। এ উপলব্ধিই নিরাপত্তা হেফাজতে নির্যাতক আচরণের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতার ভূমিকা নেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য অধিকার আইন

জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৯৪৬ সালে মার্কিন কংগ্রেস 'প্রশাসনিক কার্যবিধি আইন' প্রণয়ন করে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে তাদের কাঠামো, কার্যবিধি ও কর্মসূচি সংক্রান্ত সকল তথ্য নিজে থেকে সরবারহের বিধান জারি করে। আইনটি যথেষ্ট কার্যকর থাকা অবস্থায় ১৯৬৬ সালে দেশটি তথ্য অধিকার আইন (Freedom of Information Act FOIA) পাস করে।[১৭৭] আইনটি কার্যকারিতা লাভ করে পরের বছর।

সংশি-ষ্ট বিষয়ে অন্যান্য উৎকৃষ্ট আইনের মতোই FOIA-এর আওতায় নাগরিকত্ব নির্বিশেষে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফেডারেল সরকারের যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্যের আবেদনের সুযোগ রয়েছে। এই আইনের আওতায় সরকারি সংস্থাগুলোকে তাদের কাঠামো, কর্যক্রম ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে জনগণকে সব সময় নিজে থেকে স্বউদ্যোগে তথ্য প্রদানের বিধান রয়েছে। অনেক বিষয় তথ্য প্রদানের আওতামুক্তও রাখা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রায় ১৪০টি বিবেচনা (statutes) রয়েছে যার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে– কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য আটকে দেয়া যেতে পারে এবং কীভাবে। বিচার বিভাগসহ কিছু নির্বাচিত প্রতিনিধির অফিসকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

বিগত বছরগুলোতে আইনটি আনেকবার সংশোধিত হয়েছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বুশ প্রশাসনের আমলে বিশেষভাবে সাধারণ জনগণের তথ্য আধিকার খর্ব করার বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং সে লক্ষ্যে প্রেসিডেন্সিয়াল রেকর্ড অ্যাক্ট নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় ২০০১ সালে। এই আইন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টকে তাদের আমলের সরকারি নথিপত্র যতদিন প্রয়োজন, ততদিন জনগণের জানার অধিকারবহির্ভূত রাখার এখতিয়ার দেয়।

উলে-খ্য, যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যেই তথ্য অধিকার চর্চার মতো আইন রয়েছে।

সরকারি চেষ্টা সত্ত্বেও কানাডার 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন' নির্যাতন সম্পর্কে জনসচেতনতাকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি

৯/১১-পরবর্তী সময়ে কানাডার ফেডারেল সরকার কিছু বিধানের মাধ্যমে জনগণের জানার অধিকার সীমিত করে।[১৭৮] এ সময় সরকারি গোপনীয়তা আইন ১৯৩৯-এ সরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতা পুনর্বহাল করা হয়। পাশাপাশি এ আইনটির পুনর্নামকরণ করা হয় তথ্য নিরাপত্তা আইন বা `Sucurity of Information Act.

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে মাহের আরার নামে এক সিরীয়-কানাডীয়কে আমেরিকার কর্মকর্তারা আটক করার পর ঘটনাটি নিয়ে কানাডার রিপোর্টার জুলিয়েট ও'নীল-এর প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে কানাডার সরকারের তথ্য নিরাপত্তা তথা তথ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কার্যকারিতা বিশেষভাবে নজরে আসে। মাহের আরাকে ২০০২ সালে সিরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে ২০০৩ সালে মুক্তির আগে পর্যন্ত বন্দি অবস্থায় তিনি নির্যাতনের শিকার হন। তার বিরুদ্ধে কখনই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ আটককারীরা প্রমাণ করতে পারেননি। জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক যে দলিল-দস্তাবেজের উপর ভিত্তি করে জুলিয়েট ও'নীল তার প্রতিবেদনটি তৈরি করেন, এর সূত্র প্রদানে অস্বীকার করায় Royal Canadian Mounted Police (RCMP) তথ্য আইনের আওতায় তার বাড়ি এবং দফতরে তল-াশি চালায় তাদের চাহিদামতো তথ্যের সন্ধানে।[১৮০] প্রতিবেদনের[১৮১] সূত্রের সন্ধানে তার ল্যাপটপ খুলে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, ঘরে কাপড়-চোপড় তন্ন তন্ন করে তল-াশি করা ইত্যাদি সবই ঘটে। কারণ তিনি কানাডার জনগণের সামনে মাহের আরার-এর আটকাদেশ এবং পরবর্তী নির্যাতনে সরকারের যোগসাজশের বিষয়টি তুলে ধরার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন।

জুলিয়েট ও'নীল এ সময় এক ঐতিহাসিক আইনগত লড়াইয়ে জয়লাভ করেন। আদালত এই মামলার রায়ে তথ্য নিরাপত্তা আইন বা `Sucurity of Information Act.-এর ৪ নম্বর ধারাটি বাতিলের আদেশ জারি করেন। এই ধারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা আইনিভাবে যোগ্য নন এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো গোপন বা বিশেষ সরকারি তথ্যপ্রাপ্তি একটি অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছিল। আদালত তার ঘোষণায় দাবি করেন আইনের ধারাটি অসাংবিধানিক এবং বোধগম্যও নয়। পাশাপাশি আদালত এও বলেন, আলোচ্যধারার কারণে "সরকারি তথ্যের অবাধপ্রবাহ"-এ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং জুলিয়েট ও'নীল-এর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে খর্ব করাকেও আদালত অসাংবিধানিক হিসেবে অভিহিত করে।[১৮২] RCMP পুলিশ কর্তৃক জুলিয়েট ও'নীল-এর জব্দ করা জিনিসপত্র তাকে ফেরত দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয় আদালত।

শাস্তি হিসেবে নির্যাতন এবং বিবিধ নিষ্ঠুরতা, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ

আচরণ বা শাস্তি হিসেবে নির্যাতন এবং অন্যান্য নির্দয়, অমানবিক ও মানবেতর অবস্থা থেকে মুক্তির অধিকার ব্যক্তির মানবিক মর্যাদা এবং তার জীবন ও স্বাস্থ্যের অধিকারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। আন্তর্জাতিক পরিসরের সকল মানবাধিকার বিষয়ক ধারণা ও কর্মকাণ্ড এবং মানবিক সকল আইনেই এই অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে। আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ৭-এ বর্ণিত রয়েছে, "কাউকে নির্যাতন বা নির্দয় ব্যবহার, অমানবিক বা মানবেতর আচরণ বা সাজা দেয়া যাবে না।"[১৮৩] বেসামরিক ব্যক্তি এবং যুদ্ধ বন্দিদের[১৮৪] সঙ্গে আচরণের বিষয়ে জেনেভা কনভেনশনে যে মূলনীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তাতেও এ অধিকারটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত।

নির্যাতন থেকে মুক্তির অধিকার কখনো খর্ব করা বা স্থগিত রাখার মতো কোনো অধিকার নয়। কোনো অবস্থাই এবং কোনো পরিস্থিতিতেই এই অধিকার স্থগিত বা খর্ব করা যায় না। এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক সময় জরুরি অবস্থা বা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার নামে এরূপ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সকল রাষ্ট্রের জন্যই নিজ নাগরিক বা অন্য দেশের নাগরিকদের নির্যাতন একটি বেআইনি কাজ।

আর্ন্তজাতিক আইনে নির্যাতন বিষয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও আলোচনা রয়েছে। জাতিসঙ্ঘের হিউম্যান রাইটস্ কমিটি আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদের নির্যাতন সম্পর্কিত ৭ নম্বর অনুচ্ছেদের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে: "মানুষের মর্যাদা এবং শারীরিক ও মানসিক অখণ্ডতা ও শুদ্ধতা রক্ষা করা।" কমিটি এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে আরো বলেছে, "জরুরি অবস্থার সময়ও" এরূপ অধিকার স্থগিত করা যাবে না।[১৮৫]

নির্যাতনের বিরুদ্ধে অন্যতম আন্তর্জাতিক আইন হলো সিএটি (CAT) সনদ তথা `The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Treatment or Degrading Treatment or Punishment'. ১৯৮৭ সালে এই সনদ কার্যকারিতা লাভ করে। এটি একটি বিশদ আর্ন্তজাতিক চুক্তি (treaty), যা নির্যাতনকে সংজ্ঞায়িত করেছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এর লঙ্ঘনজনিত জবাবদিহিতা সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সনদে। সিএটি (CAT)-এর আওতায়, এর আর্টিক্যাল ১৭ অনুযায়ী 'নির্যাতনবিরোধী আন্তর্জাতিক কমিটি' (কমিটি এগইনিস্ট টর্চার) রয়েছে। এই কমিটি নির্দয় আচরণ এবং নির্যাতনের শিকার মানুষদের অভিযোগ গ্রহণের

এখতিয়ার রাখে। কোনো রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্র কর্তৃক নির্যাতনের বিষয় জানলে কীভাবে রিপোর্ট করবে, সে সম্পর্কেও উপরোক্ত কমিটি উপায় জানিয়ে দেয়।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯২ সালের জুনে আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ এবং ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে সিএটি (CAT) সনদ অনুসমর্থন করে।

১৯৭৬ সালের মে মাসে কানাডা আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদে সম্মতি দেয় এবং সিএটি (CAT) সনদে অনুসমর্থন জানায় ১৯৮৭ সালের জুনে।

পানির অধিকার[১৮৭]

দিল্লি-র পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিশ্বব্যাংকের হস্তক্ষেপে জরুরি সংস্কার ব্যাহত হলো যেভাবে

দিল্লি-র 'জল বোর্ড' (ডিজেবি) সেখানকার এক কোটি ৩০ লাখ মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা করে থাকে। ২৪ ঘণ্টা পানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখতে ১৯৯৮ সালে এই জলবোর্ড বিশ্বব্যাংকের তরফ থেকে এক দফা ঋণ সুবিধা পায়। কিন্তু তাতে শর্ত থাকে যে, গুরুত্বপূর্ণ এই সেবা খাতের বেসরকারিকরণ শুরু করতে হবে। এই প্রকল্পে কারিগরি পরামর্শ প্রদানের জন্য ডিজেবি পাবলিক টেন্ডারের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করে। ২০০১ সালে সেই দরপত্র প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক বহুজাতিক কোম্পানি প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপারস্ (Princewaterhouse Coopers-PwC) বাছাইকৃতদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হয়।[১৮৮]

পানি সরবারহের মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাত ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালনা করার ডিজেবি-এর উদ্যোগে বহু মহলে শঙ্কার সৃষ্টি হয়। কারণ এতে দিল্লি-র নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর সহজে এবং সস্তায় পানি পাওয়ায় সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। স্থানীয় এনজিও 'পরিবর্তন' এ ঘটনার অনুসন্ধানে তখন আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং খুঁজতে থাকে ব্যক্তিমালিকানায় পানি সরবারহ ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি টেকনিক্যাল ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগত দিক থেকে কতটুকু বিধিসম্মতভাবে হয়েছে বা হচ্ছে। দিল্লি-র 'তথ্য অধিকার আইনে'র আওতায় দরপত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের আবেদন জানায় 'পরিবর্তন' এবং প্রায় আট হাজার পৃষ্ঠার তথ্য তাদের প্রদান করা হয়।[১৮৯]

দলিল-দস্তাবেজে পাওয়া যায় যে, দরপত্রের অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে PwC অর্থনৈতিক এবং কারিগরি মানদণ্ডে বরাবর নিচের কাতারে ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠানটি যাচাই-বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণই হতে পারেনি। রেকর্ড থেকে আরও জানা যায়, উচ্চপদস্থ ডিজেবি কর্মকর্তারা বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। এ কারণে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের শেষভাগে বাছাইকৃতদের তালিকায় PwC-এর অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে তাদের আপত্তিও ছিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, PwC-এর এত খারাপ পারফরম্যান্স সত্ত্বেও কেন এবং কীভাবে বাছাইকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকায় সে অন্তর্ভুক্ত হতে পারলো। রেকর্ডে জানা যায়, দরপত্র প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যাংকের হস্তক্ষেপ ছিল অবিরত এবং তারা জোর দিয়েই বলতে থাকে যে, "বাছাইকৃত পরামর্শকদের অন্তত একটি প্রতিষ্ঠান যেন উন্নয়নশীল কোনো দেশ থেকে নেয়া হয়।"[১৯০] PwC ছিল একটি বহুজাতিক কোম্পানি। কিন্তু টেন্ডারে অংশ নেয়ার স্বার্থে তারা কলকাতায় রেজিস্ট্রিকৃত একটি স্থানীয় কোম্পানি খোলে এবং সেই সূত্রে তারা এমনভাবে দরপত্রে অংশ নেয়, যেন তাতে মনে হয়, এটি দেশজ স্থানীয় একটি সংস্থা।

প্রাপ্ত তথ্যে আরো জানা গেল, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় PwC যে 'সফল' হলো তা বিশ্বব্যাংকের প্রভাবেই। নথিতে অভ্যন্তরীণ মতামত প্রক্রিয়ায় একজন আমলার এরূপ মন্তব্যও পাওয়া গেল যে, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার এই যে বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া তা: "ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে– যদি না বিশ্বব্যাংকের সুপারিশে ঐক্যমত পোষন করা হয়।"[১৯১] এরূপ প্রচ্ছন্ন হুমকির ফল হলো, ডিজেবি'র প্রাথমিক মূল্যায়নে যা ঘটেনি এবার তাই ঘটলো। প্রকল্পের জন্য চূড়ান্তভাবে বাছাইকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকায় উচ্চতর নম্বরসহ PwC ঠাঁই করে নিল।

২৪ ঘণ্টা ধরে নগরবাসী সকলকে দক্ষতার সঙ্গে নিরবিছিন্ন পানি সরবারাহ নিশ্চত করা আলোচ্য প্রকল্পের উদিষ্ট লক্ষ্য বলা হলেও তথ্য অধিকার আইনে উদ্বার করা প্রকল্পের কাগজপত্র থেকে যে তথ্য বেরিয়ে আসে, তাতে দেখা যায়, যেসব প্রস্তাবনা রয়েছে, তাতে প্রকল্প ফল হবে আসলে অন্য রকম। দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখা যায়, প্রাইভেটাইজেশনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ কোম্পানির জন্য বিপুল লাভের অঙ্গীকার রয়েছে সেখানে। এটা আসলে সকল শ্রেণীর নাগরিক নির্বিশেষে সরবরাহকৃত পানির ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমেই কেবল সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে নিশ্চিতভাবেই নগরের ঘনবসতিপূর্ণ গরিব এলাকাগুলোতে ২৪ ঘণ্টা পানি সরবরাহ পাওয়া দুষ্কর হবে। কারণ তারা ধনাঢ্যদের মতো উচ্চমূল্যে সার্বক্ষণিক সরবরাহের ক্রেতা হতে পারবে না। অথচ দিলি-তে নাগরিক হিসেবে ওই ধরনের এলাকার দরিদ্র মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ। দেখা গেল, নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পানিপ্রাপ্তি বাস্তবে অনেক কমে যাবে। ফলে অনেক মানুষ হয়তো পানি ব্যবহারই করতে পারবে না।[১৯২]

'পরিবর্তন'-এর মাধ্যমে সম্ভাব্য এরূপ ব্যবস্থাপনার কথা জানাজানি হলে প্রচার মাধ্যমে এবং জনসমাজে ডিজেবি ও বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় ওঠে। চাপের মুখে দিলি-র মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা দেন, বিশ্বব্যাংকের সুপারিশে ডিজেবি আর এগোবে না এবং দরপত্রের চূড়ান্ত তালিকাটিও আপাতত আর বিবেচনায় থাকবে না। অর্থাৎ সে অনুযায়ী কাজ বণ্টন হবে না। পরিবর্তে গণশুনানির মাধ্যমে পানি সরবারহ সমস্যার বিকল্প সমাধানের রাস্তা খোঁজ শুরু হলো। এরূপ গণশুনানিকালে দিলি-র পানি সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা সংস্কারের PwC-এর প্রস্তাব ও সুপারিশগুলো ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। PwC তাদের সুপারিশে ম্যানিলাসহ বিভিন্ন স্থানের পানি ব্যবস্থাপনার উদাহরণ দিয়ে দিলি-তেও সেরূপ কার্যক্রমের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু পানি ব্যবস্থাপনা ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়ার প্রকল্পগুলো সেসব স্থানে আসলে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়। শুরুতে অনেক সুবিধার আশ্বাস প্রদান করা হলেও তার কোনোটাই ওইসব স্থানে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।[১৯৩]

এ সময় আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন- বিশ্বব্যাংকের কার্যক্রমের আরো স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করে এনজিও প্রতিষ্ঠান 'পরিবর্তন'। বিশেষ করে বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান যে তাদের নীতি এবং

সিদ্ধান্তের জন্য কোনো দেশের আইনগত কাঠামোর আওতায় জবাবদিহিতার উর্ধ্বে, সে সময় তা জনসম্মুখে চলে আসে। এ রকম অবস্থাতেও বিশ্বব্যাংক যেভাবে তাদের কার্যক্রমের তথ্য উন্মুক্তভাবে প্রদানে গড়িমসি করে এবং তার ফলে গরিব মানুষের স্বার্থ যেভাবে বিঘ্নিত হয়, তাও জনসমাজে এ সময় উদ্বেগের বিষয় হিসেবে আলোচিত হয়। দিলি-তেও তেমনটিই ঘটেছিল– বিশ্বব্যাংকের কারণে, সেখানে দরিদ্রদের পানি অধিকার বিপন্ন হতে বসেছিল। সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালনার নামে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পানির সহজপ্রাপ্যতার অধিকার খর্ব করার উদ্যোগের বিরুদ্ধে তথ্য অধিকার আইন এ সময় মোক্ষম এক অস্ত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়। কর্মকর্তা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শক্তিগুলোর আচরণসহ পুরো প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি পরীক্ষায় এক্সরে'র যে ভূমিকা, আগ্রহী নাগরিকদের হাতে তথ্য অধিকারের কাজ অনেকটা একই রকম। বর্তমানে ধীরে ধীরে আরো রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম যেমন- স্বাস্থ্যসেবা খাত, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, যানবাহন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ব্যক্তিমালিকানায় চলে যাচ্ছে। ফলে শুধু সরকার থেকে নয়, প্রাইভেটাইজেশনের মাধ্যমে জরুরি নাগরিকসেবা প্রদানে যারা যুক্ত থাকবেন, তাদের কাছ থেকেও সেবাগ্রহীতা বা সেবা ক্রয়কারীদের তথ্য পাওয়ার জরুরি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেদিকটি বিবেচনায় রেখে কোনো কোনো তথ্য অধিকার আইনের আওতা কিছুটা হলেও নাগরিক স্বার্থে নিয়োজিত ও কর্তব্যরত ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা হয়েছে। এমনকি যেখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি নাগরিকসেবা প্রদানে সংযুক্ত নয়, সেখানেও তাদের কার্যক্রম নাগরিকদের তদারকির জন্য উন্মুক্ত থাকার প্রয়োজন রয়েছে; যদি সেসব প্রতিষ্ঠানের কাজ কোনো না কোনোভাবে মানুষের কোনো অধিকার ও স্বার্থ সংশি-ষ্ট হয়।[১৯৪]

বিশ্বব্যাংকের অভ্যন্তরীণ তথ্য প্রকাশ নীতিমালা

তথ্য অধিকারের দাবিতে আন্দোলন বর্তমানে বিশ্বরূপ নিয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এই আন্দোলন এখন তথ্য অধিকারের দাবিকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও ব্যাপ্ত করতে সচেষ্ট। আন্দোলন গড়ে উঠেছে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে তথ্য প্রাপ্তির দাবিতেও। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যকেন্দ্রিক প্রায় অনড় বাস্তবতা উপরোক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ডকে এমনিতেই নৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে রেখেছে। দারিদ্র্য ও বঞ্চনা কমার বদলে প্রতিনিয়ত সমস্যার মাত্রা বাড়ছে। এসবই বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর কার্যক্রম নিয়ে অনেক দিন ধরে চলতে থাকা বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এ বাস্তবতাতেই এখন বেশ জোরেশোরে বিশ্বব্যাংকের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতার গুরুত্ব এবং সিদ্ধান্তে জনগণের অংশীদারিত্বেরও কথা উঠেছে।

বিশ্বব্যাংক তার তথ্য প্রকাশের নীতিমালা কার্যকর করে ২০০২ সালে।[১৯৫] স্বচ্ছতার লক্ষ্যে ব্যাংক এরই মধ্যে নিয়মিত Country assistance strategy (CAS) প্রকাশের নীতি নিয়েছে। এছাড়া ইন্টারনেট এবং ইনফরমেশন সেন্টারের মাধ্যমেও তথ্য প্রদান করে থাকে এই সংস্থা। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মানের স্বচ্ছতা অর্জনের চেষ্টা করে প্রতিষ্ঠানটি। তারপরও মারাত্মক কিছু ব্যতিক্রম থেকেই যায়। নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের বেলায় অপ্রকাশের নীতি অবলম্বন করা হয়। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নের বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সমীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য অনেক সময়ই উন্মুক্তকরণ নীতির নাগালের বাইরে রাখা হয়। একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক তার বাইরের কোনো আইনগত প্রক্রিয়ার আওতাবহির্ভূত, অর্থাৎ কোনো নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান বা যেসব দেশে বিশ্বব্যাংক কাজ করছে সেসব দেশের বিচার বিভাগ বিশ্বব্যাংক থেকে তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনে কোনো হস্তক্ষেপ বা প্রভাব খাটাতে পারে না।

পানির অধিকার

প্রত্যেক মানব সন্তানের জন্য পানি অত্যাবশ্যক। তারপরও বিশ্বব্যাপী প্রায় এক বিলিয়নেরও বেশি লোকের জন্য বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি– যা খাওয়া, রান্না এবং ধোয়ামোছার কাজে ব্যবহার করা যায়, তার সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।[১৯৬] প্রতি বছর প্রায় দুই মিলিয়ন লোক দূষিত পানি ব্যবহার করে মারা যায়। তারা সকলে প্রতিরোধযোগ্য পানিবাহিত ব্যাধি যেমন- আমাশয়, পোলিও, টাইফয়েড প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়েছিল।[১৯৭] অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসঙ্ঘ কমিটির ভাষ্য মতে, "মর্যাদার সঙ্গে মানব জীবনযাপনের জন্য পানির অধিকার অপিরহার্য, অন্যান্য মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধানেরও এটি এক আবশ্যিক শর্ত।...ব্যক্তিগত ও গৃহস্থালি কাজের জন্য প্রত্যেকের যথেষ্ট পরিমান নিরাপদ, গ্রহণযোগ্য, শারীরিকভাবে সহজে সংগ্রহযোগ্য এবং অর্থনৈতিকভাবে সহজলভ্য পানির অধিকার রয়েছে।"[১৯৮]

যদিও মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ বা আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদে পানি অধিকারের গতানুগতিক স্বীকৃতি নেই, তবুও এই অধিকার ক্রমেই আন্তর্জাতিক পরিসরে অন্যতম মানবিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে। এই উপলব্ধি এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক এবং সাম্প্রতিক মানবাধিকার চুক্তি ও সনদগুলোতেও তার স্বীকৃতি থাকছে যে, পানি হলো মানুষের অন্যতম অপরিহার্য এবং মৌলিক প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিরোধ সংক্রান্ত সিডও সনদের কথা বলা যায়।

এই সনদের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে "পর্যাপ্ত বসবাসের সুবিধা, বিশেষ করে গৃহায়নের ক্ষেত্রে, স্যানিটেশন এবং পানির সুবিধা"কেও অন্যতম নারী অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।[১৯৯] শিশু অধিকার সংক্রান্ত সনদ (সিআরসি)-এও শিশুর স্বাস্থ্য ও বিকাশের জন্য পানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি রয়েছে। এর ২৪ নম্বর অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপক্ষকে তাগিদ দিয়ে বলা হয়েছে, অপুষ্টি ও রোগ-ব্যাধি মোকাবেলায় যথাযথ উদ্যোগের অংশ হিসেবে "পর্যাপ্ত সুষম খাদ্য এবং সুপেয় পানির নিশ্চয়তা বিধান" করতে হবে।[২০০] নিরাপদ ও সুপেয় পানির নিশ্চয়তা বিধান সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যেরও অন্যতম এক লক্ষ্য। নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং মৌলিক স্যানিটেশন সুবিধার আওতাবহির্ভূত জনগোষ্ঠির সংখ্যা ২০১৫ সালের ভেতরে অর্ধেকে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে।[২০১] পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকও স্বীয় উদ্যোগে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের একটি কর্মসূচি চালু করেছে, যা তার দাবি মতে 'দারিদ্র্য নিরসনে বিশ্বব্যাংকের যেসব মুখ্য অঙ্গীকার রয়েছে, তার এক কেন্দ্রীয় অংশ।'

১৯৯৩ সালের জুলাইয়ে ভারত সিডও সনদ অনুসমর্থন করে এবং ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে শিশু অধিকার সনদ ও ১৯৭৯ সালে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক সনদে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

টেবিল : এক
তথ্য অধিকার আইন তৈরির পথে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো

দেশ	বছর	জানার অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত আইনের শিরোনাম
আলবেনিয়া	১৯৯৯	Law on the Right to Information for Official Documents
এঙ্গোলা	২০০২	Law on Access to Administrative Documents
এন্টিগুয়া ও বারবুডা	২০০৪	Freedom of Information Act
আর্মেনিয়া	২০০৩	Law of the Republic of Armenia on Freedom of Information
আর্জেন্টিনা	২০০৩	Access to Public Information Regulation
অস্ট্রেলিয়া	১৯৮২	Freedom of Information Act
অস্ট্রিয়া	১৯৮৭	Federal Law on the Duty to Furnish Information
আজারবাইজান	২০০৫	The Law on Right to Obtain Information
বাংলাদেশ	২০০৯	Right to Information Law 2009
বেলজিয়াম	১৯৯৪	Law on Access to Administrative Documents held by Federal Public Authorities
বেলিজ	১৯৯৪	The Freedom of Information Act
বসনিয়া এবং হার্জেগোবিনা	২০০১	The Freedom of Access to Information Act
বুলগেরিয়া	২০০০	Access to Public Information Act
কানাডা	১৯৮৩	The Access to Information Act
চীন	২০০৭	(to come into effect in May'08) Ordinance on Openness of Government Information
কলাম্বিয়া	১৯৮৫	Law Ordering the Publicity of Official Acts and Documents
ক্রোয়েশিয়া	২০০৩	Act on the Right of Access to Information
চেক রিপাবলিক	১৯৯৯	Law on Free Access to Information
ডেনমার্ক	১৯৮৫	Access to Public Administration Files Act

দেশ	বছর	জানার অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত আইনের শিরোনাম
ডোমেনিকান রিপাবলিক	২০০৪	Law on Access to Information
ইকুয়েডর	২০০৪	Organic Law on Transparency and Access to Public Information
এস্টোনিয়া	২০০০	Public Information Act
ফিনল্যান্ড	১৯৯৯	Act on Openness of Government Activities
ফ্রান্স	১৯৭৮	Law on Access to Administrative Documents
জর্জিয়া	১৯৯৯	General Administrative Code of Georgia
জার্মানি	২০০৫	Act to Regulate Access to Federal Government Information
গ্রিস	১৯৯৯	Code of Administrative Procedure
হন্ডুরাস	২০০৬	The Law on Transparency and Access to Public Information
হাঙ্গেরি	১৯৯২	Act on Protection of Personal Data and Disclosure of Data of Public Interest
আইসল্যান্ড	১৯৯৬	Information Act
ভারত	২০০৫	The Right to Information Act
ইন্দোনেশিয়া	২০০৮	Freedom of Information Act
আয়ারল্যান্ড	১৯৯৭	Freedom of Information Act
ইজরায়েল	১৯৯৮	Freedom of Information Law
ইটালি	১৯৯০	Law on Administrative Procedure and Access to Administrative Documents
জ্যামাইকা	২০০২	Access to Information Act
জাপান	১৯৯৯	Law Concerning Access to information Held by Administrative Organs
দক্ষিণ কোরিয়া	১৯৯৬	Act on Disclosure of Information by Public Agencies
লাটভিয়া	১৯৯৮	Law on Freedom of Information
লাইসটেনস্টেইন	১৯৯৯	Information Act
লিথুয়ানিয়া	১৯৯৬	Law on the Provision of Information to the Public

দেশ	বছর	জানার অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত আইনের শিরোনাম
মেসিডোনিয়া	২০০৬	Law on Free Access to Information of Public Character
মেক্সিকো	২০০২	Federal Law of Transparency and Access to Public Government Information
মালদোবা	২০০০	The Law on Access to Information
মন্টিনিগ্রো	২০০৫	Law on Free Access to Information
নেদারল্যান্ড	১৯৯১	Government Information (Public Access) Act
নিউজিল্যান্ড	১৯৮২	Official Information Act
নরওয়ে	১৯৭০	The Freedom of information Act
পাকিস্তান	২০০২	Freedom of information Ordinance
পানামা	২০০২	Law on Transparency in Public Administration
পেরু	২০০৩	Law of Transparency and Access to Public Information
পোল্যান্ড	২০০১	Law on Access to Public Information
পর্তুগাল	১৯৯৩	Law of Access to Administrative Documents
রোমানিয়া	২০০১	Law Regarding Free Access to Information of Public Interest
সেইন্ট ভিনসেন্ট এন্ড গ্রানাডা	২০০৩	Freedom of Information Act
সার্বিয়া	২০০৪	Law on Free Access to Information of Public Importance
স্ে-াভাকিয়া	২০০০	Act on Free Access to Information
স্ে-াভেনিয়া	২০০৩	Act on Access to Information of Public Character
দক্ষিণ আফ্রিকা	২০০০	Promotion of Access to Information Act
স্পেইন	১৯৯২	Law on Rules for Public Administration
সুইডেন	১৭৬৬	Freedom of the Press Act
সুইজারল্যান্ড	২০০৪	Federal Law on the Principle of Administrative Transparency
তাজিকিস্তান	২০০২	Law of the Republic of Tajikistan on Information
থাইল্যান্ড	১৯৯৭	Official Information Act
ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো	১৯৯৯	Freedom of Information Act

দেশ	বছর	জানার অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত আইনের শিরোনাম
তুরস্ক	২০০৩	Law on the Right to Information
উগান্ডা	২০০৫	The Access to Information Act
ইউক্রেইন	১৯৯২	Law on Information
যুক্তরাজ্য	২০০০	Freedom of Information Act
যুক্তরাষ্ট্র	১৯৬৬	Freedom of Information Act
উজবেকিস্তান	২০০২	Law on the Principles and Guarantees of Freedom of Information
জিম্বাবুয়ে	২০০২	Access to Information and Privacy Protection Act

দ্রষ্টব্যঃ উপরোক্ত টেবিলে সেসব দেশের নামই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেখানে তথ্য অধিকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পৃথক আইন বা জাতীয় কোনো আইনে তথ্য অধিকার বিষয়ক বিশেষ স্বতন্ত্র কোনো ধারা বা অনুচ্ছেদ রয়েছে। যেমন, পাকিস্তান-এর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্ট-এর জন্য। চীন-এর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জানার অধিকার বিষয়ক বিশেষ অধ্যাদেশের জন্য। বিভিন্ন দেশের অঙ্গরাজ্য বা বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন অঞ্চলে তথ্য অধিকার বিষয়ে বিধি-বিধান থাকা সত্ত্বেও সেগুলো এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন ক্যামেন দ্বীপপুঞ্জ, কসভো, স্কটল্যান্ড বাদ পড়েছে, তেমনি অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলোর তথ্য অধিকার সম্পর্কিত বিধি-বিধানও এই তালিকায় সংযুক্ত করা হয়নি।

টীকা ও তথ্যসূত্র

ভূমিকা

[১] জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে ১৯৪৮ সালে গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে তথ্য অধিকার যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে সংরক্ষিত হয়েছে। দেখুন, *Universal Declaration of Human Rights*, Resolution n 271 A (III) 10 December. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, http://www.un.org/Overview/rights.html; একই অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ (International Covenant on Civil and Political Rights)-এর ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদেও। বিস্তারিত দেখুন, United Nations (1966) International Covenant on Civil and Political Rights: http:// www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm. নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[২] বিশ্বজুড়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে উত্তম নীতি এবং আইনগত ও ব্যবহারিক অনুশীলনগুলো সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত দেখুন।

[৩] সুইডেনের সংবিধান যে চারটি মৌলিক আইনগত ভিত্তির আলোকে তৈরি তথ্য প্রাপ্তির স্বাধীনতার অধিকার তার একটি হিসেবেই সে দেশে স্বীকৃত। সুইডেনের বহু আইনে তথ্য অধিকার এবং সরকারি নথি জানার অধিকার বিষয়ক ধারা-উপধারা রয়েছে। সুইডেনের সংবিধান দেখতেঃ http://www.servat.unibe.ch/icl/ sw00000_.html., ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪] এটি একটি ল্যাটিন বাগধারা (Ipsa Scientia Potestas Est)। বিস্তারিত দেখুন, বেকনের Meditationes Sacrae (১৯৫৭)-এ। এখানে উদ্বৃত হয়েছে http://www. quotationspage.com/quotes/Sir_Francis_Bacon থেকে। ৮ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

অধ্যায় এক

[১] নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত ১৯৬৬ সালের আন্তর্জাতিক সনদটি কার্যকর হয় ১৯৭৬ সালের ২৩ মার্চ। ১৬৩টি দেশ এই চুক্তির পক্ষ। আরো বিস্তারিত দেখুন, জাতিসঙ্ঘের (১৯৬৬) *আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ* : http://www. ohchr.org/english/law/ccpr.htm., ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[২] ১৯৬৬ সালের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদটি কার্যকর হয় ১৯৭৬ সালের ৩ জানুয়ারি। ২০০৭ সালের ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ১৫৭টি দেশ এই সনদের চুক্তিবদ্ধ পক্ষ হয়েছে। আরো বিস্তারিত দেখুন, জাতিসঙ্ঘের (১৯৬৬) *আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ* : http://www.unhchr.ch/html/ menu3/b/a_cescr.htm, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩] আনান, কে., (১৯৯৭), *কানাডার টোরেন্টোতে বিশ্বব্যাংক আয়োজিত 'গে-াবাল নলেজ '০৭'* উপলক্ষে কফি আনান এই ভাষণ দেন। বিস্তারিত দেখুন, igig.unesco.or.kr/ web/ igig_

docs/01/952476023.pdf, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪] ১৯৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫ তম পে-নারি বৈঠকের ৫৯(১) নম্বর সিদ্ধান্ত। আরো বিস্তারিত দেখুন, h t t p://d a c c e s s-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/59(I)&Lang=E&Area=RESOLUTION., ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫] হারারে ঘোষণা কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর জন্য মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিষয়ে কিছু মানদণ্ড নির্দিষ্ট করেছিল। কমনওয়েলথ সচিবালয় (১৯৯১)-এর '*হারারে ঘোষণা*' সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন:http://www.thecommonwealth.org/Internal/20723/ 34457/harare_commonwealth_declaration/, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৬] পূর্বোক্ত, অনুচ্ছেদ নম্বর ৪।

[৭] বিস্তারিত দেখুন, ঐ দলিলের অনুচ্ছেদ ১৯।

[৮] অনুচ্ছেদ নম্বর ১০, ১৪ এবং ১৬; ১৯৭৯ সালে গৃহীত সিডও (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) সনদ নারীর তথ্য অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সিডও সনদ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখুন : http://www. un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৯] শিশু অধিকার সনদের ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদ বিশেষভাবে এই সত্য গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরে যে, সকল শিশুর 'তথ্য চাওয়া, পাওয়া এবং বিনিময়ের' অধিকার রয়েছে। জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক ১৯৮৯ সালের শিশু অধিকার সনদ বিষয়ে আরো দেখুন : http://www.ohchr.org/english/law/crc.htm, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১০] পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক রিও ঘোষণার ১০ নম্বর নীতিতে বলা হয়েছিল 'প্রত্যেক নাগরিকের পরিবেশ বিষয়ক তথ্যে কার্যকর অভিগম্যতা থাকা উচিত।' *পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসঙ্ঘের ১৯৯২ সালের রিও ঘোষণার* বিস্তারিত দেখুন: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১১] *জেনি ডো বনাম টোরেন্টো* মিউনিসিপালিটির মেট্রোপলিটন কমিশনার অব পুলিশ (১৯৯৮)। কোর্ট নথি নম্বর 87-CQ-21670 (Canada) : http://www.sgmlaw.com/ Page251 .aspx, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১২] *অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ক কানাডা সনদ*, কানাডার বিচার মন্ত্রণালয়, ১৯৮২। এ সম্পর্কে আরো দেখুন :http://laws.justice.gc.ca/en/charter/, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৩] টোরেন্টো অডিট বিভাগ (১৯৯৯), '*যৌন হয়রানি বিষয়ক তদন্তের পর্যালোচনা প্রতিবেদন*,' টোরেন্টো পুলিশ কর্তৃক প্রণীত, পৃ. ১০৩-১০৫, আরো দেখুন: www.walnet.org/jane_doe/griffiths-991025.pdf, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৪] ভারতের নির্বাচন কমিশন : http://www.eci.gov.in/, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত

তথ্য।

[১৫] এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন: মাজা দারুওয়ালা, বিভু মহাপাত্র ও ভেঙ্কটেশ নায়েক (২০০৩), '*জানার অধিকার: ভোটারদের গাইড*' (ইংরেজিতে লিখিত), সিএইচআরআই, নয়াদিলি-; http://www.humanrightsinitiative.org/publications/const/the_right_to_know.pdf, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৬] কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (২০০৩), আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন নয়াদিলি- থেকে প্রকাশিত: *Open Sesam: Looking for the Right to Information in the Commosnwealth*, পৃ.১৬ : http://www.humanrightsinitiative.org/publications/chogm/ chogm_2003/chogm%202003%20report.pdf, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৭] এ সম্পর্কে দেখুন বিশ্বব্যাংক (২০০৪)-এর দলিল: *দুর্নীতি বিরোধী লড়াইয়ে ব্যাংক যেভাবে সাহায্য করছে* (ইংরেজিতে লিখিত), ৮ এপ্রিল: http://go.worldbank.org/07930BHX80, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৮] দেখুন, বিশ্বব্যাংকের এ সম্পর্কিত প্রকাশনা (২০০৪): *দুর্নীতির মূল্য* (ইংরেজিতে লিখিত), ৮ এপ্রিল : http://go.worldbank.org/LJA29GHA80, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৯] ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদ। বিস্তারিত দেখুন, জাতিসঙ্ঘের ২০০৩ সালের *Convention Against Corruption*: http://www.unodc.org/unodc/crime_ convention_corruption.html, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[২০] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর '*করাপশানস্ পারচেপশান্স ইনডেক্স*' হলো এমন একটি গবেষণাগত হাতিয়ার যার সাহায্যে একটি দেশের দুর্নীতির মাত্রা অনুমান করা হয়। বর্তমানে ১৮০টি দেশে বিশেষজ্ঞদের দুর্নীতি সম্পর্কিত বিশে-ষণে এবং মতামত জরিপে এই পদ্ধতির ব্যবহার হচ্ছে। আরোও দেখুন: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (২০০৭) করাপশানস্ পারচেপশান্স ইনডেক্স: http://www.transparency.org/ policy_research/surveys_indices/cpi, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[২১] এই দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে: ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন, আইসল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, কানাডা এবং নরওয়ে। সিঙ্গাপুর-এ বর্তমানে তথ্য অধিকার বিষয়ক কোনো আইন নেই।

[২২] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর পলিসি পেপার : *দারিদ্র্য, সাহায্য এবং দুর্নীতি*, পৃ. ২, দেখুন: http://www.transparency.org/publications/publications/aid_ corruption, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[২৩] ২০০৫ সালের *ভারতীয় তথ্য অধিকার আইন* সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন : http://rti.gov.in, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[২৪] দেখুন, দ্য কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (২০০৭)-এর *Your Guide to Using the Right to Information Act 2005*: New Delhi: http://www.humanrightsinitiative.org/publications/rti/ guide_ to_ use_ rti_ act_ 2005.pdf

[২৫] দিলি-ভিত্তিক তথ্য অধিকার আইন '*The Right to Information Act*, 2001 (Delhi)' তৈরি হয় ভারতের ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয়ভিত্তিক তথ্য অধিকার আইনের পূর্বে। এই আইনটির খসড়া দেখতে পাওয়া যাবে : http://ar.delhigovt.nic.in/ right1.html-এ, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[২৬] এই সাফল্যগাঁথার পুরো বিবরণের জন্য দেখুন : http://www. humanrights initiative.org/programs/ai/rti/india/states/delhi/rti_spurs_debate_on_world_bank_delhi_water_project.pdf, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[২৭] অর্মত্য সেন ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন। অর্থনীতিতে মানবাধিকার বিষয়ে অন্যতম সোচ্চার কণ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাঁকে।

[২৮] সেন, অ. (২০০০), '*Global Doubts*', হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১তম ডিগ্রী প্রদান অনুষ্ঠান স্মারক বর্ক্তৃতা, ৮ জুনঃ http://www.commencement.harvard.edu/ 2000/sen.html, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[২৯] বিবিসি সংবাদ (২০০৭), কান্ট্রি প্রোফাইলঃ *ইথিওপিয়া*, ২৩ অক্টোবর। http://news. bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/1072164.stm, ৭ নভেম্বর ২০০৭।

[৩০] অনুচ্ছেদ নম্বর ২৯, *ইথিওপিয়ার সংবিধান* (১৯৯৪)। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখুন: http://www.servat.unibe.ch/law/icl/et00000_.html. ১৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩১] সেন, এ. (১৯৯৯), *স্বাধীনতা হিসেবে উন্নয়ন*, এংকর বুকস্, যুক্তরাষ্ট্র, পৃ. ১৭৮।

[৩২] মিলনার, কে., '*ফ্লাশ ব্যাংক ১৯৮৪: প্রোট্রেইট অব এ ফেমাইন*', বিবিসি সংবাদ, ৬ এপ্রিল; এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখুন: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/ 703958.stm., ১৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩৩] ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্স ইন্সটিটিউট (২০০৩), '*এন্ডিং দ্য সাইকেল অব ফেমাইন ইন ইথিওপিয়া,*' ১০ ফেব্রুয়ারি: http://www.ifpri.org/media/ethiopia/ ethiopiaib.pdf, ১৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩৪] সেন,এ., *স্বাধীনতা হিসেবে উন্নয়ন*, ইউনেস্কো (২০০৬), *মিডিয়া ডেভেলপমেন্ট এন্ড পভার্টি এরাডিকশান*, ৩ মে, পৃ. ৬: http://portal.unesco.org/ci/en/ files/21513/ 11432186411WPFD_concept_note.pdf/WPFD+concept+note.pdf, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩৫] উপরোক্ত, নম্বর ৩২ : মিলনার, কে., (২০০০), '*ফ্লাশ ব্যাংক ১৯৮৪: প্রোট্রেইট অব এ ফেমাইন*'।

[৩৬] জাতিসঙ্ঘ (২০০০), *মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট* গোল : http://www.un.org/ millenniumgoals/, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩৭] বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (২০০৭), *৫ নম্বর লক্ষ্য : মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন*; http://www. who.int/mdg/goals/goal5/en/index.html, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩৮] এই চারটি প্রদেশ হলো– আপাক, আকালো, বালা এবং আকোরোরো।

[৩৯] ওয়েদ্দি, ডি, জে., (২০০৬) '*Women Making Rural Access Possible i n*

Uganda', I4d, ১৪ ডিসেম্বর: http://www.i4donline.net/ articles/current-article.asp?articleid=941&typ=Feat, ১৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪০] উইমেন অব উগান্ডা নেটওয়ার্ক (WOUGNET): http://www.wougnet.org, ১৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪১] পূর্বোক্ত, নম্বর ৩৯ : ওয়েদ্দি, ডি. জে, (২০০৬), *Women Making Rural Access Possible*, etc.

[৪২] পূর্বোক্ত, নম্বর ৩৯ : ওয়েদ্দি, ডি. জে, (২০০৬), *Women Making Rural Access Possible*, etc.

[৪৩] উইমেন অব উগান্ডা নেটওয়ার্ক-এর কার্যক্রম উগান্ডার তথ্য অধিকার আইন তৈরি হওয়ার পূর্বেই শুরু হয়েছিল। উগান্ডায় তথ্য অধিকার আইন তৈরি হয় ২০০৫ সালে।

[৪৪] উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পেশাজীবী সাংবাদিকদের সংগঠন 'দ্য সোসাইটি অব প্রফেশনাল জার্নালিস্টস্'-এর কথা। এই সংগঠন ১৯৯৬ সালে *কোড অব এথিকস্* তৈরি করে। এ বিষয়ে দেখুন : http://www.spj.org/ethicscode.asp, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৫] উদাহরণ হিসেবে দেখুন '*একসেস টু ইনফরমেশন এন্ড প্রটেকশন অ্যাক্ট ২০০২*, (জিম্বাবুয়ে)। বিস্তারিত দেখা যাবে : www.sokwanele.com/pdfs/AIPPA.pdf, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৬] ফ্রিডম অব ইনফরমেশন (সংশোধন) বিল, ২০০৬-০৭ (যুক্তরাজ্য): http://www.parliament.thestationery-office.co.uk/pa/pabills/200607/freedom_of_information_amendment.htm, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৭] প্রেস গেজেট (২০০৭) `*Signed and Delivered: Don't Kill FOI Petition is in Blair's Hands*' Press Gazette, ৯ মার্চ: http://www. pressgazette.co.uk/story.asp? storyCode=36988&sectioncode=1, ৩১ মার্চ ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৮] ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল ট্রাইব্যুনাল ফর রুয়ান্ডা; প্রসিকিউটর হলেন ভি. ফার্নিনান্দ নাহিমানা, জ্যাঁ-বাসকো বারাইয়াগউইজা, হাসান নাজি (২০০৩), মোকদ্দমা নম্বর*ICTR-99-52-T.*, বিস্তারিত দেখুন : http://69.94.11.53/default.htm, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৯] ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল ট্রাইব্যুনাল ফর রুয়ান্ডা (মোকদ্দমা এখনো চলমান)। প্রসিকিউটর হলেন ভি. তারসিসি রেঞ্জাহো, মোকদ্দমা নম্বর *ICTR 97-31-I* http://69.94.11.53/default.htm, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫০] স্মিথ, রাসেল (২০০৩), *রুয়ান্ডায় গণমাধ্যমে জাতিগত বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া*, বিবিসি অনলাইন সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর : http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/ 3257748.stm, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫১] দক্ষিণ আফ্রিকার '*সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন*।' এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : http://www.doj.gov.za/trc/, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

অধ্যায় দুই

[১] জাতিসজ্ঘ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত নম্বর ৫৯(১), ৬৫ নম্বর পে-নারি বৈঠক, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৬। আরো বিস্তারিত দেখুনঃ http://daccess- ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/59(I)&Lang=E&Area=RESOLUTION., ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[২] জাতিসজ্ঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯২। ২০০৬ সালের ৩ জুলাই পর্যন্ত জাতিসজ্ঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে জানতে দেখুন : http:// www.un.org/members/list.shtml, ১৯ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩] গুরুত্ব বোঝাতে এরূপে উলে-খিত হয়েছে।

[৪] কমিশন অন হিউম্যান রাইটস্-এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রণীত (রেজিলিউশন নম্বর ১৯৯৭/২৬) জাতিসজ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (১৯৯৮) *স্পেশ্যাল র‌্যাপোটিয়র আবিদ হোসেইন-এর প্রতিবেদনের* জন্য দেখুনঃ UN Doc. E/CN.4/1998/40, Para. 14, 28 January,: http://www.unhchr.ch/ Huridocda/H u r i d o c a . n s f / f b 0 0 d a 4 8 6 7 0 3 f 7 5 1 c 1 2 5 6 5 a 9 0 0 5 9 a 2 2 7 /7599319f02ece8 2dc125660 80045b296?, উন্মুক্ত দলিল, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য। মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসজ্ঘ কমিশন।

[৫] মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসজ্ঘ কমিশন (১৯৯৮), *Right to Freedom of Opinion and Expression Commission on Human Rights Resolution 1998/42* Res. E/CN.4/1998/42, Para. 2, 17 April: http://www.unhchr.ch/ Huridocda/ Huridoca.nsf/TestFrame/ac5072a4cb3166cb8025666a0033ecdd? Opendocument, ১৯ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৬] জাতিসজ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (২০০০) স্পেশ্যাল র‌্যাপোটিয়র আবিদ হোসেইন-এর প্রতিবেদনঃ '*Report on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, submitted in accordance with Commission resolution 1999/36, UN Doc. E/CN.4/2000/63, Para. 43-44, 18 January:http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/16583a84ba1b 3ae5802568bd004e80f7/$FILE/G0010259.pdf, ৭ নভেম্বর ২০০৭। এই নীতিমালাটির উন্নয়ন ঘটিয়েছে বেসরকারি সংগঠন 'আর্টিক্যাল ১৯' (সেন্সরশিপ বিরোধী আন্তর্জাতিক কেন্দ্র)।

[৭] হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (২০০০), রেজিলিউশন E/CN.4/RES/2000/38 Para.2, 20 April: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES. 2000.38. En?Opendocument, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৮] উপরোক্ত, নম্বর ৬, *Report of the Special Rapporteur Report on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*, etc, সংযুক্তি দুই।

[৯] মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক স্পেশাল র‌্যাপোটিয়রের কার্যালয়, আন্ত-আমেরিকা কমিশন অন হিউম্যান রাইটস্ (২০০৪), *মতপ্রকাশের স্বাধীনতার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক আইনগত কাঠামো : Joint Declaration by the UN Special Rapporteur,Organisation*

of Security and Cooperation in Europe on Freedom of the Media and Organisation of American States Special Rapporteur on Freedom of Expression, 6 December: http:// www.cidh.oas.org/relatoria/ showarticle.asp?artID=319&lID=1, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১০] পূর্বোক্ত।

[১১] পূর্বোক্ত।

[১২] জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশন (২০০০), *Civil and Political Rights including the Question of Freedom of Expression: Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, submitted in accordance with Commission Resolution 1999/36, UN Doc. E/CN.4/2000/63, সংযুক্তি এক। ১৮ জানুয়ারি ২০০০, বিস্তারিত দেখুন : http://www.hri.ca/fortherecord2000/ documentation/ commission/e-cn4-2000-63.htm, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৩] আফ্রিকান ইউনিয়ন গঠিত হয় ৫৩টি দেশ নিয়ে। এই ইউনিয়নের মাত্র চারটি দেশ–এঙ্গোলা, দক্ষিণ আফ্রিকা, উগান্ডা এবং জিম্বাবুয়েতে তথ্য অধিকার বিষয়ক আইন রয়েছে। তবে জিম্বাবুয়েতে এ ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধও রয়েছে। সেখানে *The Access to Information and Protection of Privacy Act* (AIPPA) আইন দ্বারা তথ্য প্রবাহে কিছু নিয়ন্ত্রণও জারি রয়েছে।

[১৪] অনুচ্ছেদ ৯(১), *চার্টার অন হিউম্যান এন্ড পিপলস্ রাইটস্*, আফ্রিকান ইউনিয়ন (১৯৮১), আফ্রিকান ইউনিয়নের দফতর, দলিল নম্বর-CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21I.L.M:http:/ /www.ilo.org/public/english/employment/skills/ hrdr/instr/afri_2.htm, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৫] আফ্রিকান কমিশন অন হিউম্যান এন্ড পিপলস্ রাইটস (২০০১), রেজিলিউশন নম্বর ৫৪ [(২৯) ০১], ৭ মে, *Resolution on the Adoption of the Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa*: http://www.achpr.org/ english/declarations/ declaration_freedom_exp_en.html, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৬] পূর্বোক্ত, ১ ও ৪ নম্বর অনুচ্ছেদ।

[১৭] আর্টিক্যাল ৯, *আফ্রিকান ইউনিয়ন কনভেনশন (২০০৩) অন প্রিভেনটিং এন্ড কমব্যাটিং করাপশান*, ১১ জুলাই: http://www.africa-union.org/Official_documents/ Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Convention%20on%20Combatin g%20Corruption.pdf, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৮] পূর্বোক্ত।

[১৯] আমেরিকান রাষ্ট্রপুঞ্জে (ওএএস) বর্তমানে সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা ৩৪টি। তার মধ্যে ২৪টি দেশ মানবাধিকার বিষয়ক আমেরিকা সনদ অনুসমর্থন করেছে। আমেরিকান রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে যেসব দেশে তথ্য অধিকার বিষয়ক স্বতন্ত্র আইন রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে: এন্টিগুয়া ও বারবুডা, আর্জেন্টিনা, বেলিজ, কানাডা, কলাম্বিয়া, ডোমেনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, হন্ডুরাস, জ্যামাইকা, মেক্সিকো, পেরু, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রানাডা দ্বীপপুঞ্জ, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো এবং

যুক্তরাষ্ট্র।

[20] আন্তঃআমেরিকান রাষ্ট্রসমূহের যে মানবাধিকার কমিশন রয়েছে সেই কমিশন ১৯৬৯ সালে মানবাধিকার বিষয়ক যে সনদ গ্রহণ করে তার অনুচ্ছেদ ১৩(১) : http://www.thirdworldtraveler.com/Human%20Rights%20Documents/AmerConven_HumanRights.html, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[21] আইন অনুযায়ী (১৯৮৫) সাংবাদিকতা করতে হলে যে কোনো পেশাগত সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। এই বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক মন্তব্যের জন্য দেখুন : OC-5/85, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. A) No. 5 (1985), para. 70, ১৩ নভেম্বর, *Claude Reyes vs. Chile* (2006) শীর্ষক মামলা থেকে উদ্বৃত, মোকদ্দমা নম্বর ১২.১০৪, পৃষ্ঠা ৬। (আন্তঃআমেরিকান রাষ্ট্রসমূহের কোর্ট অন হিউম্যান রাইটস্) : http://www.article19.org/pdfs/cases/claude-v.-chile-commission-.pdf, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[22] আন্তঃআমেরিকান রাষ্ট্রসমূহের '*বলার স্বাধীনতা সম্পর্কিত নীতিমালা বিষয়ক সনদ*', আন্তঃ আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহের জোট, ২০০০; আরো বিস্তারিত দেখুন: http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=26&lID=1, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[23] পূর্বোক্ত, প্যারা চার।

[24] *ক্লাউডি রেইয়েস ও অন্যান্য বনাম চিলি*, ২০০৬, আন্তঃআমেরিকান কোর্ট অব হিউম্যান রাইটস্; দেখুন, www.justiceinitiative.org/db/resource2/ fs/?file_id=18907, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[25] সহায়ক তথ্য (২০০৬), *চিলির রিও কনডোর ভ্যালির অন্ধকার অধ্যায়*, ২৭ জানুয়ারি: http://www.accessinfo.org/data/File/Rio%20Condor%20Case%20Study.doc, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[26] *চিলির ডিক্রি আদালত ৬৬০ ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ষ্ট্যাটিউ* (১৯৯৩) (চিলি): www.cochilco.cl/english/normativa/pdf/dl600_eng.pdf ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[27] পূর্বোক্ত, নম্বর ২৫: *চিলির রিও কনডোর ভ্যালির অন্ধকার অধ্যায়*, ইত্যাদি।

[28] পূর্বোক্ত।

[29] পূর্বোক্ত।

[30] পূর্বোক্ত।

[31] পূর্বোক্ত, নম্বর ২২ : *ক্লাউডি রিইচ এবং অন্যান্য বনাম চিলি*, পৃ. ৪১, অনুচ্ছেদ ৭৬।

[32] পূর্বোক্ত।

[33] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩। ৩৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩, অনুচ্ছেদ ৫৭ (৪১), ২৬ আগস্ট ২০০৫, আইন নম্বর ২০,০৫০; এই দিন থেকে চিলির সংশোধিত সংবিধান কার্যকর হয়।

[35] ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউরোপের ২৭টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত। শিগগির আরো তিনটি দেশ এই ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত হবে বলে আলোচনা চলছে। তিনটি বাদে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত সকল দেশে তথ্য অধিকার বিষয়ক আইন রয়েছে। ইউরোপের যেসব দেশে

(ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত বা বাইরের) তথ্য অধিকার বিষয়ক সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে তারা হলো আলবেনিয়া, আর্মেনিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, বসনিয়া ও হার্জেগোবিনা, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, চেক রিপাবলিক, ডেনমার্ক, এস্টোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, হাঙ্গেরী, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইটালী, লাতভিয়া, লিচটেনস্টেইন, লিথুনিয়া, মেসিডোনিয়া, মলদোবা, মন্টিনিগ্রো, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া, সার্বিয়া, স্'-াভাকিয়া, স্'-াভেনিয়া, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য এবং ইউক্রেইন। যে তিনটি দেশে তথ্য অধিকার আইন নেই, তারা হলোঃ লুক্সেমবার্গ, সাইপ্রাস এবং মাল্টা। এর মধ্যে শেষোক্ত তিনটি দেশ আবার কমনওয়েলথভুক্ত। এর বাইরে, গ্রিসে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা বিষয়ে কোড অব এথিকস্ রয়েছে।

[৩৬] আর্টিক্যাল ১০, কাউন্সিল অব ইউরোপ (১৯৫০), *মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা বিষয়ক ইউরোপীয় সনদ* : http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm., ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩৭] আর্টিক্যাল ১১(১), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (২০০৭), *ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে মৌলিক অধিকারের সনদ* : http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1916&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en., ১২ মে ২০০৮ সালে সংগৃহীত তথ্য। ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট যোশে ম্যানুয়েল বার্সো (José Manuel Barroso) বলেছেন, উপরোক্ত সনদ স্বাক্ষর ও ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট, কমিশন এবং কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টরা জনসমাজে প্রকাশ্যে এই বার্তাই পৌঁছে দিতে চেয়েছেন যে, মানবাধিকার বাস্তবায়নে ইউরোপিয়ান সংবিধানের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

[৩৮] ১৯৯২ সালে Maastricht-এ সম্পাদিত একটি চুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত দলিল। এ চুক্তিটিকে তথ্য অধিকার বিষয়ক সনদ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। এই সনদের উপর ভিত্তি করে একটি আচরণবিধি তৈরি হয় পরবর্তীকালে। যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব হলো কমিশন ও কাউন্সিলের। এই আচরণবিধিতে বিস্তারিতভাবে উলে-খ রয়েছে, কোন পরিস্থিতিতে উপরোক্ত সংস্থাগুলোর কাছে থাকা তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা যাবে। ১৯৯৭ সালের আমসট্রাডাম চুক্তি এ ক্ষেত্রে এক ধাপ অগ্রগতি ঘটিয়েছে ইসি চুক্তিতে ২৫৫ নম্বর অনুচ্ছেদটি সংযুক্ত করে। এই অনুচ্ছেদ প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্রে আগ্রহীদের জানার অধিকার দিয়েছে। ২৫৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, আমসট্রাডাম চুক্তি কার্যকর হওয়ার দুই বছরের মধ্যে এ সম্পর্কিয় দ্বিতীয় একটি আইন প্রণীত হয়। উলে-খ্য, চুক্তিটি কার্যকর হয় ১৯৯৯ সালে। আর তথ্যে অবাধ অধিকার বিষয়ক রেগুলেশন অনুমোদিত হয় ২০০১ সালে। যে রেগুলেশনের আলোকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের "প্রায় সকল কর্মকাণ্ডের সকল দলিলপত্র, যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে, তা সেই প্রতিষ্ঠান নিজে থেকে সংগ্রহ করুক বা তাকে প্রেরণ করা হোক, প্রাপ্তিযোগ্য।" এর পাশাপাশি ২০০২ সালে ইউরোপিয়ান ন্যায়পাল দফতর থেকে "ন্যায়সম্মত প্রশাসনিক আচরণ" বিষয়ে একটি আচরণবিধি প্রচার করা হয়েছে। এটাও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য কার্যকর হয়েছে। এই আচরণবিধির অনুচ্ছেদ ২২ অনুযায়ী "জনগণের যে কোনো সদস্য থেকে কোনো তথ্য পাওয়ার আবেদন এলে সংশি-ষ্ট কর্মকর্তা সে অনুযায়ী তথ্য প্রদান করবেন।" যদি কোনো কর্মকর্তা তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হন তা হলে তার অপারগতার কারণও জানাতে হবে। তথ্য

প্রাপ্তির আবেদন সময়মত ফয়সালার বিষয়ও বলে দেয়া হয়েছে ঐ আচরণবিধিতে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার বিষয়ে জনগণের যেসব অধিকার রয়েছে তা তাদের জানানোও প্রশাসনের দায়িত্ব হিসেবে অভিহিত করেছে এই আচরণবিধি।

[৩৯] Freedominfo.org (২০০৮), *সরকারি বিভিন্ন কর্মকর্তা বিভিন্ন সময় সংস্কার সাধনের অনেক আবেদন করার পর কাউন্সিল অব ইউরোপিয় ডিউকস্ উন্মুক্তকরণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে; তবে তারা তথ্য অধিকার বিষয়ে যে সনদ কার্যকর করেছে তা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে দুর্বল*, ৪ এপ্রিল : http://www.freedominfo.org/news/20080402.htm. ১২ মে ২০০৮ সালে সংগৃহীত তথ্য। আসলে ঐ সনদটি গৃহীত হয় শে-াভেনিয়ার এতদবিষয়ক প্রস্তাবিত সনদে কোনোরূপ সংযোজন পরিবর্তন ছাড়াই। যা ১০ জন তথ্য কমিশনার কর্তৃক সমর্থিত ছিল। নাগরিক সমাজের সুপারিশগুলোই কেবল এতে প্রতিফলিত হয়। এ বিষয়ে নাগরিক সমাজের কর্ম তৎপরতার জন্য দেখুন: Access Info: Front Page: http://www.access-info.org/

[৪০] ইউরোপ বিষয়ক জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক কমিশন (১৯৯৮), *তথ্য অধিকার বিষয়ক আরহাস কনভেনশন*, নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ এবং পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে বিচার পাওয়ার সুযোগ তৈরি বিষয়ক ধারা সম্পর্কে দেখতে: http://www.unece.org/env/pp/welcome.html. ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪১] যে সমস্ত এশিয়-প্যাসেফিক দেশে তথ্য অধিকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে এবং সেই আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন রয়েছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয়া, ভারত, ইজরায়েল, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, তাজাকিস্তান, থাইল্যান্ড এবং উজবেকিস্তান।

[৪২] আর্টিক্যাল ৩২(১), আরব লীগভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের কাউন্সিল (১৯৯৪), *আরব মানবাধিকার কেন্দ্র*; আরো বিস্তারিত দেখুনঃ http://www1.umn.edu/humanrts/instree/arabhrcharter.html, ১৯ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৩] এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ১০টি দেশের ক্ষেত্রে এই সনদ প্রযোজ্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান দেশগুলোর জোট আসিয়ান সম্পর্কে আরো বিস্তারিত দেখুন : http://www.aseansec.org/74.htm, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৪] এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক: অর্গানাইজেশন ফর ইকোনোমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট, *দুর্নীতি বিরোধী উদ্যোগ, এই উদ্যোগে যুক্ত দেশগুলো এবং তাদের অর্থনীতি সম্পর্কে* জানতে দেখুন: http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_34982156_35315367_35030743_1_1_1_1,00.html, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৫] পয়েন্ট ১২.৩, *প্যাসিফিক পরিকল্পনা* (২০০৫): http://www.pacificplan.org/tikipage.php?pageName=HomePage, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৬] জর্জ উরইন, সেক্রেটারী জেনারেল, প্যাসিফিক আইল্যান্ড ফোরাম সচিবালয়। ২০০৭ *সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি এই ফোরামের সচিবালয় তার ওয়েবসাইট আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করে। সেখানেই সেক্রেটারী জেনারেল উপরোক্ত মন্তব্য করেন।* এ সম্পর্কে দেখুন: http://www.forumsec.org/pages.cfm/newsroom/speeches/speeches-2007/sgs-remarks-forum-secretariat-website-launch.html, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত

তথ্য।

[৪৭] *প্রোমোটিং ওপেন গভর্মেন্ট : জানার অধিকার বিষয়ে কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের জন্য নির্ধারিত নীতিমালা ও নির্দেশনাগুলো (১৯৯৯)*, এই নীতি ও নির্দেশনা তৈরি হয়েছে ৩০-৩১ মার্চ অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ বিশেষজ্ঞ দলের এতদসংক্রান্ত বৈঠকে। এ সম্পর্কে দেখুন: http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/international/cw_standards/commonwealth_expert_grp_on_the_rti_99-03-00.pdf, ১৯ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৮] সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসজ্ঞ কমিটি (২০০০), *সাধারণ মন্তব্য নম্বর ১৪, E/C.12/2000/4,* para 12: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En ২৬ অক্টোবর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৯] পূর্বোক্ত, ৪৪ নম্বর প্যারা।

[৫০] সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসজ্ঞ কমিটি (২০০৩), *সাধারণ মন্তব্য নম্বর ১৫ E/C.12/2002/11*,para.45:http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/a5458d1d1bbd713fc1256cc400389e94?Opendocument, ২৬ অক্টোবর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫১] সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসজ্ঞ কমিটি (১৯৯৯), *সাধারণ মন্তব্য নম্বর ১৩ E/C.12/1999/10,* para. 56: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.1999.10.En?OpenDocument, ২৬ অক্টোবর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫২] সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত জাতিসজ্ঞ কমিটি (১৯৯৯), *সাধারণ মন্তব্য নম্বর* ১২ E/C.12/1999/5, para.23: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3d02758c707031d58025677f003b73b9?Opendocument, ২৬ অক্টোবর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫৩] *সকল ধরনের অভিবাসী শ্রমিক এবং তাদের পরিবারবর্গের অধিকারের সুরক্ষা বিষয়ক জাতিসজ্ঞ কর্তৃক (১৯৯০) কার্যকর আন্তর্জাতিক সনদ*। এ সম্পর্কে দেখুন: http://www.ohchr.org/english/law/cmw.htm, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫৪] *নারীর বিরুদ্ধে কার্যকর সকল ধরনের বৈষম্য নিরোধ বিষয়ে* জাতিসজ্ঞ কর্তৃক ১৯৭৯ সালে কার্যকর *সিডও সনদ*। এ সম্পর্কে দেখুন: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫৫] জাতিসজ্ঞ কর্তৃক ১৯৮৯ সালে কার্যকর শিশু অধিকার সনদ। এ সম্পর্কে দেখুন :http://www.ohchr.org/english/law/crc.htm, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫৬] জাতিসজ্ঞ (১৯৯২), *পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক রিও ঘোষণা*: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫৭] জাতিসজ্ঞের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত বিভাগ, স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভাগ, (২০০৪), *এজেন্ডা ২১*:http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda

21/english/agenda21chapter1.htm. ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫৮] জাতিসঙ্ঘের (২০০৩) *দুর্নীতি বিষয়ক কনভেনশনের অনুচ্ছেদ* ১৩: http://www.unodc.org/unodc/crime_convention_corruption.html ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

অধ্যায় তিন

[১] দেখুন, চান্দ, এ. (সম্পাদিত) (২০০৫): `*Impact of ICT on Rural Development in Solomon Islands: the PFNet (People First Network) Case,*' এবং এই যোগাযোগ উদ্যোগ সম্পর্কে দেখুন: http://www.comminit.com/ict/ictcasestudies/ictcasestudies-18.html, ১২ নভেম্বর ২০০৭.

[২] সলোমন দ্বীপপুঞ্জের People First Network (PFnet) এবং এই নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেখুন: http://www.peoplefirst.net.sb/general/PFnet.htm. ১২ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩] পূর্বোক্ত।

[৪] সলোমন দ্বীপপুঞ্জের রাষ্ট্রীয় ভাষা হলো ইংরেজি, যদিও তাতে কেবল জনসংখ্যার ১-২ শতাংশ মানুষ কথা বলে। দেখুন: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ geos/bp.html. দেশটিতে স্বাক্ষরতার হার ৫-৬০ শতাংশ এবং প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার গড় বয়স ৪.৪ বছর। এ সম্পর্কে দেখুন : Gordon, R. G., Jr. (ed.) (২০০৫) 'Ethnologue: Languages of the World': http://www. ethnologue.com/, ১২ মে ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫] উপরোক্ত, নং ১ : চান্দ, এ. (সম্পাদিত) (২০০৫): `*Impact of ICT on Rural Development in Solomon Islands: the PFNet (People First Network) Case*'.

[৬] জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (২০০৬), *সলোমন দ্বীপপুঞ্জের সরকার তার সরকারি ওয়েবসাইট চালু করলো*, ২৭ ফেব্রুয়ারি: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=21393&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, ১৩ জুন ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৭] সলোমন দ্বীপপুঞ্জের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে দেখুন: http://www.pmc.gov.sb/, ২৭ অক্টোবর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৮] *কানাডার পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক আইন*, ১৯৯৯; এই আইন সম্পর্কে দেখুন: http://laws.justice.gc.ca/en/C-15.31/text.html, ২৭ অক্টোবর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৯] ও' নীল, এস (২০০৭), '*বিষাক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার সম্পর্কে আইন অনুযায়ী জানার অধিকার বিষয়ে হেলথ বোর্ডের অনুসন্ধান*', *ইনসাইড টোরেন্টো*, ১০ জুলাই ২০০৭: www.insidetoronto.ca/News/City_Hall/article/29188, ১৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত

তথ্য।

[১০] Mittelstaedt, M (২০০৭), *ছোটদের ক্ষেত্রে জানার অধিকার বিষয়ক আইন প্রয়োগ হতে পারে', দ্য গে-াব এন্ড মেইল*, ৯ জুলাই ২০০৭: http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/LAC.20070709.TOTOXIC09/EmailTPStory/TPNational. ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১১] পূর্বোক্ত।

[১২] '*টোরেন্টোর প্রয়োজন কমিউনিটিভিত্তিক জানার অধিকর বিষয়ক আইন*', টোরেন্টো এনভায়রনমেন্টাল এলায়েন্স ওয়েবসাইট http://www.torontoenvironment.org/node/315. ২৭ অক্টোবর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৩] এ ধরনের সার্ভিসসমূহের জন্য কখনো কখনো স্বল্প ফি ধার্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাজ্যের রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সম্পর্কিত বিস্তারিত জানা যাবে সেখানকার ২০০২ সালের *ভূমি রেজিস্ট্রেশন আইনের* আলোকে। দেখুন: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2002/20020009.htm, ২৭ অক্টোবর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৪] ভারতীয় সংবিধানের আর্টিক্যাল ১৯(১)(ক)-তে বলা এবং প্রকাশের স্বাধীনতাকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে আদালতের রায়ে উলে-খ করা হয় যে, উপরোক্ত অধিকার মৌলিক অধিকারও বটে। *উত্তর প্রদেশ সরকার বনাম রাজ নারায়ন* মামলায় এই রায় দেয়া হয়েছিল। দেখুন, AIR 1975, SC 865. পরবর্তীকালে আরো অনেক মামলায় আদালতের ঐ রায়ের প্রতিধ্বনি দেখা গেছে, যেমন– *Reliance Petrochemicals Ltd v Proprietors of Indian Express Newspapers Bombay Pvt Ltd, AIR 1989 SC* 190; *Indian Express Newspapers (Bombay) Pvt Ltd v India (1985) 1 SCC 641* and *Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, and Others, v. Cricket Association of Bengal and others*, 1995 (002) SCC 0161 SC.

[১৫] ভারতীয় সংবিধানের আর্টিক্যাল ২১-এ জীবনের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। যে মামলায় আদালতের তরফ থেকে বলা হয় যে, তথ্য অধিকার জীবনের অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ– তা হলো, *S.P. Gupta v. Union of India* (AIR 1982 SC, 149).

[১৬] হাঙ্গেরি প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের (১৯৪৯) আর্টিক্যাল ৬১ : http://www.servat.unibe.ch/icl/hu00000_.html, ২৭ অক্টোবর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৭] *সিদ্ধান্ত নম্বর ৩২/১৯৯২ (VI.29) ABH*, প্রাইভেসি ইন্টারনেশনালের (২০০৬) '*বিশ্ব জুড়ে তথ্য স্বাধীনতার অবস্থা: তথ্য অধিকার বিষয়ক সরকারি আইন বিষয়ে বিশ্ব বাস্তবতা সম্পর্কিত জরীপ*' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে উদ্বৃত। পৃ. ৩৭; আরো দেখা যাবে: http://www.privacyinternational.org/foi/foisurvey2006.pdf, ১৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৮] *দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের* (১৯৯৬) আর্টিক্যাল ৩২: http://www.info.gov.za/documents/constitution/index.htm, ১৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৯] প্রমোশন অব একসেস টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট ২০০০ (দক্ষিণ আফ্রিকা) : http:// www.

info.gov.za/gazette/acts/2000/a2-00.pdf, ১৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

২০ 'সংযুক্তি : এক' দেখুন। এতে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের তথ্য অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক আইন সম্পর্কিত বিবরণ রয়েছে।

২১ ওপেন সোসাইটি জাস্টিস ইনেশিয়েটিভ (২০০৬), *'ট্রান্সপারেন্সি এন্ড সায়লেন্স : তথ্য অধিকার আইন ও তার অনুশীলন বিষয়ে ১৪টি দেশে পরিচালিত জরিপের তথ্য'*, নিউইয়র্ক, পৃ.১১; আরো বিস্তারিত দেখুন : http://www.justiceinitiative.org/db/resource2/fs/?file_id=17488, ১৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

২২ ফুলার, বি (২০০৭) *'Open Records by 2009', Caymanian Compass*, ২৭ জুন: http://www.caycompass.com/cgi-bin/CFPnews.cgi?ID=1023191, ১৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

২৩ *দ্য ফ্রিডম অব ইনফরমেশন অ্যাক্ট, ২০০৪* (এন্টিগুয়া এন্ড বারবুডা): http://www.ab.gov. ag/gov_v2/government/parliament/laws/freedom_of_info.pdf, ১৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

২৪ উপরোক্ত, নম্বর ২১: *'ট্রান্সপারেন্সি এন্ড সায়লেন্স : তথ্য অধিকার আইন ও তার অনুশীলন বিষয়ে ১৪টি দেশে পরিচালিত জরিপের তথ্য'*, পৃ.৭৫।

২৫ তথ্য স্বাধীনতা বিষয়ক সংশোধনী বিলটি পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয় পার্লামেন্ট সদস্য ডেভিড ম্যাকলিয়ান কর্তৃক ২০০৬-০৭ সালে। এই বিলের পুরো বিবরণের জন্য দেখুন : http://www.publications.parliament.uk/pa/pabills/200607/freedom_of_inforation_amendment.htm.৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

অধ্যায় চার

১ জ্যামাইকা সরকার (২০০১) : *কিটিং রিপোর্ট : জ্যামাইকার শিশু সদন এবং নিরাপত্তা কেন্দ্রগুলোর পর্যালোচনা*, পৃষ্ঠা ১৩। আরো বিস্তারিত দেখুন: http://www.jamaicansforjustice.org/docs/Keating%20Report.pdf., ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

২ *একসেস টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট, ২০০২* (জ্যামাইকা), http://www.jis.gov.jm// special_sections/Bills%20&%20Acts/atib.htm, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

৩ গোমেজ সি., উইবার ই., জ্যামাইকান ফর জাস্টিস (২০০৭), *কেস স্টাডি অন দ্য ইউজ অব একসেস টু ইনফরমেশন টু ইম্প্রুভ দ্য হিউম্যান রাইটস্ সিচুয়েশন অব চিলড্রেন ইন দ্য কেয়ার অব দ্য জ্যামাইকান স্টেইট।*

৪ জ্যামাইকান ফর জাস্টিস (২০০৬), দ্য *সিসুয়েশন অব চিলড্রেন আন্ডার দ্য কেয়ার অব দ্য জ্যামাইকান স্টেট,* অক্টোবরঃ http://www.jamaicansforjustice.org/docs/FJACHRCHILDRENHomesReportOct06final.pdf, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ২০-৩৬।

৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।

[৭] উপরোক্ত, নম্বর ৩: গোমেজ সি., উইবার ই. (২০০৭), *কেস স্টাডি অন দ্য ইউজ অব একসেস টু ইনফরমেশন টু ইম্প্রুভ দ্য হিউম্যান রাইটস্ সিসুয়েশন অব চিলড্রেন ইন দ্য কেয়ার অব দ্য জ্যামাইকান স্টেইট।*

[৮] উপরোক্ত, নম্বর ৩: গোমেজ সি., উইবার ই. (২০০৭), *কেস স্টাডি অন দ্য ইউজ অব একসেস টু ইনফরমেশন টু ইম্প্রুভ দ্য হিউম্যান রাইটস্ সিচুয়েশন অব চিলড্রেন ইন দ্য কেয়ার অব দ্য জ্যামাইকান স্টেট।*

[৯] উপরোক্ত, নম্বর ২, জ্যামাইকার তথ্য অধিকার বিষয়ক আইন ২০০২।

[১০] জ্যামাইকা তাদের তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে ধাপে ধাপে কীভাবে অগ্রসর হয়েছে এবং হচ্ছে সে সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য দেখুন, Freedominfo, Jamaica (২০০৬): http://www.freedominfo.org/countries/jamaica.htm, ১৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১১] জাতিসঙ্ঘ (১৯৮৯), *শিশু অধিকার বিষয়ক জাতিসঙ্ঘ সনদ*; এ সম্পর্কে দেখুন: http://www.ohchr.org/english/law/pdf/crc.pdf, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১২] ইউনিসেফ, *শিশু অধিকার বিষয়ক সনদ*: http://www.unicef.org/crc/, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৩] জাতিসঙ্ঘ (২০০০), *সামরিক সংঘাতে শিশুদের সম্পৃক্তি বিষয়ক শিশু অধিকার সনদের অপশনাল প্রটোকল*; দেখুন: http://www.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৪] জাতিসঙ্ঘ (২০০০), *শিশুদের বিক্রি বিষয়ক শিশু অধিকার সনদের অপশনাল প্রটোকল*, শিশু পতিতাবৃত্তি এবং শিশু পর্ণোগ্রাফী: http://www.unhchr.ch/html/menu2/dopchild.htm, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৫] *খাদ্য মানদণ্ড বিষয়ক অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড আইন*, ১৯৯১ (অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড উভয় দেশের জন্য প্রযোজ্য): www.comlaw.gov.au/.../ActCompilation1.nsf/0/34F DA538E7B4 0ACFCA256F71004DA6FE/$file/FoodStandANZ91.pdf, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৬] ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে বায়োটেকনোলজি বিষয়ক কোম্পানি সিনজেনটা যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের কাছে এটা স্বীকার করে যে, এই প্রতিষ্ঠান ভুল করে অপরীক্ষিত জিই জাতের শস্য বিটি-১০ ক্রেতাদের মাঝে বিতরণ করেছে, দ্য সেন্টার ফর ফুড সেফটি (২০০৬), আরো বিস্তারিত দেখুন: *Contamination Episodes with Genetically Engineered Crops: United States of America*, p.1:http://www.centerforfoodsafety.org/pubs/Contamination%20episodes%20fact%20sheet.pdf, ১৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৭] *নিউজিল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় তথ্য অধিকার আইন*, ১৯৮২। দেখুন, http://www. legislation.govt.nz/libraries/contents/om_isapi.dll?clientID=568998686&infobase=pal_statutes.nfo&jump=a1982-156&softpage=DOC ২৯ অক্টোবর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[18] জিই ফ্রি নিউজিল্যান্ড (২০০৫), *NZ Authorities Silent on "Unbelievable Sloppiness!" as EU blockades GM Corn*, ১২ মে: http://www.gefree.org.nz/press/o12052005.htm, ১৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[19] *অস্ট্রেলিয়ার তথ্য স্বাধীনতা বিষয়ক আইন*, ১৯৮২ http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/foia1982222/, ১৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[20] পূর্বোক্ত, সেকশন ১৫(২)(গ)

[21] 'কর্নগেট' হলো নিউজিল্যান্ডের একটি রাজনৈতিক কেলেঙ্কারির ঘটনা, যা সংঘটিত হয়েছিল ২০০২ সালে। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন জেনেটিক্যালী মোডিফাইড শস্যবীজ বাজারে ছাড়া হয়েছে এ ধরনের সন্দেহ থেকে ২০০০ সালে ঐ কেলেঙ্কারির গোড়াপত্তন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে ফেরিত বীজের চালানে খানিকটা জেনেটিক্যালী মোডিফাইড শস্যবীজও রয়েছে–এ বিষয়টি জনসমাজে প্রথম তুলে ধরেন নিকি হাজার, তাঁর বই '*সীডস্ অব ডিস্ট্রাস্ট*'-এ। পরে অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ঐ বীজের চালানে অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় জেনেটিক্যালী মোডিফাইড দূষিত শস্যবীজ রয়েছে। পরে এ বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় গ্রীন পার্টি সোচ্চার হয়ে উঠলে তা ক্রমে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ হয়ে উঠে। জেনেটিক্যালী মোডিফাইড শস্যবীজ সম্পর্কে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির ভূমিকার কারণে এক পর্যায়ে এ বিষয় জাতীয় নির্বাচনের এজেন্ডায়ও চলে আসে। ২০০২ সালে নিউজিল্যান্ডের জাতীয় নির্বাচনের কয়েক মাস আগে নিকি হাজার-এর বই '*সীডস্ অব ডিস্ট্রাস্ট*' প্রকাশিত হলে বিষয়টি সেখানকার ভোটারদের কাছে '*কর্নগেট*' নামে আলোচিত হতে থাকে। দেখুন: http://en.wikipedia.org/ wiki/Corngate, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[22] গ্রীনপার্টি, অটিআরো, নিউজিল্যান্ড (২০০৬), *ক্রেতাদের জানার অধিকার (খাদ্য বিষয়ক তথ্য) বিল, প্রথম খসড়া*, ২৮ জুন: http://www.greens.org.nz/searchdocs/speech9963.html, ১৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[23] নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্ট, *Bills, SOPS, Acts, Regulation*s: http://www.parliament.nz/en-NZ/PB/Legislation/Bills/6/5/7/65779d6a92964c508670a3bba1544c1e.htm, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[24] পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২০০৪), *জেনেটিক্যালী মোডিফিকেশন: নিউজিল্যান্ডের দৃষ্টিভঙ্গী*: New Zealand: http://www.mfe.govt.nz/publications/ organisms/gm-nz-approach-jun04/genetic-modification-nz-approach.pdf.

[25] উপরোক্ত, নম্বর ১৭, *নিউজিল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় তথ্য আইন*, ১৯৮২।

[26] পূর্বোক্ত। নিউজিল্যান্ডে তথ্য অধিকার বিষয়টি ১৯৮২ সালের রাষ্ট্রীয় তথ্য আইন ছাড়াও *New Zealand Bill of Rights Act,* 1990 (NZBORA)-এও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এই আইনে জনগণের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রগুলো বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। যে নিশ্চয়তার আওতায় রয়েছে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও মতামত চাওয়া, পাওয়া এবং বিনিময়ের অধিকারও।

[27] *নিউজিল্যান্ডের স্থানীয় সরকার বিষয়ক রাষ্ট্রীয় তথ্য ও বৈঠক আইন*, ১৯৮৭: http:// w ww .legislation.govt.nz/libraries/contents/om_ isapi.dll?

clientID=317744615&infobase=pal_statutes.nfo&jump=a1987-174&softpage =DOC as on 20 November 2007, ১৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[২৮] আইনটি পর্যালোচনার বহুমুখী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আইন কমিশন ১৯৯৭ সালে একটি পর্যালোচনা করেছে। এ ছাড়া ২০০৫ সালে বিশেষজ্ঞ স্টিভেন প্রাইসও এক দফা পর্যালোচনা করেছেন।

[২৯] জাতিসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত বিভাগ (১৯৮৬), *রেজিউলিশন নম্বর A/RES/39/248*: http://www1.umn.edu/humanrts/links/consumerprotection.html, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩০] পূর্বোক্ত, অনুচ্ছেদ ৩১।

[৩১] আর্টিক্যাল ১৯, সিএইচআরআই, সিপিএ এবং পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশন (২০০১), *তথ্য অধিকার বিষয়ে বৈশ্বিক প্রবণতা : দক্ষিণ এশিয়াভিত্তিক জরিপ*, পৃ. ২৩-২৪: www.article19.org/pdfs/publications/south-asia-foi-survey.pdf ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩২] *থ্যাইল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় তথ্য আইন*, ১৯৯৭ http://www.oic.go.th/ content_eng/act.htm, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩৩] উপরোক্ত, নম্বর ৩১, আর্টিক্যাল ১৯, সিএইচআরআই, সিপিএ এবং পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশন (২০০১), *তথ্য অধিকার বিষয়ে বৈশ্বিক প্রবণতা : দক্ষিণ এশিয়া ভিত্তিক জরিপ*।

[৩৪] ওপাসসিরিট, সি. (২০০২), "*থাইল্যান্ড: তথ্য স্বাধীনতা ও প্রাইভেসির মধ্যকার আন্ত সম্পর্ক বিষয়ক একটি কেস স্টাডি*", *প্রাইভেসি ল এন্ড পলিসি রিপোর্টার*, ২৮ মার্চ, http://www.austlii.edu.au/au/journals/PLPR/2002/42.html, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩৫] রবার্টস্, এ (২০০৬)-এর `*Blacked Out: Government Secrecy in the Information Age*,' থেকে উদ্বৃত, পৃ. ৪। http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue. asp?isbn=9780521858700&ss=exc, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৩৬] উপরোক্ত, নম্বর ৩১ : *তথ্য অধিকার বিষয়ে বৈশ্বিক প্রবণতা : দক্ষিণ এশিয়াভিত্তিক জরিপ*।

[৩৭] উপরোক্ত, নম্বর ৩৫ : রবার্টস এ., *ব-ল্যাক আউট: গভর্মেন্ট সিক্রেসি...*, পৃষ্ঠা ৪।

[৩৮] পূর্বোক্ত।

[৩৯] সেকশন ৪০, *রাজকীয় থাইল্যান্ডের সংবিধান*, ১৯৯১: http://www.parliament.go.th/files/library/law3e-e.htm, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪০] এশিয়া উইক (২০০০), "*সম্পাদকীয়: Making Tea History – A Blow to School 'tea money'.Heralds Positive Change*", মে ১২:http://www.asiaweek.com/ asia week/magazine/2000/0512/edit2.html, ১৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪১] প্রাইভেসি ইন্টারন্যাশনাল (২০০৬), "*২০০৬-এ বিশ্বব্যাপী তথ্য স্বাধীনতার অবস্থা–রাষ্ট্রীয় তথ্য অধিকার আইনগুলোর কার্যকারিতা বিষয়ে একটি বৈশ্বিক জরিপ*", পৃ.১৪৭-১৪৮: www.privacyinternational.org/foi/foisurvey2006.pdf, ১৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪২] আর্টিক্যাল ২৬, জাতিসজ্ঘ সাধারণ পরিষদ (১৯৪৮), *সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ*, রেজিলিউশন *নম্বর ২৭১ এ (III)*, ১০ ডিসেম্বর : http://www.un.org/Overview/rights.html, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৩] জাতিসজ্ঘ (১৯৯৯), *শিক্ষার অধিকার (আর্টিক্যাল ১৩) E/C.12/1999/10 (সাধারণ মন্তব্য)*, প্যারা ২৯: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ae1a0b126d068e868025683c003c8b3b?Opendocument, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৪] *শিক্ষা অধিকার বিষয়ক প্রকল্প* (২০০৬), টেবিল এক : *স্কুল বয়সী শিশুদের জন্য বিনাবেতনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেনি যেসব দেশ, অঞ্চল ভিত্তিতে তাদের তালিকা:* http://www.right-to-education.org/, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৫] শিক্ষা অধিকার বিষয়ক প্রকল্প (২০০৪), *At What Age... are school children employed, married and taken to court?* ২০ এপ্রিল: http://www.right-to-education.org/content/age/index.html, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৬] এই কেস স্টাডিতে ব্যবহৃত তথ্যগুলো সরবরাহ করেছে 'দ্য ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশান' (২০০৭), *FOIA Application Positive Example on Settling an Issue of Deforestation in Slovakia*: Slovakia.

[৪৭] *স্লোভাকিয়ার তথ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার বিষয়ক আইন*, http://www.elaw.org/resources/text.asp?ID=331 ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৮] সেকশান ২৩, *স্লোভাকিয়ার সংবিধান*, ১৯৯২: http://www.servat.unibe.ch/law/icl/lo00000_.html, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৪৯] উপরোক্ত, নম্বর ৪৭ : *স্লোভাকিয়ার তথ্যে প্রবেশাধিকার বিষয়ক আইন*।

[৫০] জাতিসজ্ঘ (১৯৭২), *মানবিক পরিবেশ বিষয়ক জাতিসজ্ঘ সম্মেলনের সনদ*: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫১] জাতিসজ্ঘ (২০০০), *অর্জনযোগ্য সর্বোচ্চ মানের স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক নির্দেশনা: E/C.12/2000/4 (সাধারণ মন্তব্য)*: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En, ২৯ অক্টোবর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫২] জাতিসজ্ঘ (১৯৯২), *পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক রিও ঘোষণা*: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৫৩] এই সনদের বিষয়ে আরো তথ্যের জন্য দেখুন, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৪।

৫৪ আর্থ ট্রেন্ড (২০০০), *পরিবেশ বিষয়ক ইনফরমেশান পোর্টাল, পোভার্টি রিসোর্স*: http://earthtrends.wri.org/povlinks/country/india.php, ২১ জুন ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

৫৫ ভারতীয় খাদ্য ও গণবিতরণ বিভাগ (১৯৯৭), *নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর জন্য গণবিতরণ ব্যবস্থা*, http://fcamin.nic.in/dfpd/EventDetails.asp?EventId=26&Section=PDS&ParentID=0&Parent=1&check=0, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

৫৬ টাইমস্ নিউজ নেটওয়ার্ক (২০০৭), `*তিন বছরে গণবিতরণ ব্যবস্থার ৩১,৫০০ কোটি টাকার শস্যাদি চুরি*,' দ্য টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/2375230.cms, 20 নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

৫৭ *ভারতের তথ্য অধিকার বিষয়ক আইন*, ২০০৫: http://righttoinformation.gov.in/ ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

৫৮ আসলাম ভাই হলেন গুজরাটের Panchmahals জেলার সেই ৩০ জন নারী-পুরুষের একজন– যারা কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ কর্তৃক *তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রশাসনিক কাঠামো থেকে এবং সরকারি বিভিন্ন সার্ভিস সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার কলাকৌশল* বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

৫৯ জেগলার, জে. (২০০১), *খাদ্য অধিকার বিষয়ক জাতিসঙ্ঘের বিশেষ র‍্যাপোটিয়র*, এপ্রিল http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/703958.stm, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

৬০ পূর্বোক্ত।

৬১ জাতিসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা (ফাও, ২০০৭), '*সামনের পথ : ফাও এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো*': http://www.fao.org/mdg/, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

৬২ *সমমজুরি আইন*, ১৯৭০ (যুক্তরাজ্য): http://www.womenandequalityunit.gov.uk/legislation/equal_pay_act.htm, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

৬৩ স্কটিশ নারীরা পুরুষদের চেয়ে ২৯ শতাংশ কম আয় করে থাকে। ইংল্যান্ডের দক্ষিণের নারীরাও পুরুষদের চেয়ে ৩০ শতাংশ কম আয় করে থাকেন। 4NI (২০০৫) Survey Reveals Widening Gender Gap in Pay, 30 August : http://www.4ni.co.uk/news.asp?id=43724, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

৬৪ বিবিসি ওয়ার্ল্ড নিউজ (২০০৪), *জেন্ডারভিত্তিক মজুরি বৈষম্য ধারণার চেয়েও বেশি*, ১ জুন: http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/3765535.stm, ১৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

৬৫ উইমেন এন্ড ইকুয়ালিটি ইউনিট (২০০৭), *মজুরি বৈষম্য বলতে কী বোঝায় এবং কেনইবা তা আছে?* নভেম্বর: http://www.womenandequalityunit.gov.uk/pay/pay_facts.htm, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

৬৬ *তথ্য স্বাধীনতা আইন*, ২০০৫ (যুক্তরাজ্য): http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/

20000036.htm, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৬৭] আনুমানিক ১৩ হাজার মার্কিন ডলারের সমান, ভারকেইক, আর., (২০০৬) '*বিবিসিতে নারী প্রতিবেদকদের পুরুষ সহকর্মীদের চেয়ে ৬৫০০ পাউন্ড করে কম মজুরি দেয়া হয়।*' দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট: http://news.independent.co.uk/media/article2055563.ece, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৬৮] নারী ও কর্ম কমিশন (২০০৬), *Shaping a Fairer Future*: http://www.womenandequalityunit.gov.uk/publications/wwc_shaping_fairer_future06.pdf, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৬৯] উইমেন্স ইকোনোমিক পার্টিসিপেশন টীম, কমিউনিটিজ এন্ড লোকাল গভর্নমেন্ট (২০০৭), *Tackling the Gender Pay Gap Fact Sheet,* পৃ. ২, ২৩ মে: http://www.womenandequalityunit.gov.uk/publications/genpaygap_facts_jun07.doc, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৭০] ধারা, ৩.৪ 'মজুরি' দ্য বিবিসি (২০০৭), *জেন্ডার ইকুইটি স্কীম* : http://www.bbc.co.uk/info/policies/text/gender_equality_scheme.html, ২২ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত।

[৭১] সিডও সনদের (*International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), আর্টিক্যাল ১১(১)। এই আর্টিক্যালে রাষ্ট্রপক্ষের দায়িত্ব হিসেবে বলা হয়েছে: "..কর্মক্ষেত্রে নারীর বিরুদ্ধে জারি থাকা বৈষম্য দূর করতে সকল ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য, যে উদ্যোগের ভিত্তি হবে নারী পুরুষে সমতার নীতি, তথা সমঅধিকার। বিশেষ করে (ঘ) সমমজুরির অধিকার, সকল ধরনের কর্মসুবিধা সমান আকারে পাওয়ার অধিকার, সমধর্মী কাজে মালিকদের কাছ থেকে সম সুবিধাগুলো পাওয়ার অধিকার এবং কাজের গুণগত মান যাচাইকালে সমমূল্যায়ন প্রাপ্তির অধিকার।" জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ-এ সিডও সনদ অনুমোদিত হয় ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর। দেখুন: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/, ২১ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৭২] উপরোক্ত, নম্বর ৬৬: *যুক্তরাজ্যের তথ্য স্বাধীনতা আইন*, ২০০৫।

[৭৩] *অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট*, ১৯৮৯ (যুক্তরাজ্য): http://www.opsi.gov.uk/ acts/acts1989/Ukpga_19890006_en_1.htm, ২২ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৭৪] স্কটল্যান্ডের ২০০২ সালের *তথ্য স্বাধীনতা আইন*, আরো বিস্তারিত দেখুন: http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2002/20020013.htm, ১৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৭৫] *লোকাল গভর্নমেন্ট (একসেস টু ইনফরমেশন) অ্যাক্ট*, ১৯৮৫ (যুক্তরাজ্য): http://www.nas.gov.uk/recordKeeping/localGovernmentAccessToInformationAct1985.asp, ২২ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৭৬] উপরোক্ত, নম্বর ৭১ :'...নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য মানবিক অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সমতার নীতির লঙ্ঘন। আর এই বৈষম্য একটি দেশের রাজনীতি, সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং সাংস্কৃতিক পরিসরে পুরুষের সঙ্গে সমভাবে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। এই পরিস্থিতি ঐ দেশের সমাজ এবং একই সঙ্গে পরিবারের উন্নয়নের বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, আর অতি

অবশ্যই দেশের জন্য এবং মানব সভ্যতার জন্য অবদান রাখার ক্ষেত্রে নারীর মধ্যকার বিদ্যমান সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রকেও তা করে তোলে আরো জটিল।...দেখা গেছে, যেসব নারী দারিদ্র্যের মাঝে আছেন তাদেরই খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সুবিধা–যা কর্মসংস্থান ও অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য দরকার তাতে প্রবেশাধিকার সবচেয়ে কম। *সিডও সনদের* ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত। জাতিসঙ্ঘের ১৯৭৯ সালে কার্যকর এই সনদ সম্পর্কে আরো দেখুন: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm, ২২ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৭৭] ডননিলান ই., ডনোহোই এম., ওয়াল এম., (২০০৬), "*লেস ক্রসে মৃত্যুর বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দিলেন গ্রাডা*", দ্য আইরিশ টাইমস্, http://www.ireland.com/newspaper/frontpage/2006/1111/1163059890641.html, ১১ নভেম্বর ২০০৬ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৭৮] Irishhealth.com (২০০৫), *`লেস ক্রসের মৃত্যু সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হবে,'* ২৮ অক্টোবর: http://www.irishhealth.com/index.html?level=4&id=8409, ২২ নভেম্বর ২০০৬ সালে সংগ্রীহ তথ্য।

[৭৯] আরটিআই নিউজ (২০০৫), "*Heath Services Executive (HSE) Appalled by Conditions at Dublin Home*", ৩০ মে: http://www.rte.ie/news/2005/0530/leascross.html, ২৩ নভেম্বর ২০০৬ সালে সংগ্রীহ তথ্য।

[৮০] *আয়ারল্যান্ডের পার্লামেন্টের বিতর্ক* (২০০৬), ভলিউম ৬১৩, নম্বর ৪, ১ ফেব্রুয়ারি: http://debates.oireachtas.ie/DDebate.aspx?F=DAL20060201.xml&Dail=29&Ex=All&Page=2, ২৩ নভেম্বর ২০০৬ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৮১] লেস ক্রসে থাকা অবস্থায় ২০০২ থেকে ২০০৫ সালের মাঝে যেসব ব্যক্তি মারা গেছেন পর্যালোচনা প্রতিবেদনে তাদের কেস স্টাডিগুলো পর্যালোচনা করা হয়। এই পর্যালোচনার সময় বিভিন্ন কার্যালয়ে থাকা তাদের স্বাস্থ্য ও মৃত্যু সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ডকুমেন্টেশান করা হয়। আরো দেখুন, *আয়ারল্যান্ডের পার্লামেন্টের বিতর্ক* (২০০৬), ভলিউম, ১৮৬, নম্বর, ২৩, ২৬ এপ্রিল: http://debates.oireachtas.ie/DDebate.aspx? F=SEN20070426.XML&Dail=29&Ex=All&Page=3, ২২ নভেম্বর ২০০৬ সালে সংগ্রীহ তথ্য।

[৮২] হেলথ সার্ভিস এক্সিকিউটিভ (২০০৬), *লেস ক্রস রিভিউ,* ১০ নভেম্বর: http://www.hse.ie/en/Publications/HSEPublications/LeasCrossReport/FiletoUpload,4094,en.pdf, ২৩ নভেম্বর ২০০৬ সালে সংগৃীত তথ্য।

[৮৩] উপরোক্ত, নম্বর ৭৭: "*লেসক্রসে মৃত্যুর বিষয়ে গ্রাডা প্রতিবেদন জমা দিলেন।*"

[৮৪] আরটিই নিউজ (২০০৬), "*লেস ক্রস রিপোর্টে পদ্ধতিগত নির্যাতনের তথ্য সনাক্ত*", ১০ নভেম্বর: http://www.rte.ie/news/2006/1110/leascross.html, ১৩ জুন ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৮৫] *আয়ারল্যান্ডের তথ্য স্বাধীনতা আইন,* ১৯৯৮; দেখুন: http://www.freedominfo.org/countries/ireland.htm, ২৩ নভেম্বর ২০০৬ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৮৬] তথ্য কমিশনারের কার্যালয় : আয়ারল্যান্ড (২০০৬), *FOI Legislation: Still Achieving its Purpose?,* ৩০ নভেম্বর: http://www.oic.irlgov.ie/en/MediaandSpeeches/

Speeches/2006/Name,6181,en.htm, ২৩ নভেম্বর ২০০৬ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৮৭] পূর্বোক্ত।

[৮৮] Irishhealth.com (২০০৫), *নতুন স্টাফকে লেস ক্রসে অপদস্ত হতে হলো*, ১ জুন : http://www.irishhealth.com/index.html?level=4&id=7626, ১৩ জুন ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৮৯] হেননিগান, এম (২০০৬), *Finfacts Ireland Blog: Reform Irish Style*, ৯ নভেম্বর: http://www.finfacts.ie/finfactsblog/2006/11/reform-irish-style-take-action-only-in.html, ১৩ জুন ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৯০] আরটিই নিউজ (২০০৬), ডিসেম্বর, *নজরদারি সংস্থা গড়ে তোলার জন্য নার্সিং হোম বিল উত্থাপিত*, ১৪ ডিসেম্বর: http://www.rte.ie/news/2006/1214/nursing.html, ২১ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৯১] আয়ারল্যান্ডের পার্লামেন্টের বিতর্ক (২০০৬), *ভলিউম* ৬১৩, নম্বর ৪, ১ ফেব্রুয়ারি: http://debates.oireachtas.ie/DDebate.aspx?F=DAL20060201.xml&Dail=29&Ex=All&Page=2, ১৩ জুন ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৯২] উপরোক্ত, নম্বর ৮৫, *তথ্য স্বাধীনতা আইন*, ১৯৯৮ (আয়ারল্যান্ড)।

[৯৩] উপরোক্ত, নম্বর ৪১, প্রাইভেসি ইন্টারন্যাশনাল (২০০৬), *বিশ্বজুড়ে তথ্য স্বাধীনতার অবস্থা, ২০০৬*।

[৯৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮।

[৯৫] *তথ্য স্বাধীনতা আইন*, ১৯৮২ (অস্ট্রেলিয়া): http://www.scaleplus.law.gov.au/html/pasteact/0/58/top.htm, ৩০ অক্টোবর ২০০৭।

[৯৬] পার্লামেন্টারী লাইব্রেরী (২০০২), *দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল বেনিফিট স্কিম: Options for Cost Control, Current Issues Brief no. 12* 2001-02, ২৮ মে: http://www. aph.gov.au/library/pubs/cib/2001-02/02cib12.htm, ১৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৯৭] পাউন্টনে, এম. (২০০৬), *ক্যান্সার ভিকটিমকে ওষুধের তথ্য প্রধানে অস্বীকৃতি*, ২১ ফেব্রুয়ারি: http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,21985,18215051-2862,00.html, ২৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৯৮] মেডিক্যাল নিউজ টুডে (২০০৬), "*হারচেপটিন ফর ফার্মাসিউটিক্যাল বেনিফিট স্কিম ইন অস্ট্রেলিয়া*", ২৩ আগস্ট: http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=50351, ২৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[৯৯] জাতিসঙ্ঘের (১৯৬৬) *আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সনদ*: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১০০] আলমা আটা সনদের আর্টিক্যাল ১-এ জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, সুস্বাস্থ্য মানে কেবল রোগের অনুপস্থিতি নয়, এটা হলো শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার এক পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত অবস্থা– যা অতি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার এবং একে সর্বোচ্চ মাত্রায় মানুষের অর্জনযোগ্য করে তোলা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক লক্ষ্য। আর এই

লক্ষ্যের বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হিসেবে অন্যান্য অনেক সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকারের বাস্তবায়ন দরকার। এই ধারণাই উঠে এসেছে ইন্টারন্যাশনাল কনফারফেন্স অন প্রাইমারী হেলথ কেয়ার (১৯৭৮)-এ। *আলমাআটা সনদ* সম্পর্কে দেখুন: http://www. who.int/hpr/NPH/docs/ declaration_almaata.pdf.

[১০১] জাতিসঙ্ঘ (২০০০), *সাধারণ মন্তব্য নম্বর ১৪*। *E/C.12/2000/4*: http://www. unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En, ২৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১০২] পূর্বোক্ত, আর্টিক্যাল ১১।

[১০৩] জাতিসঙ্ঘ (১৯৯৯), *বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য জাতিসঙ্ঘ নীতিমালা*: http://www.un.org/ esa/socdev/iyop/iyoppop.htm, ১৩ জুন ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১০৪] এই দেশগুলো হলোঃ ইরান, মৌরতানিয়া, সৌদি আরব, সুদান, ইউনাইটেড আরব আমিরাত, ইয়েমেন এবং নাইজেরিয়া। ইন্টারন্যাশনাল লেসবিয়ান এন্ড গে এসোসিয়েশন (২০০৭), *মৃত্যুদণ্ড বিরোধী বিশ্ব দিবস: সমলিঙ্গে যৌন সম্পর্কের জন্য সাতটি দেশে এখনো মানুষকে আইনগতভাবে মৃত্যুদণ্ডের শিকার হতে হয়*, 10 October: http://www.ilga.org/news_results.asp?LanguageID=1&FileID= 1111&ZoneID =7&FileCategory=50, ২২ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১০৫] কেনেডি, ডি (২০০৭), "*সমকামিদের ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত, বললেন ইরানের মন্ত্রী*", দ্য টাইমস্, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/ article2859606.ece, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১০৬] অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (২০০৭), *মৃত্যুদণ্ড বিষয়ক তথ্য উপাত্ত*, ২ অক্টোবর: http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-facts-eng, ২২ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১০৭] নিউ ইন্টারন্যাশনালিস্ট (২০০৭). '*ইরান–তথ্যাবলী*", মার্চ: http://www.newint.org/ features/2007/03/01/facts/, ২২ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১০৮] মাহমুদ আসগারী (১৬) এবং আয়াজ মারহনী (১৮)-কে ২০০৫ সালের ১৯ জুলাই ইরানের খোরাসান প্রদেশের রাজধানী মাশাদে প্রকাশ্যে ফাঁসী দেয়া হয়। ইন্টারন্যাশনাল লেসবিয়ান এন্ড গে অ্যাসোসিয়েশন (২০০৬)-এর *একটিভিস্টরা সমকামীদের মৃত্যুদণ্ড দানের বার্ষিকীতে ইরানে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বিশেষ আহ্বান জানায়*, ২০ জুলাই। দেখুন: http://www.ilga.org/news_results.asp?LanguageID=1&FileCategory= 1&ZoneID=3&FileID=866, ২৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১০৯] *ইরানের দণ্ডবিধি*, http://www.iranhrdc.org/english/pdfs/Codes/ ThePenal Code.pdf, ২৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১১০] হানোকা, এম. (২০০৬), *সেক্স এন্ড দ্য ডেথ পেনাল্টি* : http://inthefray.org/ index.php/200608081772/sex-and-the-death-penalty. html, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য। আরো দেখুন, http://en.wikipedia.org/ wiki/Human_ rights_in_Iran#_note-30, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১১১] পূর্বোক্ত, নম্বর ১০৭ : *নিউ ইন্টারন্যাশনালিস্ট* (২০০৭), '*ইরান–তথ্যাবলী*'।

[১১২] পূর্বোক্ত, নম্বর ১০৫: কেনেডী, ডি. (২০০৭), "*সমকামিদের ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত, বললেন ইরানের মন্ত্রী*"।

[১১৩] ফক্স নিউজ (২০০৭), "*Iran Does Far Worse Than Ignore Gays, Critics Say*," ২৫ সেপ্টেম্বর: http://www.foxnews.com/story/0,2933,297982,00.html, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১১৪] *যুক্তরাজ্যের তথ্য স্বাধীনতা আইন*, ২০০০, http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/20000036.htm, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১১৫] উপরোক্ত, নম্বর ১১৩: *Iran Does Far Worse Than Ignore*, etc.

[১১৬] উপরোক্ত, নম্বর ১০৫: কেনেডি, ডি (২০০৭), "*সমকামিদের ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত, বললেন ইরানের মন্ত্রী*"।

[১১৭] উপরোক্ত, নম্বর ১০৪: ইন্টারন্যাশনাল লেসবিয়ান এন্ড গে অ্যাসোসিয়েশন (২০০৭), *মৃত্যুদণ্ড বিরোধী বিশ্ব দিবস পালিত*।

[১১৮] টেইট, আর. (২০০৬), "*Bestsellers Banned in New Iranian Censorship Purge*", *দ্য গার্ডিয়ান*, ১৭ নভেম্বর: http://books.guardian.co.uk/news/articles/0,,1950280,00.html, ২৮ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১১৯] উইকিপিডিয়া (২০০৭), *সেন্সরশীপ ইন ইরান*: http://en.wikipedia.org/wiki/Censorship_in_Iran, ২৮ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১২০] জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনের দপ্তর (১৯৮২), *সাধারণ মন্তব্য, নম্বর ৬ 30/04/82*:http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3?Opendocument, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১২১] উপরোক্ত, নম্বর ৪২ : জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ (১৯৪৮), *সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ, রেজিলিউশন নম্বর 271 A (III)*..।

[১২২] জাতিসঙ্ঘ (১৯৬৬), *আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ*: http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১২৩] Tidningarnas Telegrambyrå (TT) সুইডেনের একটি সংবাদ সংস্থা। তারা এই সংগ্রামে সহযোগী হিসেবে পেয়েছিল স্থানীয় সংবাদপত্র এবং মিডিয়া গ্রুপগুলোকে। সাধারণ অনুবাদে Tidningarnas Telegrambyrå (TT) বলতে বোঝায় 'দ্য টেলিগ্রাম ব্যুরো অব দ্য নিউজপেপার'। TT-এর পক্ষ থেকে রেডিও ভিত্তিক দৈনিক সংবাদ কর্মসূচিও পরিচালিত হয়। সুইডেনের অনেক স্থানীয় মিডিয়াই তাদের জাতীয় সংবাদের সূত্র হিসেবে TT-এর সংবাদকে ব্যবহার করে থাকে। আরো দেখুন: http://www.tt.se/utl/eng.asp, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১২৪] Freedominfo.org (২০০৫), *সুইডেনের সরকার সুনামিতে হারিয়ে যাওয়া মানুষদের নাম প্রকাশে বাধ্য হলো*, ৯ ফেব্রুয়ারি, http://www.freedominfo.org/features/20050928.htm, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১২৫] *সুইডেনের তথ্য স্বাধীনতা আইন* (Tryckfrihetsforordningen) কে সেদেশের চারটি

মৌলিক আইনের একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়– যে চারটি আইনের আলোকে দেশটির সংবিধান প্রণীত। তথ্য অধিকার সুইডেনে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা লাভ করেছে। এর আওতায় রয়েছে সেদেশের *সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আইন*, ১৭৬৬। এই আইনের দ্বারা সরকারি রেকর্ডপত্রে জনগণের জানার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। একে সুইডেনের সংবিধানের মৌলিক অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেখুন, *Freedom of the Press Act*, 1766 (Sweden): http://www.servat.unibe.ch/law/icl/sw03000_.html, ২৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১২৬] বিবিসি নিউজ (২০০৫), "*এশিয়ার সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্ত নিজ দেশের নাগরিকদের নাম প্রকাশ করলো সুইডেন*", ৯ ফেব্রুয়ারি : http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4250221.stm, ২৬ এপ্রিল ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১২৭] পূর্বোক্ত।

[১২৮] পূর্বোক্ত।

[১২৯] Lake Huron-এর তীরে দক্ষিণ পশ্চিম ওনটারিও-তে প্রায় ২২৪০ একর ল্যান্ড রিজার্ভ ছিল Stoney Point Indian-দের। ১৯৪২ সালে, কানাডার জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ সিদ্ধান্ত নেয় যে, আদিবাসীদের জমিগুলো (তাদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও) বিশেষভাবে দরকার সেনাবাহিনীর পদাতিক বাহিনীর সামরিক জেলা এক-এর জন্য অত্যাধুনিক একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য। দেশের *War Measures Act* এর অধীনে স্থানটিকে খুবই উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়।

[১৩০] কানাডার 'ফাস্ট নেশন' নাগরিকদের সাধারণভাবে Native-Canadians, Aboriginal peoples and Autochthones হিসেবে অভিহিত করা হয়। রেজিস্ট্রার্ড ইন্ডিয়ান হিসেবে তাদের সরকারি নথিভুক্ত হতে হয়। সেখানে এই জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সুবিধার জন্য ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট নামে একটি আইন রয়েছে। দেখুন: Indian and Northern Affairs (2004) *Canada Federal Programmes and Services for Registered Indians* ২৩ এপ্রিল: http://www. ainc-inac.gc.ca/pr/pub/ywtk/index_e.html, ১৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৩১] গ্রে, জে. (২০০৪), '*রেকর্ডকৃত ধারাভাষ্য থেকে দেখা যায় কর্মকর্তারা বর্ণবাদী মন্তব্য করেছেন*', *Ryerson University School of Journalism Diversity Watch*, ২১ জানুয়ারি: http://www.diversitywatch.ryerson.ca/media/cache/ipperwash_globe_jan21.htm, ১২ জুন ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৩২] কানাডার ১৯৮৩ সালের *জানার অধিকার বিষয়ক আইন*: http://www.infocom.gc.ca/acts/sectionse.asp, ৮ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৩৩] উপরোক্ত, নম্বর ১৩১ : গ্রে, জে. (২০০৪), '*রেকর্ডকৃত ধারাভাষ্য থেকে দেখা যায় কর্মকর্তারা বর্ণবাদী মন্তব্য করেছেন*'।

[১৩৪] পূর্বোক্ত।

[১৩৫] *R v Deane (2001) 1 S.C.R. 279, SCC5*, (সুপ্রিম কোর্ট অব কানাডিয়ান): http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2001/2001scc5/2001scc5.html, ১৬ নভেম্বর

২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৩৬] গভর্নমেন্ট অব ওনটারিও, কানাডা (২০০৭), *দ্য আইপারওয়াশ ইনকোয়ারী– দ্য কমিশনারস স্টেটমেন্ট– পাবলিক রিলিজ অব রিপোর্ট:* কানাডা, পৃ. ৩, http://www.ipperwashinquiry.ca/li/pdf/Commissioner-s_Statement-May31_2007.pdf., ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৩৭] গভর্নমেন্ট অব অন্টারিও, কানাডা (২০০৭), *দ্য আইপারওয়াশ ইনকোয়ারী–পলিসি এনালাইসিস, ভলিউম ২–এক্সিকিউটিভ সামারি:* কানাডা, পৃ. ৮৫, http://www.ipperwashinquiry.ca/report/vol_4/pdf/E_Vol_4_Summary_2.pdf. ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৩৮] উপরোক্ত, নম্বর ১৩৬ : গভর্নমেন্ট অব ওন্টারিও, কানাডা (২০০৭), *দ্য আইপারওয়াশ ইনকোয়ারী–দ্য কমিশনারস স্টেটমেন্ট– পাবলিক রিলিজ অব রিপোর্ট*।

[১৩৯] উপরোক্ত, নম্বর ১৩৭: গভর্নমেন্ট অব ওন্টারিও, কানাডা (২০০৭), *দ্য আইপারওয়াশ ইনকোয়ারী–পলিসি এনালাইসিস*, পৃ. ৮০।

[১৩৯] উপরোক্ত, নম্বর ১৩৭ : গভর্নমেন্ট অব ওন্টারিও, কানাডা (২০০৭), *দ্য আইপারওয়াশ ইনকোয়ারী–পলিসি এনালাইসিস*, পৃ. ৮০।

[১৪০] উপরোক্ত, নম্বর ১৩২: *কানাডার ১৯৮৩ সালের তথ্য অধিকার বিষয়ক আইন*।

[১৪১] তথ্য প্রকাশকারী বা 'whistle-blower' বলতে বোঝানো হচ্ছে দায়িত্বরত একজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা একজন প্রাক্তন কর্মী বা কোনো বাণিজ্যিক বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য যিনি জনস্বার্থের বিপরীতে অসদুপায়ের তথ্য প্রকাশ করেন; 'whistle-blower' হিসেবে এমন কোনো সত্তার কথাও বলা যায়, কোনো প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট অসুদপায়ের সংশোধনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য যার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা রয়েছে। এখানে অসুদপায় বলতে সাধারণভাবে বোঝানো হচ্ছে কোনো বিধি বা আইনের লঙ্ঘনকে অথবা জনস্বার্থের জন্য সরাসরি কোনো হুমকিকে। সেটা হতে পারে কোনো প্রতারণারূপে, জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষতিকর কোনো আচরণ রূপে অথবা দুর্নীতিরূপে।

[১৪২] কানাডা সরকার (২০০১), *একসেস টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট রিভিউ কনসালটেশান পেপার:*

http://www.atirtf-geai.gc.ca/consultation2001-03-30-e.html, ১৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৪৩] উপরোক্ত, নম্বর ৪২: আর্টিক্যাল এক, জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন (১৯৪৮), *সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ, রেজলিউশন নম্বর 271 A (III)*, ১০ ডিসেম্বর।

[১৪৪] পূর্বোক্ত, নম্বর ১২২ : আর্টিক্যাল ২, জাতিসঙ্ঘ (১৯৬৬), *আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ*: http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৪৫] জাতিসঙ্ঘ (১৯৬৫), *সকল ধরনের বর্ণভিত্তিক বৈষম্য নির্মূল বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ*: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৪৬] পূর্বোক্ত, আর্টিক্যাল এক। ১৪৭ আর্টিক্যাল ১৩, *গ্রিসের সংবিধান*, ১৯৭৫:

http://www.hri.org/docs/syntagma/, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৪৮] ফিলোস, এ., সম্পাদিত (২০০৪), *গ্রিস : ধর্মীয় স্বাধীনতা–এক দুর্বল গ্রন্থি*: http://www.forum18.org/Archive.php?article_id=321, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৪৯] আর্টিক্যাল ৩, প্যারা ১, *গ্রিসের সংবিধান*, ১৯৭৫।

[১৫০] উপরোক্ত, নম্বর ১৪৮, ফিলোস, এ., সম্পাদিত (২০০৪), *গ্রিস : ধর্মীয় স্বাধীনতা–এক দুর্বল গ্রন্থি*।

[১৫১] কোরনিস, এ. (২০০৭), "*গ্রিস: প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের পনুরুত্থান বিষয়ে অনুসন্ধান*", *ডয়েস ভেলে*, ১৪ সেপ্টেম্বর: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2786954,00.html, ১৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৫২] হডৌলিস, জে (২০০৭), "*জিউস মন্দিরে গ্রিসের ছোট এক ধর্মীয় গোষ্ঠীর 'গোপন' সম্মেলন*", *মিডেল ইস্টার্ন টাইমস্*, ২২ জানুয়ারি: http://www.religionnewsblog.com/17250/greek-cult-holdsforbidden-ceremony-at-zeus-temple, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৫৩] পিরোভোলাকিস, সি (২০০৭), "*গ্রিস: নাগরিক অবাধ্যতা! পৌত্তলিক (pagan) ধর্মীয় বিশ্বাসীদের জনসম্মুখে প্রার্থনার চেষ্টা; খ্রিস্টান অর্থডক্স চার্চ ঘেরাও করে রেখেছে শত শত দাঙ্গা পুলিশ*", *পেগান ইনস্টিটিউট রিপোর্ট, ওয়ার্ল্ড পেগান নিউজ*, ২২ জানুয়ারি: http://paganinstitute.org/PIR/world_pagan_news.html#GREECE:%20%20Civil%20Disobediance!%20Pagans%20dare%20to%20pray%20in%20public%20%20as%20hundreds%20of%20riot%20police%20protect%20Christian%20Orthodoxy, ১৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৫৪] পূর্বোক্ত।

[১৫৫] উপরোক্ত, নম্বর ১৪৮ : ফিলোস, এ., সম্পাদিত (২০০৪), *গ্রিস : 'ধর্মীয় স্বাধীনতা–এক দুর্বল গ্রন্থি*।'

[১৫৬] পূর্বোক্ত।

[১৫৭] উপরোক্ত, নম্বর ১৪৯ : *গ্রিসের সংবিধান*, ১৯৭৫। আর্টিক্যাল ৫ক-তে বলা হচ্ছে: "রাষ্ট্রের সকল নাগরিক আইন অনুযায়ী তথ্য পাওয়ার অধিকারী। তবে এক্ষেত্রে (কেবল) আইনের দ্বারা বাধা নিষেধও আরোপ করা যাবে। এরূপ বাধা নিষেধ তখনি কেবল আরোপ করা যাবে যখন তা জাতীয় নিরাপত্তা বা অপরাধ প্রতিরোধের জন্য অতি জরুরি হয়ে উঠবে এবং সেই জরুরি প্রয়োজনীয়তার ন্যায্যতা যথেষ্ট কারণ দ্বারা সমর্থিত হবে। এ ছাড়া তৃতীয় কোনো পক্ষের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেও কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য অধিকারকে সীমিত করা যেতে পারে।"

[১৫৮] গ্রিসের ন্যায়পালের দপ্তর (২০০৬), *কী ধরনের ইস্যুতে গ্রিসের ন্যায়পালের হস্তক্ষেপ করা উচিত?* : http://www.synigoros.gr/en_what_cases.htm, ২৩ মে ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৫৯] গ্রিসের ন্যায়পালের দপ্তর (২০০৫), *বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৫ - এর সারসংক্ষেপ*, গ্রসের

ন্যায়পাল। পৃ. ১২। http://www.synigoros.gr/reports/Annual_Report_2005.pdf.

[১৬০] পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

[১৬১] পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

[১৬২] পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২।

[১৬৩] উপরোক্ত, নম্বর ১৫৭: আর্টিক্যাল ৫, *গ্রিসের সংবিধান*, ১৯৭৫।

[১৬৪] *প্রশাসনিক কার্যবিধি*, ১৯৯৯ (গ্রিস): http://unpan1.un.org/intradoc/ groups/public/documents/UNTC/UNPAN001820.pdf, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৬৫] উপরোক্ত, নম্বর ৪২: জাতিসজ্ঘ সাধারণ পরিষদ (১৯৪৮), *সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ, রেজিলিউশন নম্বর 271 A (III)*, ১০ ডিসেম্বর: http://www.un.org/Overview/121 rights.html, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৬৬] উপরোক্ত, নম্বর ১২২, জাতিসজ্ঘ (১৯৬৬), *নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ*: http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৬৭] জাতিসজ্ঘ (১৯৮১), *সকল ধরনের বৈষম্য নিরোধ এবং ধর্ম ও বিশ্বাসের কারণে সৃষ্ট সকল ধরনের বৈষম্য নির্মূল বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ*: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_intole.htm, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৬৮] হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ (২০০৭), *Extraordinary Rendition, Extraterritorial Detention and Treatment of Detainees: Restoring Our Moral Credibility and Strengthening Our Diplomatic Standing*, ২৬ জুলাই: http://www.hrw.org/english/docs/2007/07/26/usint16514.htm, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৬৯] অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (২০০৭), `*যুক্তরাষ্ট্রের উচিত গুয়ান্তানামো বন্ধ করা–এটা অন্যায়ের প্রতীক*,' ১ জানুয়ারি, AMR 51/001/2007: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR510012007, ১৯ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৭০] পূর্বোক্ত।

[১৭১] *যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৬৬ সালের তথ্য স্বাধীনতা আইন*, দেখুন: http://www.usdoj.gov/oip/foiastat.htm, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৭২] উপরোক্ত, নম্বর ৪১, প্রাইভেসি ইন্টারন্যাশনাল (২০০৬), "২০০৬-এ *বিশ্বব্যাপী তথ্য স্বাধীনতার অবস্থা–রাষ্ট্রীয় তথ্য অধিকার আইনসমূহের কার্যকারিতা বিষয়ে একটি বৈশ্বিক জরিপ*", পৃ. ৩০।

[১৭৩] রোজ (২০০৪), "*Revealed: the Full Story of the Guantanamo Britons*", *দ্য গার্ডিয়ান*, ১৪ মার্চ ২০০৪: http://www.guardian.co.uk/guantanamo/story/0,13743,1169147,00.html#article_continue, ৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৭৪] এবিসি নিউজ অনলাইন (২০০৬), '*যুক্তরাষ্ট্রের আদালত গুয়ান্তানামো বে'র বন্দিদের নাম প্রকাশে সরকারের উপর নির্দেশ জারি করেছে*', ২৫ জানুয়ারি ২০০৬: http://www.abc.net.au/news/newsitems/200601/s1554552.htm, ৭ মে ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৭৫] অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (২০০৬), "*যুক্তরাষ্ট হাজার হাজার বন্দির নাম প্রকাশ করলো*", অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, ৪ মার্চঃ http://www.msnbc.msn.com/ id/11659762/, ১৯ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৭৬] *অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস বনাম যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ* (২০০৬) 1:2006cv01939 (নিউ ইয়র্ক সাউথার্ন ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট, যুক্তরাষ্ট্র): http://news.justia.com/cases/250691/, ১৯ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৭৭] উপরোক্ত, নম্বর ১৭১ : *যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৬৬ সালের তথ্য স্বাধীনতা আইন*।

[১৭৮] উপরোক্ত, নম্বর ১৩২, *কানাডার ১৯৮৩ সালের তথ্য স্বাধীনতা আইন*।

[১৭৯] কানাডার ২০০১ সালের *Security of Information Act*. দেখুন, http://laws.justice.gc.ca/en/ ShowFullDoc/cs/O-5///en, ৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৮০] মেকলিউড, আই. (২০০৬), "*Mistakes Made in O'Neill, Arar Cases*", CanWest News Service published in Canada.com, ২৯ অক্টোবর ২০০৬: http://www.canada.com/topics/news/story.html?id=83bdc424-3b7a-4d2f-af37-f6b0a02bf8f4&k=6854, ৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৮১] সলোমন, ই. (২০০৬), "*জুলিয়েট ও' নীলের সাক্ষাৎকার*", সিবিসি নিউজ: http://www.cbc.ca/sunday/oneil.html, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৮২] প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক কানাডার সাংবাদিক ফোরাম [(সিজেএফই) ২০০৬], *জুলিয়েট ও'নীলের মামলায় যুগান্তকারী রায়ের জন্য সিজেএফই-এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন*, ১৯ অক্টোবর: http://www.cjfe.org/releases/2006/19102006oneill.html, ১৪ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৮৩] উপরোক্ত, নম্বর ১২২, *জাতিসঙ্ঘের (১৯৬৬) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ*।

[১৮৪] উদাহরণস্বরূপ, দেখুন, *জাতিসঙ্ঘের (১৯৪৯) যুদ্ধকালে আটক বন্দিদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত জেনেভা কনভেনশনের আর্টিক্যাল ৩ এবং ১৭*: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/91.htm, ১৯ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৮৫] জাতিসজ্ঘ (১৯৯২), *সাধারণ মন্তব্য নম্বর ২০*, ১০ মার্চ ১৯৯২: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/6924291970754969c12563ed004c8ae5?Opendocument, ১৯ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৮৬] জাতিসজ্ঘ (১৯৮৪), *নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুরতা, অমানবিক অথবা অবমাননাকর ব্যবহার বা শাস্তি বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ*: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৮৭] পানি অধিকারকে যদি সুনির্দিষ্টভাবে এবং বিস্তারিত আকারে মানবাধিকার হিসেবে দেখানো

নাও হয়, তারপরও মানুষের অধিকার ও মর্যদার সঙ্গে জীবন যাপনের জন্য পানির যে অপরিহার্যতা তার পক্ষে স্বীকৃতি দানের উদীয়মান একটি প্রবণতা সর্বত্র দেখা যায়। এ বিষয়ে আরো দেখুন **১১৫** নম্বর পৃষ্ঠার বক্স-এর লেখাটি।

[১৮৮] রমেশ আর., (২০০৫), "*বিশ্বব্যাংক তার পানি চুক্তি নিয়ে তিরস্কৃত*", *দ্য গার্ডিয়ান*, ২৯ জুলাই: http://www.guardian.co.uk/india/story/0,12559,1538326,00.html, ২০ এপ্রিল ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৮৯] ২০০৫ সালে ভারতে লোকসভা কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে *তথ্য অধিকার আইন* তৈরির পূর্বেই নয়টি রাজ্যে নিজস্ব তথ্য অধিকার আইন তৈরি ও কার্যকর হয়। তবে কেন্দ্রীয় আইনটি সকল ধরনের সরকারি দপ্তরের জন্য প্রযোজ্য বিধায় সেটি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন রাজ্যকে তাদের তথ্য অধিকার আইনে পরিবর্তন সাধন করতে হয় যাতে এই অধিকারের প্রয়োগে দেশব্যাপী সমরূপতা থাকে।

[১৯০] উপরোক্ত, নম্বর ১৮৮: রমেশ আর., (২০০৫),"*বিশ্বব্যাংক তার পানি চুক্তি নিয়ে তিরস্কৃত*"।

[১৯১] পূর্বোক্ত।

[১৯২] ডোগরা, বি (২০০৫), "*তথ্য অধিকারের প্রয়োগে বিশ্বব্যাংকের পানিচুক্তি উন্মোচিত হলো*", *টেকসই উন্নয়নের জন্য ওয়ার্ল্ড বিজিনেস কাউন্সিল*, ৬ নভেম্বর : http://www.wbcsd.org/plugins/DocSearch/details.asp?type=DocDet&ObjectId=MTcyMTM, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৯৩] পূর্বোক্ত।

[১৯৪] কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (২০০৩), *Open Sesame: Looking for the Right to Information in the Commonwealth*, নতুন দিল্লি-, পৃ. ১৬: http://www.humanrightsinitiative.org/publications/chogm/chogm_2003/chogm%202003%20report.pdf, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৯৫] বিশ্বব্যাংক (২০০২), *তথ্য উন্মুক্তকরণ বিষয়ক নীতি*: http://www1.worldbank.org/operations/disclosure/policyII.html, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৯৬] ওয়াটার এইড (২০০৬), *ওয়াটার ফর লাইফ*: http://www.wateraid.org/documents/water_for_life_2006.pdf, ১৩ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৯৭] পূর্বোক্ত।

[১৯৮] জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটি (২০০২), *সাধারণ মন্তব্য নম্বর ১৫ E/C.12/2002/11*:http://www.unhchr.ch/html/ menu2/6/gc15.doc, ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

[১৯৯] পূর্বোক্ত, নম্বর ৭১: জাতিসঙ্ঘের **১৯৭৯** *সালে কার্যকর সিডও সনদ*।

[২০০] পূর্বোক্ত, নম্বর **১১**: জাতিসঙ্ঘের **১৯৮৯** *সালে কার্যকর শিশু অধিকার সনদ*।

[২০১] *জাতিসঙ্ঘের উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব পানি সমীক্ষা কর্মসূচি, সামর্থ্য উন্নয়ন এবং পরিবেশ, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য এবং পানি*: http://www.unesco.org/water/wwap/facts_figures/ mdgs.shtml, ২০ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

২০২ বিশ্বব্যাংকের পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম (২০০৭) সম্পর্কে জানতে: http ://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTWSS/0,,contentMDK:20249471~menuPK:514186~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK: 337302,00.html ৬ নভেম্বর ২০০৭ সালে সংগৃহীত তথ্য।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

Access Info Europe (2006) *"Obscurity in Chile's Rio Condor Valley"*, 27 March: http://www.access-info.org/data/File/Rio %20Condor % 20 Case%20 Study.doc as on 7 November 2007.

Amnesty International (2006) *"Democratic Republic of Congo: Alarming Resurgence in Recruitment of Children in North-Kivu"*, 31 March, ARF 62/009/2006:http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR62 0092006?open&of=ENG-364 as on 6 November 2007.

Amnesty International (2007) *"US Close Guantanamo – Symbol of Injustice"*, 01 January, AMR 51/001/2007: http://web.amnesty.org/library/Index/ ENGAMR510012007 as on 19 November 2007.

Article 19 (2006) *"New Report Reveals Russians Dying from Radiation Sickness as Environmental Information Kept Secret"*, 21 November: http://www.article19.org/ pdfs/press/russia-forbidden-zone-report-launch.pdf as on 20 November 2007.

Article 19 (2006) *"The Forbidden Zone: Environment Information Denied in Russia"*, November, p.17: http://www.article19.org/pdfs/publications/russia-the-forbiddenzone.pdf as on 20 November 2007.

The Australian Parliament Library website (2002) "The Pharmaceutical Benefits Scheme: Options for Cost Control," Current Issues Brief no. 12 2001-02, 28 May: http://www.aph.gov.au/library/pubs/cib/2001-02/02cib12.htm as on 13 November 2007.

Chand, A. et al. (2005) *"Impact of ICT on Rural Development in Solomon Islands: The PFNet (People First Network) Case"*, The Communication Initiative: http://www.comminit.com/ict/ictcasestudies/ictcasestudies-18.html as on 12 November 2007.

Daruwala Maja, Mohapatra Bibhu and Nayak Venkatesh (2003), *Right to Know: A Voter's Guide*, CHRI, New Delhi: http://www.humanrightsinitiative.org/ publications/ const/the_right_to_know.pdf as on 6 November 2007.

Daruwala, Maja (2003) *"Open Sesame: Looking for the Right to Information in the Commonwealth"*, New Delhi, p.16: http://www.humanrightsinitiative.org/publications/ chogm/chogm_2003/chogm%202003%20report.pdf as on 6 November 2007.

Daruwala, Maja (2007), *"Your Guide to Using the Right to Information Act 2005"*, New Delhi:http://www.humanrightsinitiative.org/publications/rti/guide_to_use_ rti_act_2005.pdf as on 7 November 2007.

Donnellan E., Donohoe M., Wall M., (2006) *"Garda Given Report on Deaths at Leas Cross"*,The Irish Times, http://www.ireland.com/newspaper/frontpage/2006/1111/ 1163059890641.html as on 11 November 2006.

Earth Trends (2000) *The Environmental Information Portal, Poverty Resource*: http://earthtrends.wri.org/povlinks/country/india.php as on 21 June 2007.

Filos, A. et al. (2004) *"GREECE: Religious Freedom, the Achilles' Heel"*: http://www.forum18.org/Archive.php?article_id=321 as on 6 November 2007.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2007) *"The Road Ahead: FAO and the Millennium Development Goals"*,: http://www.fao.org/mdg/ as on 21 November2007.

Freedominfo.org website (2005) *"Swedish Government Compelled to Release Names of Missing Tsunami Victims"*, 9 February, http://www.freedominfo.org/features/20050928.htm as on 14 November 2007.

Freedominfo.org website, *Jamaica* (2006) http://www.freedominfo.org/countries/jamaica.htm as on 15 November 2007.

Fuller, B. (2007) *"Open Records by 2009",* Caymanian Compass, 27 June: http://www.caycompass.com/cgi-bin/CFPnews.cgi? ID=1023191 as on 13 November 2007.

The Government of Canada website (2001) *"Access to Information Act Review Consultation Paper,"*: http://www.atirtf-geai.gc.ca/consultation2001-03-30-e.html as on 16 November 2007.

GE Free New Zealand website (2005) NZ Authorities Silent on "Unbelievable Sloppiness!" as EU Blockades GM Corn, 12 May: http://www.gefree.org.nz/press/o12052005.htm as on 16 November 2007.

Gomes C., & Weaver E. Jamaicans for Justice (2007) *"Case Study on the Use of Access to Information to Improve the Human Rights Situation of Children in the Care of the Jamaican State"*.

Gordon, R. G., Jr. (ed.) (2005) *"Ethnologue: Languages of the World"*,: http://www.ethnologue.com/ as on 12 May 2007.

Gray, J., (2004) *"Officers Make Racist Remarks on Tape"*, Ryerson University School of Journalism Diversity Watch, 21 January: http://www.diversitywatch.ryerson.ca/media/cache/ipperwash_globe_jan21.htm as on 12 June 2007.

The Greek Ombudsman website (2006) *"On What Issues can the Greek Ombudsman Intervene?"* : http://www.synigoros.gr/en_what_cases.htm as on 23 May 2007.

Hadoulis, J. (2007) "Greek Cult Hold *'Forbidden' Ceremony at Zeus temple"*, Middle Eastern Times, 22 January: http://www.religionnewsblog.com/17250/greek-cult-holdsforbidden-ceremony-at-zeus-temple as on 15 November 2007.

Hanaoka, M. (2006), *"Sex and the Death Penalty"*: http://inthefray.org/index.php/200608081772/sex-and-the-death-penalty.html as on 20 November 2007.

Hennigan, M (2006) *"Finfacts Ireland Blog: Reform Irish Style"*, 9 November: http://www.finfacts.ie/finfactsblog/2006/11/reform-irish-style-take-action-only-in.html as on 13 June 2007.

International Lesbian and Gay Association website (2006) *"Executions in Iran: Activists Mark Anniversary of Gay Executions with a Call for Human Rights"*, 20 July: http://125 www.ilga.org/news_results.asp? LanguageID=1&File Category=1&ZoneID=3& FileID=866 as on 23 November 2007.

International Lesbian and Gay Association website (2007) *"World Day Against Death Penalty: 7 Countries Still Put People to Death for Same-Sex Acts"*, 10 October: http://www.ilga.org/news_results.asp?LanguageID=1&FileID=1111&ZoneID=7&FileCategory=50 as on 22 November 2007.

Irishhealth.com website (2005) *"New Staff Installed at Leas Cross"*, 1 June: http://www.irishhealth.com/index.html?level=4&id=7626 as on 13 June 2007.

Irishhealth.com website (2005) *"Leas Cross Deaths to be Reviewed"* , 28 October: http://www.irishhealth.com/index.html?level=4&id=8409 as on 22 November 2007.

The Indian Department of Food and Public Distribution website (1997) *Targeted Public Distribution System*: http://fcamin.nic.in/dfpd/EventDetails.asp?EventId=26&Section=PDS&ParentID=0&Parent=1&check=0 as on 20 November 2007.

The Indian and Northern Affairs website (2004) Canada: *"Federal Programmes and Services for Registered Indians"*, 23 April: http://www.ainc-inac.gc.ca/pr/pub/ywtk/index_e.html as on 16 November 2007.

Kennedy, D. (2007), *"Gays Should be Hanged, Says Iranian Minister"*, The Times, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article2859606.ece as on 20 November 2007.

Kouronis, A. (2007) *"Greece: Exploring the Revival of Ancient Religious Traditions"* Deutsche Welle, 14 September: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144, 2786954,00.html as on 15 November 2007.

Locke, Keith (2006) *"Consumer Right to Know (Food Information) Bill – First Reading,"* Website of the Green Party of Aotearoa, New Zealand, 28 June: http://www.greens.org.nz/searchdocs/speech9963.html as on 16 November 2007.

Melchiorre, Angela (2004) *"At What Age…are School Children Employed, Married and Taken to Court?"* Website of Right to Education Project, 20 April: http://www.right-toeducation. org/content/age/index.html as on 14 November 2007.

Mittelstaedt, M. (2007) *"Right-to-Know Law May Apply to the Little Guys"*, The Globe and Mail, 9 July: http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/LAC.20070709. TOTOXIC09/ EmailTPStory/TPNational. as on 20 November 2007.

The Ministry for the Environment website (2004) Genetic Modification: *"The New Zealand Approach: New Zealand"*,: http://www.mfe.govt.nz/publications/organisms/gm-nzapproach-jun04/genetic-modification-nz-approach.pdf. as on 6 November 2007.

New Internationalist (2007) *"Iran – the Facts"*, March: http://www.newint.org/features/2007/03/01/facts/ as on 22 November 2007.

The Office of the Information Commissioner website: Ireland (2006) *"FOI Legislation: Still Achieving its Purpose?"* 30 November: http://www.oic.irlgov.ie/en/MediaandSpeeches/Speeches/2006/Name,6181,en.htm as on 23 November 2007.

Opassiriwit, C. (2002) *"Thailand: A Case Study in the Interrelationship Between Freedom of Information and Privacy"*, Privacy Law and Policy Reporter, 28 March, http://www.austlii.edu.au/au/journals/PLPR/2002/42.html as on 6 November 2007.

Open Society Justice Initiative (2006) *"Transparency & Silence: A Survey of Access to Information Laws and Practices in 14 Countries"*, New York, p.11: http://www.justiceinitiative.org/db/resource2/fs/?file_id=17488 as on 13 November 2007.

Pacific Plan (2005): http://www.pacificplan.org/tiki-page.php?page Name=HomePage as on 7 November 2007.

Pirovolakis, C. (2007) *"GREECE: Civil Disobedience! Pagans Dare to Pray in Public as Hundreds of Riot Police Protect Christian Orthodoxy"*, Pagan Institute Report, World Pagan News, 22 January: http://paganinstitute.org/PIR/world_pagan_news.html#GREECE:%20%20Civil%20Disobediance!%20Pagans% 20dare%20to%20pray%20in%20public%20%20as%20hundreds%20of%20riot%20police%20protect%20Christian%20Orthodoxy as on 15 November 2007.

Pountney, M. (2006), *"Cancer Victims Denied Drug Info"*, Herald Sun, 21 February: http://www.news.com.au/heraldsun/story/0,21985, 18215051-2862,00.html as on 23 November 2007.

Press Gazette (2007) *"Signed and Delivered: Don't Kill FOI Petition is in Blair's hands"*,Press Gazette, 9 March: http://www.pressgazette.co.uk/story.asp?storyCode=36988&sectioncode=1 as on 31 March 2007.

Roberts, A. (2006) *"Blacked Out: Government Secrecy in the Information Age"*: http://www.cambridge.org/us/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521858700&ss=exc as on 14 November 2007.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2006) *"Solomon Islands Government launches official website",* 27 February: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=21393&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html as on 13 June 2007.

RTI International (2007) *"Improving Education in Pakistan"*: http://www.rti.org/page.cfm?nav=595&objectid=8507305C-397D-4959-A9FE316392861F06 as on 6 November 2007.

Sen, A (2000) *"Global Doubts"*, 351st Commencement Day Address to University of Harvard, 8 June: http://www.commencement.harvard.edu/2000/sen.html as on 6 November 2007.

Smith, Russell (2003) *"The Impact of Hate Media in Rwanda"*, BBC News Online, 3 December: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3257748.stm as on 7 November 2007.

Solomon Islands People First Network (PFnet), *What are PFnet's Objectives?*: http://www.peoplefirst.net.sb/general/PFnet.htm as on 13 November 2007.

Tait, R. (2006) *"Bestsellers Banned in New Iranian Censorship Purge"*, The Guardian, 17 November: http://books.guardian.co.uk/news/articles/0,,1950280,00.html as on 28 November 2007.

Toronto Environmental Alliance website, *"Toronto Needs a Community Right to KnowLaw"*, http://www.torontoenvironment.org/node/315 as on 27 October 2007.

The Toronto Audit Services website (1999) *"Toronto Police Review of the Investigation of Sexual Assaults"*, pp.103-105: www.walnet.org/jane_doe/griffiths-991025.pdf as on 6 November 2007.

Transparency International (2007) *Corruption Perceptions Index*: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi as on 7 November 2007.

Transparency International Policy Paper: *"Poverty, Aid and Corruption"*, http://www.transparency.org/publications/publications/aid_corruption as on 7 November 2007.

Verkaik, R (2006) *"Female Reporters Paid £ 6500 Less Than Men by BBC"*, The Independent: http://news.independent.co.uk/media/article2055563.ece as on 20 November 2007.

Wikipedia (2007) *"Censorship in Iran"*: http://en.wikipedia.org/wiki/Censorship_in_Iran as on 28 November 2007.

Wikipedia (2007) *"Corngate,"* 9 December : http://en.wikipedia.org/wiki/Corngate as on 7 November 2007.

Wikipedia (2008) *"Human Rights in Iran"*, May: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Iran#_note-30 as on 20 November 2007.

The Women and Work Commission website (2006) *"Shaping a Fairer Future"*:http://www.womenandequalityunit.gov.uk/publications/wwc_shaping_fairer_future06.pdf as on 20 November 2007.

The Women and Equality Unit website (2007) *"What is the Pay Gap and Why Does it Exist?"* November: http://www.womenandequalityunit.gov.uk/pay/pay_facts.htm as on 20 November 2007.

The World Bank website (2004) *"How the Bank Helps Fight Corruption"* , 8 April:

http://go.worldbank.org/07930BHX80 as on 7 November 2007.

The World Bank website (2004) *"The Costs of Corruption"* n, 8 April: http:// go. worldbank.org/LJA29GHA80 as on 7 November 2007.

Ziegler, J. (2001) The United Nations Special Rapporteur on the Right to Food, April:http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/703958.stm as on 20 November 2007.

Asiaweek (2000) *"Editorials: Making Tea History – A Blow to School 'tea money' Heralds Positive Change",* May 12: http://www.asiaweek.com/asiaweek/ magazine/2000/0512/edit2.html as on 17 November 2007.

The British Broadcasting Corporation (2007) *"Gender Equality Scheme"*: http://www.bbc.co.uk/info/policies/text/gender_equality_scheme.html as on 22 November 2007.

BBC News (2005) *"Sweden Names Asia Tsunami Victims",* 9 February: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4250221.stm as on 26 April 2007.

BBC World News (2004) *Gender Pay Gap Wider than Though*, 1 June: http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/3765535.stm as on 22 November 2007.

Fox News (2007) *"Iran Does Far Worse Than Ignore Gays, Critics Say"*, 25 September: http://www.foxnews.com/story/0,2933,297982,00.html as on 20 November 2007.

Times News Network (2007) *"Rs. 31,500 crore PDS Grain Stolen in 3 Years'"*, The Times of India, 17 September: http://timesofindia.indiatimes.com/ articleshow/2375230.cms as on 20 November, 2007.

Medical News Today (2006) *"Herceptin for Pharmaceuticals Benefits Scheme in Australia"*, 23 August: http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php? newsid=50351 as on 23 November 2007.

RTE News (2006) December, *"Nursing Home Bill to Set Up Inspecting Bodies"* 14 December: http://www.rte.ie/news/2006/1214/nursing.html as on 21 November 2007.

RTE News (2006) *"Leas Cross Report finds 'Systematic Abuse'"*, 10 November: http://www.rte.ie/news/2006/1110/leascross.html as on 13 June 2007.

RTE News (2005) *"Heath Services Executive (HSE) Appalled by Conditions at Dublin Home"*, 30 May: http://www.rte.ie/news/2005/0530/leascross.html as on 23 November 2007.

Reports and Surveys

Amnesty International (2007) *Facts and Figures on the Death Penalty*, 2 October: http://web.amnesty.org/pages/deathpenalty-facts-eng as on 22 November 2007.

Article 19, CHRI, CPA and the Human Rights Commission of Pakistan (2001) *Global Trends on the Right to Information: A Survey of South Asia*, pp. 23-24: www. article19.org/pdfs/publications/south-asia-foi-survey.pdf as on 14 November 2007.

The Center for Food Safety (2006), *Contamination Episodes with Genetically Engineered Crops: United States of America*, p.1: http://www.centerforfoodsafety. org/pubs/Contamination%20episodes%20fact%20sheet.pdf as on 16 November 2007.

The Government of Jamaica (2001) *Keating Report: A Review of Children's Homes and Places of Safety in Jamaica*, p. 13: http://www.jamaicansforjustice.org/docs/ Keating%20Report.pdf as on 6 November 2007.

Health Services Executive (2006) *Leas Cross Review*, 10 November: http://www.

hse.ie/en/Publications/HSEPublications/LeasCrossReport/FiletoUpload,4094,en.pdf as on 23 November 2006.

Jamaicans for Justice (2006) *The Situation of Children Under the Care of the Jamaican State*, October: http://www.jamaicansforjustice.org/docs/ JFJACHRCHILDRENH omesReportOct06final.pdf as on 6 November 2007.

The Government of Ontario, Canada (2007) *The Ipperwash Enquiry – Policy Analysis Volume 2 – Executive Summary* : Canada, p. 85, http://www.ipperwashinquiry.ca/ report/ vol_4/pdf/E_Vol_4_Summary_2.pdf. as on 14 November 2007.

Privacy International (2006) *Freedom of Information Around the World 2006* – A Global Survey of Access to Government Information Laws, pp. 147-148: www.privacyinternational.org/foi/foisurvey2006.pdf as on 14 November 2006.

Right to Education Project (2006) Table 1: *Countries Without Free Public Primary Education Available to all School-Age Children by Regio*n: http://www.right-to-education.org/ as on 14 November 2007.

4NI (2005) *Survey Reveals Widening Gender Gap in Pay*, 30 August: http://www.4ni.co.uk/news.asp?id=43724 as on 20 November 2007.

The United States of America Department of Transportation website (2007) Table 1-11: *Number of U.S. Aircraft, Vehicles, Vessels and Other Conveyances*: http://www.bts.gov/publications/national_transportation_statistics/html/ table_01 _11.html as on 10 November 2007.

Press Releases

The Government of Ontario, Canada (2007) *The Ipperwash Enquiry –The Commissioner's Statement – Public Release of Report:* Canada, p. 3, http://www. ipperwashinquiry.ca/li/pdf/Commissioner-s_Statement-May31_2007.pdf. as on 14 November 2007.

Speeches

Annan, K. (1997) Address to the World Bank Conference *"Global Knowledge '97"*, Toronto,Canada, on June 22: iggi.unesco.or.kr/web/iggi_docs/01/952476023.pdf as on 6 November 2007.

Manuals

The Society of Professional Journalists (1996) *Code of Ethics:* http://www.spj.org/ ethicscode.asp as on 7 November 2007

United Nations Department of International Economic and Social Affairs (1986) *Guidelines for Consumer Protection:* http://www1.umn.edu/humanrts/links/ consumerprotection.html as on 7 November 2007.

Court Judgements

Claude Reyes et al. v Chile (2006): www.justiceinitiative.org/db/resource2/fs/?file_id=18907 as on 7 November 2007 (Inter- American Court of Human Rights).

Indian Express Newspapers (Bombay) Pvt Ltd v India (1985) 1 SCC 641 (India).

Jane Doe v Metropolitan Toronto (Municipality) Commissioners of Police (1998) Court File No. 87-CQ-21670 (Canada): http://www.sgmlaw.com/Page251.aspx as on 6

November 2007. (Canada).

The Prosecutor v Tharcisse Renzaho Case No. ICTR 97-31-I http://69.94.11.53/default. htm as on 7 November 2007 (International Criminal Tribunal for Rwanda (case in progress).

The Prosecutor v Ferninand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze (2003) Case No. ICTR-99-52-T http://69.94.11.53/default.htm as on 7 November 2007 (International Criminal Tribunal for Rwanda).

R v Deane (2001) 1 S.C.R. 279, SCC5 : http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2001/2001scc5/2001scc5.html as on 16 November 2007 (Canada)

Reliance Petrochemicals Ltd v Proprietors of Indian Express Newspapers Bombay Pvt Ltd, AIR 1989 SC 190 (India).

S.P. Gupta v Union of India, AIR 1982 SC, 149 (India).

Uttar Pradesh v Raj Narain, AIR 1975, SC865 (India).

Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, And Others, v Cricket Association Of Bengal And Others, 1995(002) SCC 0161 SC (India).

Communiqués, Declarations, Resolutions and Treaties

African Union (2003) *Convention on Preventing and Combating Corruption*, 11 July: http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf.

African Commission on Human and Peoples' Rights, (2001), *Resolution on the Adoption of the Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa, Resolutions 54*(XXIX) 01, 7 May: http://www.achpr.org/english/declarations/declaration_freedom_exp_en.html as on 7 November 2007.

African Union (1981) *Charter on Human and People's Right*, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21I.L.M: http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/instr/afri_2.htm as on 7 November 2007.

Commonwealth Secretariat (1991), *Harare Declaration:* http://www.thecommonwealth. org/Internal/20723/34457/harare_commonwealth_declaration/ as on 6 November 2007.

Council on the League of Arab States (1994) *Arab Charter on Human Rights:* http://www1.umn.edu/humanrts/instree/arabhrcharter.html as on 19 November 2007.

Council of Europe (1950) European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm as on 7 November 2007.

European Union (2000) *Charter of Fundamental Rights of the European Union:* http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf. as on 19 November 2007.

International Conference on Primary Health Care (1978) *Declaration of Alma-Ata:* http://www.who.int/hpr/NPH/docs/declaration_almaata.pdf as on 6 November 2007.

Inter-American Commission of Human Rights (1969) *Inter-American Convention on Human Rights:* http://www.thirdworldtraveler.com/Human%20Rights%20Documents/AmerConven_HumanRights.html as on 7 November 2007.

Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression, Inter-American Commission on Human Rights (2004) *International Mechanisms for Promoting Freedom of Expression: Joint Declaration by the UN Special Rapporteur, Organisation of Security and Cooperation in Europe on Freedom of the Media and*

Organisation of American States Special Rapporteur on Freedom of Expression, 6 December: http://www.cidh.oas.org/relatoria/ showarticle.asp?artID=319&lID=1 as on 7 November 2007.

Organisation of America States (2000) *Inter-American Declaration of Principles of Freedom of Speech*: http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=26&lID=1 as on 7 November 2007.

Promoting Open Government: Commonwealth Principles and Guidelines on the Right to Know (1999) Commonwealth Expert Group Meeting on Right to Know and the Promotion of Democracy and Development , 30-31 March: http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/international/cw_standards/ commonwealth_expert_grp_on_the_rti_99-03-00.pdf as on 19 November 2007.

United Nations Department of Economic and Social Affairs, Department for SustainableDevelopment, (2004) Agenda 21: http://www.un.org/esa/sustdev/ documents/agenda21/english/agenda21chapter1.htm as on 20 November 2007.

United Nations Department of International Economic and Social Affairs (1986) *ResolutionnA/RES/39/248*:http://www1.umn.edu/humanrts/links/ consumerprotection .html as on 20 November 2007.

Commission of the Human Rights (2000) *Resolution E/CN.4/RES/2000/38* Para.2, 20 April:http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.RES.2000. 38.En?Opendocument as on 7 November 2007.

United Nations General Assembly (1979) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women,* 18 December: http://www.un.org/womenwatch/ daw/cedaw/ as on 21 November 2007.

United Nations General Assembly (1948) *Universal Declaration of Human Rights, Resolution n 271 A (III)* 10 December: http://www.un.org/Overview/rights.html as on 7 November 2007.

United Nations General Assembly (1946) Resolution 59(1), 65th Plenary Meeting, 14 December http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/59(I) &Lang=E&Area=RESOLUTION as on 7 November 2007.

United Nations (2003) *United Nations Convention Against Corruption:* http://www. unodc.org/unodc/crime_convention_corruption.html as on 14 November 2007.

United Nations (2000) *General Comment n.14 E/C.12/2000/4:* http://www.unhchr.ch/ tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En as on 23 November 2007.

United Nations (2000) *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflicts:* http://www.ohchr.org/english/ law/crcconflict.htm as on 6 November 2007.

United Nations (2000) *The Right to the Highest Attainable Standard of Health E/C.12/2000/4 (General Comments):* http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/ E.C.12.2000.4.En as on 29 October 2007.

United Nations (2000) *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography:* http://www.unhchr.ch/html/menu2/dopchild.htm as on 6 November 2007.

United Nations (1999) *The Right to Education (Art.13) E/C.12/1999/10 (General Comments)*,:http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ae1a0b126d068e 868025683c003c8b3b?Opendocument as on 14 November 2007.

United Nations (1999) *UN Principles for Older Persons:* http://www.un.org/esa/ socdev/ iyop/iyoppop.htm as on 13 June 2007.

United Nations (1992) *The Rio Declaration on Environment and Development:* http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163 as on 14 November 2007.

United Nations (1990) *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families:* http://www.ohchr.org/english/law/cmw.htm as on 14 November 2007.

United Nations (1989) *United Nations Convention on the Rights of the Child:* http://www.ohchr.org/english/law/pdf/crc.pdf as on 6 November 2007.

United Nations (1981) *Declaration on the Elimination of All Forms of Discrimination and of Discrimination Based on Religion or Belief:* http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_intole.htm as on 7 November 2007.

United Nations (1972) *Declaration on the United Nations Conference on the Human Environment:* http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp? DocumentID=97&ArticleID=1503 as on 14 November 2007.

United Nations (1966) *International Covenant on Civil and Political Rights:* http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm as on 6 November 2007.

United Nations (1966) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights:* http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm as on 6 November 2007.

United Nations (2003) *Committee on Social, Economic and Cultural Rights, General Comment no.15 E/C.12/2002/11*,para.45: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/a5458d1d1bbd713fc1256 cc400389e94?Opendocument as on 26 October 2007.

United Nations (2000) *Committee on Social, Economic and Cultural Rights, General Comment no.14 E/C.12/2000/4*, para 12: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En as on 26 October 2007.

United Nations (1999) *Committee on Social, Economic and Cultural Rights, General Comment no.12 E/C.12/1999/5,* para.23: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3d02758c707031 d58025677f003b73b9?Opendocument as on 26 October 2007.

United Nations (1999) *Committee on Social, Economic and Cultural Rights, General Comment no.13 E/C.12/1999/10*, para. 56: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/ E.C.12.1999.10.En? OpenDocument as on 26 October 2007.

United Nations Economic and Social Council (2000) *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Mr. Abid Hussain, submitted in accordance with Commission resolution 1999/36* UN Doc. E/CN.4/2000/63, Para. 43-44, 18 January: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf /0/16583a84ba1b3ae5802568bd004e80f7/$FILE/G0010259.pdf as of 7 November 2007.

United Nations Commission on Human Rights (1998) *Right to Freedom of Opinion and Expression Commission on Human Rights Resolution 1998/42* Res. E/CN.4/1998/42, Para. 2, 17 April: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/ac5072a4cb3166cb 8025666a0033ecdd?Opendocument as on 19 November 2007.

United Nations Economic Commission for Europe (1998) *Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters:* http://www.unece.org/env/pp/welcome.html as on 20 November 2007.

United Nations Economic and Social Council (1998) *Report of the Special Rapporteur, Abid Hussain, submitted pursuant to Commission on Human Rights Resolution 1997/26* UN Doc. E/CN.4/1998/40, Para. 14, 28 January: http://www.

unhchr.ch/Huridocda/ Huridoca.nsf/fb00da 486703f751c12565a90059a227/7599319f02ece82dc12566080045b296?OpenDocument as of 7 November 2007.

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (1982) *The Right to Life, General Comment no 6, 30 April* : http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3? Opendocument as on 14 November 2007.

Legislation

Access to Information Act, 2002 (Jamaica), http://www.jis.gov.jm//special_sections/Bills%20&%20Acts/atib.htm as on 6 November 2007.

Access to Information and Protection of Privacy Act, 2002 (Zimbabwe): www.sokwanele.com/pdfs/AIPPA.pdf as on 7 November 2007.

Act on Free Access to Information, (Slovakia): http://www.elaw.org/resources/text.asp?ID=331 as on 14 November 2007.

Access to Information Act, 1983 (Canada): http://www.infocom.gc.ca/acts/sections-e.asp as on 8 November 2007.

Administrative Procedure Code, 1999 (Greece): http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN001820.pdf as on 6 November 2007.

Canadian Environmental Protection Act, 1999: http://laws.justice.gc.ca/en/C-15.31/text.html as on 27 October 2007.

Chilean Decree Law 660 Foreign Investment Statute (1993) (Chile): www.cochilco.cl/english/normativa/pdf/dl600_eng.pdf as on 7 November 2007.

Constitution of the Republic of South Africa, 1996: http://www.info.gov.za/documents/constitution/index.htm as on 13 November 2007.

Constitution of Slovakia, 1992: http://www.servat.unibe.ch/law/icl/lo00000_.html as on 20 November 2007.

Constitution of the Kingdom of Thailand, 1991: http://www.parliament.go.th/files/library/law3e-e.htm as on 14 November 2007.

Constitution of the Republic of Hungary, 1949: http://www.servat.unibe.ch/icl/hu00000_.html as on 27 October 2007.

Equal Pay Act, 1970 (United Kingdom): http://www.womenandequalityunit.gov.uk/legislation/equal_pay_act.htm as on 20 November 2007.

Freedom of Information (Amendment) Bill, 2006-07 (United Kingdom): http://www.publications.parliament.uk/pa/pabills/200607/freedom_of_information_amendment.htm as on 7 November 2007.

Freedom of Information Act, 2005 (United Kingdom): http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/20000036.htm as on 17 November 2007.

Freedom of Information Act, 2004 (Antigua and Barbuda): http://www.ab.gov.ag/gov_v2/government/parliament/laws/freedom_of_info.pdf as on 13 November 2007.

Freedom of Information Ordinance, 2002 (Pakistan): http://www.privacy international.org/countries/pakistan/pk-foia-1002.html as on 14 November 2007.

Freedom of Information Act, 2002 (Scotland): http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2002/20020013.htm as on 17 November 2007.

Freedom of Information Act, 2000 (United Kingdom): http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/20000036.htm as on 23 November 2007.

Freedom of Information Act, 1982 (Australia): http://www.scaleplus.law.gov.au/

html/pasteact/0/58/top.htm as on 30 October 2007.

Freedom of Information Act, 1998 (Ireland): http://www.freedominfo.org/countries/ireland.htm as on 22 November 2007.

Freedom of Information Act, 1966 (United States of America): http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/foia.html as on 7 November 2007.

Food Standards Australia New Zealand Act, 1991 (Australia and New Zealand):www.comlaw.gov.au/.../ActCompilation1.nsf/0/34FDA538E7B40ACFCA256F71004DA6FE/$file/FoodStandANZ91.pdf as on 20 November 2007.

Freedom of the Press Act, 1766 (Sweden): http://www.servat.unibe.ch/law/icl/sw03000_.html as on 23 November 2007.

Iranian Penal Code, http://www.iranhrdc.org/english/pdfs/Codes/ThePenalCode.pdf as on 20 November 2007.

Land Registration Act, 2002 (United Kingdom) : http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2002/ 20020009.htm as on 27 October 2007.

Law on Free Access to Information, 1999 (Czech Republic): http://aitel.hist.no/~walterk/wkeim/files/foia-czech.htm as on 14 November 2007.

Local Government Official Information and Meetings Act, 1987 (New Zealand): http://www.legislation.govt.nz/libraries/contents/om_isapi.dll?clientID=317744615&infobase=pal_statutes.nfo&jump=a1987-174&softpage=DOC as on 20 November 2007.

Local Government (Access to Information) Act, 1985, (United Kingdom): http://www.nas.gov.uk/recordKeeping/localGovernmentAccess ToInformationAct1985.asp as on 22 November 2007.

Official Information Act, 1997 (Thailand) http://www.oic.go.th/content_eng/act.htm as on 7 November 2007. Official Information Act, 1982 (New Zealand) http://www.legislation.govt.nz/libraries/ contents/om_isapi.dll?clientID= 568998686&infobase=pal_statutes.nfo&jump=a1982-156&softpage=DOC as on 29 October 2007.

Official Secrets Act, 1989 (United Kingdom): http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1989/Ukpga_19890006_en_1.htm as on 22 November 2007.

Promotion of Access to Information Act, 2000 (South Africa): http://www.info.gov.za/gazette/acts/2000/a2-00.pdf as on 13 November 2007.

The Right to Information Act, 2005 (India): http://righttoinformation.gov.in/ as on 20 November 2007.

The Right to Information Act, 2001(Delhi): http://ar.delhigovt.nic.in/right1.html as on 7 November 2007.

Russian Federation Forest Code, 1997 (Russia) http://www.forest.ru/eng/legislation/forestcode.html as on 29 October 2007.

Transport, Recall Enhancement, Accountability and Documentation Act, 2000 (United States): www.citizen.org/documents/TREAD%20Act.pdf as on 20 November 2007.

Websites

Asian Development Bank Organisation for Economic Cooperation and Development Anti-Corruption Initiative, *The Initiative's Member Countries and Economies:* http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_34982156_35315367_35030743_1_1_ 1_1,00.html as on 7 November 2007.

Department of Justice Canada, Canadian Charter of Rights and Freedoms,1982: http://laws.justice.gc.ca/en/charter/ as on 6 November 2007.

Election Commission of India: http://www.eci.gov.in/ as on 6 November 2007.

New Zealand Parliament, *Bills, SOPS, Acts, Regulations*: http://www.parliament.nz/en-NZ/PB/Legislation/Bills/6/5/7/65779d6a92964c508670a3bba1544c1e.htm as on 6 November 2007.

South African Truth and Reconciliation Commission: http://www.doj.gov.za/trc/ as on 7 November 2007.

The Solomon Islands Department of Prime Minister and Cabinet: http://www.pmc.gov.sb/ as on 27 October 2007.

Tidningarnas Telegrambyrå (TT): http://www.tt.se/utl/eng.asp as on 14 November 2007.

United States of America, Central Intelligence Agency (CIA), The World Fact Book: http://geography.about.com/library/cia/blcczech.htm as on 7 November 2007.

United Nations website (2006) United Nations Member States: http://www.un.org/members/list.shtml as on 19 November 2007.

Others

Consumer Rights Commission of Pakistan pamphlet Using Local government Ordinance 2001 to Enhance Transparency in Education: Islamabad, Pakistan.

Parliamentary Debates of Ireland (2007) Vol. 186 No 23, 26 April: http://debates.oireachtas.ie/DDebate.aspx?F=SEN20070426.XML &Dail=29&Ex=All&Page=3 as on 22 November 2007.

Parliamentary Debates of Ireland (2006) Vol. 613 No. 4, 1 February: http://debates.oireachtas.ie/DDebate.aspx?F=DAL20060201 .xml&Dail=29&Ex=All&Page=2 as on 22 November 2006.

The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, The Millennium Development Goals and Water: http://www.unesco.org/water/wwap/facts_figures/mdgs.shtml as on 20 November 2007.

Women's Economic Participation Team, Communities and Local Government (2007) Tackling the Gender Pay Gap Fact Sheet, 23 May: http://www.womenandequalityunit. gov.uk/publications/genpaygap_facts_jun07.doc as on 20 November 2007.

The World Bank Water Supply and Sanitation (2007) About Us: http://web.worldbank.org/W B S I T E / E X T E R N A L / TO P I C S / E X T W S S / 0, c o n t e n t M D K : 20249471~menuPK:514186~pagePK:2100 58~piPK:210062 ~theSitePK:337302,00.html as on 6 November 2007.

আমাদের সহযোগী সংগঠন

Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit উদারনৈতিক রাজনীতির বিকাশের লক্ষ্যে নিবেদিত একটি ফাউন্ডেশান। এর প্রতিষ্ঠা ১৯৫৮ সালে। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আরো অনেকের সঙ্গে ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রথম জার্মান প্রেসিডেন্ট থিওডর হেয়াস। এই ফাউন্ডেশান বর্তমানে বিশ্বের ৬০টি দেশে বিভিন্ন ধরনের কাজে সম্পৃক্ত। সব কাজেরই মূল অভিমুখ হচ্ছে স্বাধীনতা ও মুক্তির ধারণার বাস্তব ও কৌশলগত বিকাশ ঘটানো। Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit-এর কাজের ধরনের মধ্যে রয়েছে জনশিক্ষা, রাজনৈতিক সংস্কার সম্পর্কিত সুপারিশ তৈরি ও এরূপ বিষয়ে সংলাপ আয়োজন।

উপরোক্ত কাজসমূহের সূত্রে Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit-এর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাকে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং বাজার অর্থনীতির বিকাশে সদা তৎপর এই ফাউন্ডেশান। বিশ্বে এরূপ বিষয়ে এত ব্যাপক পরিসরে কাজ করছে এই ফাউন্ডেশানের মতো এমন উদারনৈতিক মতাদর্শিক সংগঠন আর নেই। এই ফাউন্ডেশান তার কাজের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে মানব মানব স্বাধীনতার অগ্রযাত্রা যাতে সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয় সে লক্ষ্যে মাঠ প্রস্তুত করে চলেছে। Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit মনে করে এটা হলো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমাদের দায়িত্ব।

দক্ষিণ এশিয়ায়, যেখানে সহিষ্ণুতা এবং স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ ও অঙ্গীকারের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে সেখানে উদীয়মান রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে কাজের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit। এ অঞ্চলে অর্থনীতির উদারীকরণেও তৎপর এই ফাউন্ডেশান। গণতন্ত্রকে কাঠামোগতভাবে শক্তিশালী করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক বিকাশের শর্ত হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং এ অঞ্চলের সকলের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় বহু অংশীদার সংগঠনের সঙ্গে কাজ করছে ফাউন্ডেশানটি।

Friedrich Naumann STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT

USO House, 6, Special Institutional Area
New Delhi 110067, INDIA
Phone: +91-11-2686 2064/ 2686 3846
Fax: +91-11-2686 2042
Websites: www.southasia.fnst.org,
www.stiftung-freiheit.org

সিএইচআরআই-এর কার্যক্রমসমূহ

সিএইচআরআই কাজ করছে প্রধানত কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে। সিএইচআরআই বিশ্বাস করে এতদাঞ্চলের মানুষের জীবনে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও মানবাধিকারের বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ডে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রয়োজন সেসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্তদের জবাবদিহিতা। অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে থাকতে হবে মানসম্মত কার্যকর কাঠামো। উপরোক্ত বিশ্বাসই সিএইচআরআই-এর সকল তৎপরতার ভিত্তি। সে আলোকেই মানবাধিকার বিষয়ক ব্যাপকভিত্তিক এডভোকেসি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সিএইচআরআই সহজে তথ্য জানার অধিকার এবং বিচার প্রক্রিয়ায় সহজে প্রবেশাধিকারের পক্ষে কাজ করছে। সিএইচআরআই-এর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গবেষণা, প্রকাশনা, কর্মশালার আয়োজন, তথ্য বিনিময় এবং এডভোকেসি।

মানবাধিকার এডভোকেসি কর্মসূচি: কমনওয়েলথ-এর যেসব আনুষ্ঠানিক দপ্তর রয়েছে সেসব স্থানে এবং কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সরকারসমূহের কাছে সিএইচআরআই নিয়মিত মানবাধিকার বিষয়ক স্মারকলিপি জমা দিয়ে থাকে। একই বিষয়ে সিএইচআরআই বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধানী দলও প্রেরণ করে। ১৯৯৫ সাল থেকে সিএইচআরআই নাইজেরিয়া, জাম্বিয়া, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ এবং সিয়েরা লিয়নে মিশন পাঠিয়েছে। কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ নেটওয়ার্ক এর সমন্বয়ের দায়িত্বও পালন করে সিএইচআরআই। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানবাধিকার গ্রুপগুলোর এক সঙ্গে কাজের একটি ক্ষেত্র হিসেবে এই নেটওয়ার্ক মানবাধিকার পরিবেশ উন্নয়নে এক শক্তিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে। মানবাধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা জাগরূক রাখার কাজে নিয়োজিত রয়েছে সিএইচআরআই-এর মিডিয়া ইউনিট।

তথ্য জানার অধিকার: তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে সিএইচআরআই-এর রয়েছে কারিগরী বিশেষজ্ঞধর্মী বিশেষ দক্ষতা। এ বিষয়ে কার্যকর আইনগত কাঠামো গড়ে তুলতে এবং দৃষ্টান্তমূলক কোনো কর্মসূচির বাস্তবায়নে সিএইচআরআই সহযোগী সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ এবং সরকারের সঙ্গে সহায়কের ভূমিকা নিয়ে কাজ করে থাকে। তথ্য অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন দেশের স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি সংগঠন ও সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যৌথভাবে অনেক কাজে সংশি-ষ্ট সিএইচআরআই। এসব যৌথ তৎপরতার লক্ষ্য হলো তথ্য অধিকার বিষয়ক কাজে তাদের সামর্থ্য উন্নয়ন এবং নীতিনির্ধারকদের তথ্য অধিকারের স্বপক্ষে উদ্বুদ্ধ করা।

সিএইচআরআই দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে সক্রিয়। সম্প্রতি তার একটি সফল সহায়তা কার্যক্রম ছিল ভারতে তথ্য অধিকার বিষয়ক একটি আইনের লক্ষ্যে যে প্রচার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে। এ ছাড়াও সম্প্রতি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশে সিএইচআরআই তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনের খসড়া তৈরিতে সহায়তা দিয়েছে। এই অধিকারের স্বপক্ষে ভূমিকা রাখতে এতদাঞ্চলের জাতীয় ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর কাজের ক্ষেত্রেও সিএইচআরআই অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

বিচার প্রক্রিয়ায় অভিগম্যতা:

পুলিশ বাহিনীর সংস্কার: অনেক দেশেই পুলিশ নাগরিকদের রক্ষাকর্তা না হয়ে রাষ্ট্রের নির্যাতনমূলক একটি হাতিয়ার হিসেবে ভূমিকা রাখে। যার ফলে ঐসব স্থানে অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপক ঘটনা ঘটে। বিচার প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত হয় মানুষ। সিএইচআরআই পুলিশ বাহিনীর পদ্ধতিগত সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। সিএইচআরআই মনে করে এ প্রক্রিয়াতেই কেবল পুলিশ বর্তমান ভূমিকার পরিবর্তে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে। ভারতে সিএইচআরআই মূলত পুলিশ বাহিনীর সংস্কারের প্রশ্নে জনসমর্থনকে সংঘবদ্ধ করার জন্য কাজ করছে। পূর্ব আফ্রিকায় এবং গায়ানায় সিএইচআরআই পুলিশ বাহিনীর জবাবদিহিতা এবং এই বাহিনীর কার্যক্রমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রম চালিয়েছিল।

কারা সংস্কার: এক্ষেত্রে সিএইচআরআই-এর কর্মসূচির মূল দিক হলো ঐতিহাসিকভাবে কারাগারগুলোর যে বদ্ধ অবস্থা তাতে স্বচ্ছতার ধারা সৃষ্টি করা এবং সেখানকার দুর্নীতি ও অন্যায়গুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করা। এক্ষেত্রে অন্যতম একটি কর্মসূচি হলো, কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বন্দিদের যে আধিক্য তা কমাতে বিদ্যমান আইনি উপায়ের ব্যর্থতার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ। বহু বন্দি সংশি-ষ্টদের অসচেতনতায়, অবহেলায় বিচারের পূর্বেই বহুদিন বন্দি জীবন যাপন করছেন, অনেককে অতিরিক্ত সময় ধরে সেখানে থাকতে হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে সিএইচআরআই পরিস্থিতি সহনীয় করতে কাজ করছে। কারা সংস্কার বিষয়ে সিএইচআরআই-এর মনোযোগের আরেকটি ক্ষেত্র হলো কারা পরিদর্শন ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার চেষ্টা এবং এ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে পরিস্থিতির উন্নতি সাধন– যে ব্যবস্থাটি প্রায় নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর এখন। সিএইচআরআই মনে করে, এসব তৎপরতার মাধ্যমে কারা প্রশাসনের মানোন্নয়নে পরিবর্তন আনা যেমন সম্ভব তেমনি বিচার প্রশাসনেও তার একটি ইতিবাচক অভিঘাত পড়বে।

নাগরিক উদ্যোগ-এর সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম

নাগরিক উদ্যোগ-এর লক্ষ্য হলো 'সুশাসন ও মানবাধিকার'-এর সুরক্ষা ও বিকাশে তৎপরতা চালানো। লক্ষ্য অর্জনে মানবাধিকার আইন ও নাগরিক অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে তৃণমূল পর্যায়ে গণসংগঠন তৈরী করে ন্যায়বিচার, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ কর্মতৎপরতা চালাতে সহায়তা করা।

সালিশের মাধ্যমে বিরোধ মিমাংসা: প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন স্তরের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিবর্গকে আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে স্থানীয় বিরোধ সালিশ ও সমঝোতার মাধ্যমে মিমাংসা করা।

তৃণমূল নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন: তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের সংগঠিত করে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ বাড়ানো। এই কার্যক্রমের ফলে তৃণমূল নারীদের নেতৃত্ব বিকশিত হয়েছে এবং তারা পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ ও বিরোধ মিমাংসায় সালিশে নারী নেত্রী হিসেবে সক্রিয় অংশ নিচ্ছে।

আইনগত সহায়তা ও মানবাধিকার তথ্যানুসন্ধান: সালিশের মাধ্যমে বিরোধ মিমাংসায় ব্যর্থ হলে অথবা ফৌজদারী আদালতের ক্ষেত্রে মামলা পরিচালনায় ক্ষমতা নেই এমন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে আইনি পরামর্শ ও আদালত পর্যায়ে আইনগত সহায়তা প্রদান করা। গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তার তথ্যানুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ভূমিকা রাখা।

প্রশিক্ষণ ও মানবাধিকার শিক্ষা: নাগরিক উদ্যোগ অধিকার, মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও সাধারণ আইন- বিশেষ করে, পারিবারিক ও উত্তরাধিকার আইন বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যরা ইউনিয়ন ও উপজেলাভিত্তিক মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ দল গঠন করে সংঘবদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

দুঃস্থ নারীদের সাথে কার্যক্রম: কর্মএলাকায় তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্ত, বিধবা ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত দুঃস্থ নারীদের সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী প্রাপ্ত সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করা, আইনগত অধিকার ও সামাজিক কুসংস্কার এবং বাধা অতিক্রমে সক্ষম করে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আধিকার আদায়ে কার্যক্রম: দলিতদের অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, দলিতদের সংগঠিত করা, নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা এবং দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি এবং আইন প্রণয়নে কাজ করা। এই কাজে নাগরিক উদ্যোগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

তথ্য অধিকার: ২০০৪ সাল থেকে নাগরিক উদ্যোগ তথ্য অধিকার নিয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করছে। বর্তমানে দেশের ৯টি থানায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা ও এর বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে কাজ চলছে।

শহরে অপ্রাতিষ্ঠানিক নারী শ্রমিক: শহরে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ দ্রুত বেড়েই চলছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের সংগঠিত করা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, সমবায় করতে উৎসাহ দেয়া ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কাজ করা।

গণনাটক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম: নাটক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানবাধিকার, নারীর মানবাধিকার ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, বিশেষত নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য তুলে ধরার চেষ্টা করা।

যুব সমাজের সাথে কার্যক্রম: যুবকদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র ও যুবকদের মানবাধিকার ও আইন সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবাধিকার ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা ও সংবেদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

নাগরিক উদ্যোগ

বেসরকারি সংস্থা হিসেবে 'নাগরিক উদ্যোগ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে। নাগরিক উদ্যোগ সংগঠন হিসেবে কী করতে চায় বা কী করছে তারই সারবস্তু মূর্ত হয়ে আছে তার নামে। প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, সচেতন জনসাধারণের স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি নির্মাণে সক্ষম ও সমর্থ করে গড়ে তোলার পরিবেশ তৈরিও নাগরিক উদ্যোগ-এর একটা কাজ।

সাধারণভাবে নাগরিক উদ্যোগ-এর লক্ষ্য হলো 'সুশাসন ও মানবাধিকার'-এর সুরক্ষা ও বিকাশে তৎপরতা চালানো এবং বিশেষভাবে 'স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও স্থানীয় সরকারকে'-কে শক্তিশালী করা। নাগরিক উদ্যোগ-এর কর্মকাণ্ডে অন্যতম একটি মনোযোগের ক্ষেত্র হলো, প্রচলিত সালিশ ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়া। গ্রামীণ সালিশদারদের মানবাধিকার ও আইন বিষয়ে সচেতন করা এবং সেই সাথে তৃণমূল নারীদের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করা ও সালিশী ব্যবস্থায় সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বাড়ানো।

যে আদর্শ দ্বারা নাগরিক উদ্যোগ-এর সামগ্রিক নীতি-কৌশল পরিচালিত হয় তা হলো, গণতন্ত্র মানে শুধু ভোট নয়, শুধু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়া পূর্ণতা পায় না, বিশেষত, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের জীবনে। এ বোধ থেকে নাগরিক উদ্যোগ জোর দেয় তৃণমূলে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশের উপর।

নাগরিক উদ্যোগ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- নারী-পুরুষ এবং সামাজিক শ্রেণী নির্বিশেষে মানবাধিকার শিক্ষা, সালিশ ও আইনগত সহায়তার মাধ্যমে দেশে সম-অধিকারের ধারণা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ধারা শক্তিশালী করা;
- মানবাধিকার ও নারীর অধিকার সংক্রান্ত ধারণা জনপ্রিয় করা ও তা চর্চার বিষয় করে তোলার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষামূলক কার্যক্রম চালানো ও তৃণমূল পর্যায়ে নারীর নেতৃত্ব বিকাশে কাজ করা;
- শ্রমজীবী ও প্রান্তিকজনের সাথে কাজ করা ও তাদের অধিকার আদায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা;
- দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানবাধিকারের ধারণা জনপ্রিয় করা, তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা ও তাদের অধিকার অর্জনে তৎপরতা চালানো;
- মানবাধিকার রক্ষা ও বিকাশের জন্য নতুন নীতি গ্রহণ ও আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের জন্য কাজ করা;
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তদন্ত পরিচালনা করা এবং সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা;
- সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই সুশাসন ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা, দুর্নীতি প্রতিরোধে তৎপরতা চালানো ও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিয়ে কাজ করা;
- দুর্যোগ, পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় কাজ করা এবং মানবাধিকারের সাথে পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক নির্ণয় ও এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করে এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক ফোরামে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবং পারস্পরিক কাজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা;
- মানবাধিকার, নারীর অধিকার ও আর্থ-সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রচার।

নাগরিক উদ্যোগ-এর নির্বাহী পরিষদ:

ড. খান সারওয়ার মুরশিদ - চেয়ারপার্সন
ড. হামিদা হোসেন - ভাইস চেয়ারপার্সন
সাফি রহমান খান - কোষাধ্যক্ষ
খুশী কবির - সদস্য
ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা - সদস্য
ড. মির্জা এম. হাসান - সদস্য
ড. ফারজানা ইসলাম - সদস্য
শাহ-ই-মবিন জিন্নাহ্‌ - সদস্য
জাকির হোসেন, সদস্য সচিব ও প্রধান নির্বাহী

প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ঢাকায়। বর্তমানে মোট কর্মীর সংখ্যা ১৫৮ (নারী-৫৯, পুরুষ-৯৯)। কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছাড়াও দেশের ১০টি এলাকায় স্থানীয় কার্যালয় রয়েছে।

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
বাড়ি নং ৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮১১৫৮৬৮, ফ্যাক্স: ৯১৪১৫১১, ইমেইল: nu@bdmail.net, nu@nuhr.org ওয়েব: www.nuhr.org

আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন কম্পিউটার বা ফোনের একটি বোতামে চাপ দেয়া মাত্র পৃথিবী জুড়ে তথ্য জানা এবং তথ্য বিনিময় সম্ভব। এরকম এক বাস্তবতার মাঝেও অনেক মানুষই প্রয়োজনীয় তথ্য না পেয়ে হতাশ হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। তথ্যের অভাবে পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না তারা, ব্যর্থ হচ্ছেন নিজ নিজ দেশের শাসন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে; বিশেষভাবে তাদের অসহায়ত্ব প্রকাশ পাচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারকদের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা আদায়ে। আবার সরকারও অনেক সময় জনস্বার্থে জরুরি সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে। সকল সরকারই জনগণের দেয়া অর্থের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করে এবং তা জনস্বার্থে ব্যবহারের লক্ষ্যেই। রাষ্ট্রীয় বা সরকারি জিম্মায় থাকা তথ্য মাত্রই জনসম্পদ এবং জনগণ সম্মিলিতভাবেই তার মালিক।

জনগণের ধন তথ্যে তাদের অধিকার অনন্য ধাঁচের এক মানবাধিকার। জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিসরে ইতিমধ্যে স্বীকৃত অন্য সকল মানবিক স্বাধীনতার জন্যই তথ্যে অধিকার জরুরি। এর ভূমিকা পরশ পাথরতুল্য। এই বিবেচনাতেই ইতোমধ্যে ৮০টিরও বেশি দেশে সরকারি জিম্মায় থাকা তথ্যে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট আইন হয়েছে। 'আমাদের অধিকার-আমাদের তথ্য' হলো বিশ্বজুড়ে সংগৃহীত অনেকগুলো কেস স্টাডির সংকলন- যা থেকে বোঝা যাবে যে, খাদ্য অধিকার, স্বাস্থ্য অধিকার থেকে শুরু করে নির্যাতন থেকে স্বাধীনতা কিংবা লিঙ্গগত বৈষম্য থেকে মুক্তির অধিকার পর্যন্ত সকল মানবিক অধিকার আদায়ের জন্য তথ্য অধিকার বিশ্বজুড়ে কীভাবে ভূমিকা রাখছে।

Published in partnership with:

FÜR DIE FREIHEIT

Commonwealth Human Rights Initiative
B-117, First Floor, Sarvodaya Encalve, New Delhi - 110 017
Tel.: +91-11-2686 4678, 2652 8152
Fax: +91-11-2686 4688
E-mail: info@humanrightsinitiative.org
Website: www.humanrightsinitiative.org

Published in collaboration with:

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE